কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন

বার্ষিক সূচীপত্র

(আশ্বিন, ১৩৪৪—আষাঢ়, ১৩৪৫)

অজিত দত্ত

মালতী, তোমার মন,	…	আশ্বিন,	৪
তারপর !	…	,,	৫
জানবার কথা	…	,,	৬
পন্থ	…	,,	৮
বাংলা মিলের দুরূহ তত্ত্ব (প্রবন্ধ)	…	বৈশাখ,	১৮

অনুপম গুপ্ত

নতুন সূর্য	…	পৌষ,	৫৭
আমাদের কোঠাবাড়ি	…	,,	৫৮
স্বপ্নের যুবতীরা	…	আষাঢ়,	৪৪

আবু সয়ীদ আইয়ুব

কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য (প্রবন্ধ)		বৈশাখ,	৩৯

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অভিসার	…	আশ্বিন,	৪৪
স্বপ্ন	…	,,	৪৬
মুকুর	…	পৌষ,	৫৫
শেষ হ'ল	…	চৈত্র,	৩৮
একটি পুরোনো ছবির প্রতি	…	,,	৪০
জাহাজের ডাক	…	আষাঢ়,	৪৯

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

I should have been cruel enough to bring you through the Flame		আশ্বিন,	১৭
মৃত্যু	…	,,	১৮
রূপকথা	…	,,	১৯
আমি নহি স্বর্গের দেবতা	…	পৌষ,	৯
মধ্যাহ্ন	…	,,	১৪

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

বাচনিক	…	আশ্বিন,	৩৭
ছোট গল্প	…	পৌষ,	২৭
বাসতেয়ী	…	চৈত্র,	৪৩

জীবনানন্দ দাশ

ও হৈমন্তিকা !	…	আশ্বিন,	১৩

কবিতা

বার্ষিক স্থচীপত্র

ফিরে এসো ... আশ্বিন, ১৪
ইঁহাদেরি কানে ... ,, ১৫
সমারূঢ় ... ,, ১৬
শীত রাত ... পৌষ, ১৬
হঠাৎ-মৃত ... ,, ১৮
স্বপ্নের ধ্বনিরা ... ,, ২০
স্থবির-যৌবন ... ,, ২১
কমলালেবু ... ,, ২৩
নতুন কবিতা (সমালোচনা) ... ,, ৬৪
আট বছর আগের একদিন ... চৈত্র, ২৫
কবিতার কথা (প্রবন্ধ) ... বৈশাখ, ৮

ছায়া দেবী
বর্ষারাত্রি ... আশ্বিন, ৫৮

ত্রৈলোক্য বিশ্বাস
অভিযান ... চৈত্র, ১৬

দিলীপকুমার রায়
আড়াল ... আশ্বিন, ২৫
অস্বীকার ... ,, ২৬
মেঘের ব্যথা ... চৈত্র, ৯
শোপ্যার একটি জর্মন গানের অনুবাদ ,, ১১

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র
তৃষ্ণা ... আশ্বিন, ৫১
রাতের চৌরঙ্গী ... পৌষ, ৪৭
রজনীগন্ধা ... আষাঢ়, ৪২
ছায়াপথ ... ,, ৪৩

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
দু'বছর ... চৈত্র, ২১

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
তুমি যখন কথা বলো ... পৌষ, ২৪
চিঠি ... ,, ২৫
সমস্যা ... চৈত্র, ৩২

নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়
স্বপ্ন ... চৈত্র, ৬৯

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
আত্ম-পরিচয় ... আশ্বিন, ৪৭
মৃত্যু ... ,, ৪৯
স্মরণ ... আষাঢ়, ২৫

কবিতা

বার্ষিক স্থচীপত্র

নিশিকান্ত
পণ্ডিচেরির ঈশাণকোণের প্রান্তর ... আশ্বিন, ৬৪
অতন্দ্রিতা ... ,, ৬৫
মুহূর্ত ... পৌষ, ৩
মহামায়া ... চৈত্র, ১
অধিষ্ঠাত্রী ... ,, ৪
রঙের রাজা ... ,, ৬

পরিমল রায়
পত্ত-পদ্ধতি ... পৌষ, ৩৭
কয়েকটি কবিতা ... ,, ৩৯
গত্ত-কবিতা ... ,, ৪৩

পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়
এসেছে সময় আজ ... আষাঢ়, ৩৫

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
অস্থায়ী ... আশ্বিন, ৫৬
অন্তরা ... ,, ৫৭
সেরিনাড ... পৌষ, ৪৮
অবসর ... ,, ৫০
পুরাতন ... চৈত্র, ৩৫
নির্বেদ ... ,, ৩৬

বিষ্ণু দে
অ[illegible]মার ... আশ্বিন, ৫৩
বেকারবিহঙ্গ ... পৌষ, ৫৩
খাসা [illegible] ... চৈত্র, ৩৩
সম্পাদক সমীপে (প্রবন্ধ) ... বৈশাখ, ৬০
জন্মাষ্টমী ... আষাঢ়, ১

বুদ্ধদেব বসু
নিজের কবিতার প্রতি ... আশ্বিন, ২৭
ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা ... পৌষ, ৫৯
Do you remember an inn, Miranda ? চৈত্র, ৫০
কবি ও তার সমাজ (প্রবন্ধ) ... বৈশাখ, ৪৮
পূর্বরাগ ... আষাঢ়, ৫২
নতুন কবিতা (সমালোচনা) আশ্বিন ৬৬, পৌষ ৭২, চৈত্র ৫৪, আষাঢ় ৫৬

যুবনাশ্ব
শর্বরী ... আশ্বিন, ৪২

কবিতা

বার্ষিক সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- আফ্রিকা … আশ্বিন, ১
- অলস মিলন … পৌষ, ১
- সাহিত্যের স্বরূপ (প্রবন্ধ) … বৈশাখ, ১

লীলাময় রায়
- আধুনিক বাংলা কবিতা (প্রবন্ধ) … বৈশাখ, ৬৩

সমর সেন
- ঘরে বাইরে … আশ্বিন, ৩৪
- পুনরুজ্জীবন … পৌষ, ৬১
- কয়েকটি দিন … চৈত্র ৪৯, আষাঢ়, ৪৬
- বাংলা কবিতা (প্রবন্ধ) … বৈশাখ, ২৬

সম্পাদক
- 'কবিতা'র পাঠকদের প্রতি (প্রবন্ধ) বৈশাখ, ৭৪

সরোজরঞ্জন আচার্য
- কী নিয়ে বাঁচবো … আষাঢ়, ২৮

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
- প্রতিপদ … আশ্বিন, ২৩
- শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট অবলম্বনে … পৌষ, ৬২
- স্বগত (প্রবন্ধ) … বৈশাখ, ৩০

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
- রোমান্টিক … আষাঢ়, ৩৮
- প্রার্থনা … ,, ৪০

সুশীলকুমার ঘোষ
- কৈশোর … চৈত্র, ৫৩

হমফ্রি হাউস
- কবিতার অনুবাদ (প্রবন্ধ) … বৈশাখ, ৬৫

হুমায়ুন কবির
- কবিতা ও অনুবাদ (প্রবন্ধ) … বৈশাখ, ৭১

হেমচন্দ্র বাগচী
- 'জননান্তর সৌহৃদানি' … আশ্বিন, ৯
- সম্বরণ … পৌষ, ৪৫
- সাহিত্যের ইতিহাস … চৈত্র, ১২

কবিতা

তৃতীয় বর্ষ আশ্বিন, ১৩৪৪ প্রথম সংখ্যা

আফ্রিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে যবে একদিন
আপনাতে স্রষ্টার আপন অসন্তোষ
বিক্ষত করিতেছিল বারবার নূতন সৃষ্টিরে
সেইদিন
রুদ্র সমুদ্রের বাহু তোমারে নিয়েছে ছিন্ন করি
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে
হে আফ্রিকা।

সেথায় অরণ্য-অন্তরালে
নিভৃতে গোপন অবকাশে
দুর্গমের বিদ্যা তুমি করেছ সঞ্চয়
দিনে দিনে।
জলস্থল বাতাসের
দুর্বোধ সঙ্কেত যত নিয়েছ চিনিয়া।
প্রকৃতির মায়া
ধরিতে শিখিতেছিলে আপন চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করিতেছিলে ভীষণেরে
আপনারে করিয়া বিরূপ,

শঙ্কারে মানাতে হার
নিজেরে অর্পিতেছিলে বিভীষার প্রচণ্ড মহিমা
তাণ্ডবের দুন্দুভি নিনাদে।

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
কালো অবগুণ্ঠনের তলে
আছিল অপরিচিত তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল তারা দলে দলে
তোমার শ্বাপদ হতে ক্রূরতর যারা,
এল তারা গর্বে যারা অন্ধ প্রায়
সূর্যহারা তোমার অরণ্য চেয়ে।
সেথা অন্ধকারে
সভ্যের বর্বর লোভ উলঙ্গ করিল আপনার
নির্লজ্জ দুর্মানুষতা।
অশ্রু তব রক্তসাথে মিশে,
ভাষাহীন ক্রন্দনের বাষ্পাকুল পথ
ডুবাল পঙ্কের স্তরে।

দস্যুপদপাদুকার তলে
বীভৎস কর্দম
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার দুর্ভাগা ইতিহাসে।

সে মুহূর্তে তাদের পল্লীতে
মন্দিরে বাজিতেছিল দয়াময় দেবতার নামে
পূজাঘণ্টা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
শিশুরা খেলিতেছিল মার কোলে,
অবাধে ধ্বনিতেছিল কবির সঙ্গীতে
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যবে পশ্চিম দিগন্ত তলে
ঝঞ্ঝাঘাতে রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষু প্রদোষ,
গোপন গহ্বরচারী পশুর অশুভধ্বনি
দিনান্তের করিছে ঘোষণা,—
এসো যুগান্তের কবি,
অবসন্ন এ সন্ধ্যার শেষরশ্মিপাতে
নির্দয়দলিত ওই মানহারা মানবীর কাছে,
ক্ষমা ভিক্ষা করো,
হোক্ তাহা তব সভ্যতার
হিংস্রপ্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী॥

মালতী, তোমার মন

অজিত দত্ত

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চঞ্চল উদ্দাম
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।
জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না ;
শুক্লকৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায়
কাল বিহঙ্গম উড়ে যায়।
অবিশ্রান্ত গতি,
পাখার ঝাপটে তার নিবে যায় উল্কার প্রদীপ
লক্ষ লক্ষ সবিতার জ্যোতি।
তবু আমি সেই মহা বায়ুস্রোতে খ'সে-পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত।
সে-আকাশ তোমার অন্তর
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।

তারপর!

অজিত দত্ত

তারপর! তা'র কথা বলো!
আমি ভালো আছি কিনা শুধালো বুঝি সে?
কিছু বলিলো না মোর কথা? কিছু নয়?
হাজার হ'লেও মেয়ে, লজ্জায় পায় নাই দিশে
শুধাতে আমার কথা। তারপর তোমরা দু'জনে
কহিলে অনেক কথা ; নয় সে আমার শুনিবার?
আমার কথা সে যদি কিছু বলিলো না,
তাহ'লে সে কী বলিলো আর!

তবু তুমি তা'র কথা বলো!
চমৎকার মেয়ে? সত্যি সে।
হয় না অমন মেয়ে, আমায় সে খুব ভালোবাসে।
হাজার হ'লেও মেয়ে, লজ্জায় পায় নাই দিশে
বলিতে আমার কথা। তারপর সে তোমার সাথে
কহিলো অনেক কথা? নয় সে আমার শুনিবার?
আমার কথা সে যদি কিছু বলিলো না
তাহ'লে সে কী বলিলো আর!

জান্‌বার কথা

অজিত্‌ দত্ত

জান্‌বার কথা এত আছে পৃথিবীতে—
সব যে জান্‌তে হয় না সেটাই রক্ষে,
সব কথা যদি পড়ে' হ'ত শিখে নিতে
নাওয়া খাওয়া তবে ছেড়ে দিতে হ'ত লোককে।
মোটা মোটা বই পড়ে বটে প্রোফেসারে,
বিদ্যাও তা'তে কিছুটা হয়তো বাড়ে,
তবু যদি কেউ মনে করে' থাকে
তাঁরা হন্‌ সবজান্তা,
তাহ'লে তাদের জেনে রাখা ভালো
আসলে তাঁহারা নন্‌ তা'।

না জান্‌লে যদি ফেল ক'রে দিত ম্যাট্রি কে
টাকা ও টাকের নিগূঢ় সে-সম্বন্ধটা,
টুপির কি কল-কৌশল আছে hat-trick-এ
আদা ও কলায় এমন কিসের দ্বন্দ্বটা।

তবে যে কী এক দারুণ কাণ্ড হ'ত
সে কথাটা কেউ ভেবেছ কি অন্তত?
ডেরাডুন ডিহিরি, কি লাম্‌ডিঙে
কটা মোটা লোক রোজ ফোঁকে শিঙে
কেউ কি বল্‌তে পারে?
পড়ে যা'রা বই উবু হ'য়ে বসে'
জানে তা'রা কেউ কেন আনারসে
চোখ থাকে সারে সারে?

একথার কেউ পার্‌বে না দিতে জবাব—
মশক-জাতির কেন গান গাওয়া স্বভাব
সাধু সন্ন্যাসী ধরে কেন এত ভেক!
লাল টুক্‌টুকে, কালো কুচ্‌কুচে হ'লে
হল্‌দের বেলা কেন কিছু নাহি বলে
এত প্রশ্নের কেবা জানে অর্দ্ধেক?
যদি ভেবে থাকো সুবোধ ছেলেরা পড়ে'ই এসব জান্‌বে
তবে বলে' রাখি, তুমি যবে যাবে পড়ে'
জোছ্‌না তোমাকে ভেংচি কাট্‌বে, হাওয়া টিকি ধরে' টান্‌বে
ফুলেরা হাস্‌বে তোমায় ঠাট্টা করে'॥

পত্ত

অজিত দত্ত

বত্তিনাথও পত্ত লেখে,
আপন চোখে আসচি দেখে।
চোদ্দ খানা ডিক্‌সনারি
চলন্তিকা সঙ্গে তারি
সামনে থাকে, তার উপরে
দু'জন ডি-লিট্ মাইনে ক'রে
কাছেই আছে : কখন কী যে
আটকে যাবে, বত্তি নিজে
তাই কি জানে ? এই তো সেদিন
বত্তি বলে, "মিল খুঁজে দিন
'নিস্‌নি' সনে" ; অমনি তারা
কাগজ ঘেঁটে একশো তাড়া
বার করে' দেয় 'ধ্বস্থি'। তবে
বত্তি মেলায় সগৌরবে।

কবিতা
আশ্বিন, ১৩৪৪

'জননান্তর সৌহৃদানি'

হেমচন্দ্র বাগচী

পৌষের সন্ধ্যার অস্পষ্ট কুয়াশা।
ঘন খর্জ্জুরবীথির মধ্যে মিষ্ট রসের সুগন্ধ।
হেঁকে বল্‌লাম, 'গাড়ী জোরে চালাও!'
গরুর গাড়ী—গতি মন্থর, ধীর।
পথ জনমানবহীন—মাঝে মাঝে এক একটা শৃগালের সভয় পলায়ন।

দৃষ্টি কেবলি ঘোরে—তারালোকিত অর্দ্ধ-অন্ধকার আকাশে।
আর, দূর প্রসারিত মাটির পৃথিবীর মাঠের কিনারের ঘনতরুপুঞ্জে।
আলো দেখা যায় না। মাঝে মাঝে এক-একটি পথিকের নিঃশব্দ গতি।
অসংখ্য অনুভূতির মালা যদি গাঁথা যায়—
একটির পর একটি—এক চিন্তাসূত্র থেকে আর একটিতে
তেমনি ছিল মনের অবস্থা।
হেঁকে বল্‌লাম, 'গাড়ী জোরে চালাও।'

গাড়ী চলে, আর ভাবি
ভাবি, কাকে বলে প্রেম, কাকে বলে বিরহ-মিলন-কথা
কালে বলে শান্তি জীবনের, কাকে বলে নিয়তি!
দৃষ্টির অস্পষ্টতা কাটে না।
কত অনুমান, কত ভয়ভ্রান্তি, মনের কত আলোড়ন, বিক্ষোভ!

গ্রামের মধ্যে এল গাড়ী—
গোয়ালের ধোঁয়ার গন্ধ, শিশিরসিক্ত মাটির গন্ধ,
ক্লান্ত পীড়িত মন ক্ষণকালের জন্য অভিভূত হ'ল।
ছেলেমেয়েরা ছুটে এল, শিউলিতলার পাশ দিয়ে—
পূজার দালানের কাছে পুরনো চাকরদের জটলা,
লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় তা'দের চাদরে ঢাকা মূর্ত্তিগুলির রেখা।
গৃহিণী ঈষৎ হেসে বল্লেন,
'এদের জন্য কি এনেছ দেখি—'
'এটা ওটা সেটা আঙুর মিষ্টি বিস্কুট—'
নির্জ্জন বাড়ী, নারকেল পাতাগুলির মৃদু শীতের হাওয়ায় সরসর
মরমর শব্দ—

ম্লান চতুর্থীর চাঁদ ঢ'লে পড়েছে বেণুবনের পাশে—
বেগুন পুড়িয়েছে ছেলেরা, কাঁচা ছোলা পুড়িয়েছে—
সমস্ত পরিবেষের মধ্যে ভীরু গ্রাম, সম্বলহীন কিন্তু আনন্দময়!
বড় ভালো লাগ্‌ল—
মনে হ'ল, এই জীবনের পাওয়া এইখানে—
এই অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত ত্রস্ত চকিত চাহনির অন্তরালে
আমাদের শঙ্কিত প্রভুপদপীড়িত জীবনের কীর্ত্তিনির্ব্বাপন।

খোলা ছাদের উপর ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—
আমরা গড়েছি—ভেঙেছি তা'র চেয়ে বেশী।
অনেকদূর থেকে কে যেন একতারা বাজিয়ে গান ধরেছে,
'মাগো দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবীজীবনে!'
একসঙ্গে অনেক কিছু মনে প'ড়ে গেল—
প্রেম, বিরহ, সমস্যা, মৃত্যু, জীবন—অনেক কিছু।

জীবনে পাওয়া গেল যেটুকু,
সেই সম্পদে যদি থেমে থাকৃত মানুষের জীবন
তাহ'লে আর চিন্তা কি?
কেবলি শুনি, তারপর কি? তারপর?

তারপর আসে অনন্ত রাত্রি,
অনির্ব্বাণ তারালোক, আর অনন্ত প্রশ্ন, কোথায় কোথায় ?
এই সমস্তকে নিয়ে একটি স্বর বাজ্‌তে থাকে,
এই জীবন পার হ'য়ে যায় ভাবনা—
তা'রি সূক্ষ্মস্বর কানে ভেসে আসে।
জানি না কোথায় জন্মান্তর—
কিন্তু মনের তারগুলিতে ভারি সুন্দর একটি মিশ্ররাগিণী বাজে,
জীবনের দলগুলি কেবলি একটির পর একটি খুলে খুলে যায়।

ও হৈমন্তিকা!

জীবনানন্দ দাশ

হৈমন্তিকী, অইখানে যেওনাক' তুমি,
ব'লো নাক' কথা অই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো হৈমন্তিকী :
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেওনাক' আর।

কি কথা তাহার সাথে ?—তার সাথে!
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মত তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

হৈমন্তিকী,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস,—
আকাশের ওপারে আকাশ।

ফিরে এসো

জীবনানন্দ দাশ

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে

ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছ বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝর্ণা হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব !

ইহাদেরি কানে

জীবনানন্দ দাশ

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেল যুবকের দল ;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা ;—এইসব বধির নিশ্চল
সোনার পিতল মূর্তি : তবু, আহা, ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য্য ঢেলে চ'লে গেল যুবকের দল :
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।

সমারূঢ়

জীবনানন্দ দাশ

বরং নিজেই তুমি লেখনাক' একটি কবিতা
বলিলাম ম্লান হেসে ;—ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়,—সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
ব'সে আছে সিংহাসনে;—কবি নয়—অজর, অক্ষর

অধ্যাপক ;—দাঁত নাই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিল ;—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি।

I should have been cruel enough to bring
You through the Flame. *D. H. Lawrence.*

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমার চোখের কোনে কামনার যে দীপকণা জ্বলে,
তোমার বিন্যস্ত বুক বিকাশের যে বিদ্যুৎ হানে,
তাকে তুমি সংহত কর, করুণাময়ী।
আমার একাকীত্বের অন্ধকারে
আমাকে ঘিরে যখন নিঃসঙ্গতা আর চিন্তার অন্ধকার,
তোমার বিদ্যুৎ আর দীপকণা নিয়ে নারীত্বের নশ্বর লীলায়
শুধু তখন হয়ো শরীরিণী।

তোমার বিদ্যুৎ আর দীপকণা নিয়ে
হ'য়ো কোনো জলন্ত জোনাকী,
ছড়িয়ে দিয়ো ডানা-ছড়ানো গুঁড়ো গুঁড়ো আলো
আমার অন্ধকারে আচ্ছন্ন আকাশে।

মৃত্যু

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমাকে বলেছিলাম মৃত্যু কিছু নয়।
যদি আমার মৃত্যুকে সহ্য করতে পারি,
মৃত্যুও সহ্য করবে আমাদের :
আমাদের ঘিরে আছে মৃত্যু-লীলার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ,
আমরা ম'রে গিয়ে ব্যঙ্গ করবো এই মৃত্যুকে
আত্মবিলোপে হ'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

তুমি শুধু একটি প্রশ্ন করেছিলে।
'আমাদের অবিকৃত মৃত্যুর পর
তোমার পুরুষ-দেহ মাটি হয়ে যাবে কী পরিমাণে ?'
তারপর নত মুখে বলেছিলে,
'আমি যেন ফুল হ'য়ে ফুটে থাকি
তোমার দেহের ঐ ধূসর মৃত্তিকায়।'

আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই।
তবু কী সাঙ্ঘাতিক স্পর্দ্ধা,
আমরা ম'রে গিয়ে ব্যঙ্গ করতে চাই মৃত্যুকে,
আত্মবিলোপে চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা!

রূপকথা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পাশাপাশি দুটো বাড়ী।
একটা অশ্লীলরকম অপরিসর আর অপরিচ্ছন্ন,
আরেকটা বিস্তৃতি আর বিকাশে বিস্ফারিত।
একটার চালওলা বারান্দায় থাকি আমি,
আরেকটায় বাঙলার কোন বনেদি বংশধর।
বনেদি বাড়ী চালওলা বারান্দাকে ব্যঙ্গ করে!

ওদের বাড়ীর বড়ো বউ মারা গেছেন অনেকদিন,
মেজ আর ছোটকে দেখেছি।
মেজ বউ মূর্ত্তিমতী বন্য বিহঙ্গী,
কক্ষ ছেড়ে 'কার'-এই থাকে বেশী।
কোনো কারণে বা অকারণে
স্বামীর সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষিত আলাপের
একদা ঘটে গেছে আকস্মিক বিচ্ছেদ,
স্বামীটি এখন বাঙলা ছেড়ে বর্মায়।

যদি যৌবনের গূঢ় অর্থ জানতে চাও,
এই মেজ বউ তার উদ্ধত উদাহরণ,-
তার প্রাণ যেন সর্ব্বদা পাখা মেলে আছে
সক্রিয়তা আর সজীবতার প্রাচুর্য্যে।
আর ছোট বউ—
স্বামীসঙ্গক্লান্ত একটি বিষণ্ণ বালিকা,
সারল্যের স্নিগ্ধতায় একটি সচেতন দীপশিখা!
বারান্দার ধারে ব'সে বাসন মাজি,
বড়ো চোখে আর অবসন্ন দৃষ্টিতে
ছোট বউ তার জানলায় দাঁড়িয়ে দেখে :
আমার অকালবৈধব্য ওর ক্ষতি করেনি তো কোনো?

অর্দ্ধরাতে আচমকা জেগে উঠি।
মোটারের আওয়াজ শোনা যায়,
ও বাড়ীর মুক্তপক্ষিণী মেজ বৌ
বুঝি এতোক্ষণে বাড়ী ফিরলো।
অথচ মানুষ-মূর্ত্তিতে সামাজিক সারমেয়গণ
গোপন খবরের ঘ্রাণশক্তি যাদের আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণ,
এই মুহূর্ত্তে তারা কোথায়?

পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করি।
ছোট বউএর ঘর থেকে
অকস্মাৎ কে যেন চীৎকার ক'রে হেসে উঠেছে।
বউএর স্বামী ছাড়া আর কে হবে?
বয়সের এতো ব্যবধান!
আর স্বামীসঙ্গ-ক্লান্ত সেই বিষণ্ণ বালিকা!
স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তার অস্ফুট কাতরোক্তি,
স্বামীর সৌখীন সামীপ্যকে সহ্য করবার
হয়তো আর কোনো শক্তি নেই তার।
কিন্তু কে শোনে তার অনুনয়?
এই অত্যাচারী স্বামীর প্রতি ভয়ে আর বিরাগে
আমার বুক হিম হ'য়ে আসে।

তবু মাঝে-মাঝে ভাবি,
এইবার আমি বিদ্রোহ করবো!
কী হবে এই চেষ্টাকৃত সামাজিক সাধনায়?
তার চেয়ে হতুম যদি ও-বাড়ীর মেজ বৌ,
হ'তে পারতুম যদি ঐ বিষণ্ণ বালিকা!
আমার বিচিত্র্যহীন ধূসর জীবনে
ওরা কি চিরকাল দুঃস্বপ্ন হ'য়েই থাকবে?

প্রতিপদ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি। শ্রান্ত দোলপূর্ণিমার শশী
যৌবনের শিখিপুচ্ছে বিমণ্ডিত বৃদ্ধের সমান,
ঘুমে অভিভূত হয়ে করে যেন হঠাৎ প্রমাণ
আকাঙ্ক্ষার বাচালতা। জাতিস্মর উদ্বেগের মসি
প্রাগূষার পাণ্ডু মুখে অনর্থের অপপাঠ লিখে।
থমকে সে মধ্যপথে, তুলে ধ'রে নিবাত প্রদীপ
তাকায় গন্তব্যপানে; নীড়ে নামে, দেখে, চতুর্দ্দিকে
বাদুড়-পেঁচার ঝাঁক। অপুষ্পক ত্রিভঙ্গিম নীপ
দুঃস্বপ্নে প্রলাপ বকে, শব-শিবা-সর্পে পরিবৃত।
সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি; চূর্ণমুষ্টি ধূলিধূসরিত॥

কষিতকাঞ্চনকান্তি, সুমধ্যমা কুমারী, অহনা,
আর ফিরে আসিবে না অলজ্জিত স্বচ্ছ শ্বেতাম্বরে
দীর্ঘল তনিমা ঘিরি, অরুণিম বরাভয়ে ভ'রে
নীলকান্ত সুধাভাণ্ড। বিমর্দ্দিত ফুলের গহনা,

পর্য্যুষিত কারণের উগ্র গন্ধ উতল নিঃশ্বাসে,
সর্ব্বাঙ্গে পাংশুল ক্লেদ, তন্দ্রাবিষ্ট পৃথুল পৃথিবী
নির্জ্জন নৈমিষারণ্যে। ইতিমধ্যে সন্নত আকাশে
রুগ্ন আলোকের বীজ, পুরাতন, পীত, পরজীবী
উপ্ত ক'রে ধ্বংসকীট। আত্মহারা স্বয়ং সবিতা;
পৈতৃক প্ররোহে আজ পরিপ্লুত অজের দুহিতা॥

সুবর্ত্তুল পুষ্করিণী পরিপূর্ণ কানায় কানায়
অচ্ছোদ সবুজ জলে, উচ্চকিত নব দুর্ব্বাদলে
অবরুদ্ধপরিকর। চিত্রার্পিত মুকুরের তলে
দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায়
সূচ্যগ্র অণিমা টুটে। মায়াময় সে ছায়ার কাছে
ভাসে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ
হরিৎ হেলঞ্চে ঢাকা; নিরন্তর কারে যেন যাচে
অনিকেত চক্ষুদ্বয়; সুতা-কান্তা-জননীর স্নেহ
অসপত্ন আচম্বিতে উৎকণ্ঠিত মুমূর্ষায় তার।
পুরুজিৎ কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীর শেষ অভিসার॥

শত শ্রেয় মরুভূমি, সম্মার্জ্জিত সন্তপ সিমুমে,
বন্ধ্যা ফণিমনসায় কণ্টকিত, বিষাক্ত, ধূসর ;
পরিত্যক্ত মীনরাজ্য নিঃসলিল তরঙ্গে উষর ;
নিরিন্দ্রিয় মহাশূন্য উদাসীন উদ্বায়ী মর্ম্মে ।
অতিকায় কৃকলাস অস্থিসার রুদ্র পরিপাকে ;
প্রপন্ন অজ্ঞাতবাসে পাশবিক পুরাণপুরুষ ;
শিখরীর মন্ত্রগুপ্তি পঙ্গু করে মৃগতৃষ্ণিকাকে ;
উন্মুক্ত গগনে জাগে নিরঞ্জন নিত্য, নিরঙ্কুশ ।
নির্ব্বাণ সর্ব্বতোভদ্র ; প্রতিবেশী নীহারিকা যত
পলায় সংসর্গ ছেড়ে। অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু স্বগত ॥

আড়াল

দিলীপকুমার রায়

দেখাশোনা হয়, তবু মন-জানাজানি হয় না তো !
ফুল ফোটাতে না চায় কে ? হায়, তবু মলয় বয় না তো !
একটু হাসি···বাঁশির মিড়ে
যেই কাঁপে মন—আশার নীড়ে
ঘনায় আঁধার···কলকণ্ঠ গভীর কথা কয় না তো !···
ধরতে যারে রাখি কাছে—কাছে সে কই, রয় না তো !

সন্ধ্যাতারা জ্বলে···তবু অস্তব্যথা রয় ছেয়ে !
কূলের মায়া ডাকে···তবু অকূল ওঠে গান গেয়ে !
কতই উষার আগমনী···
কত চরণ-জাগরণী···
নিশার নিশার দিশা তবু পাই না···তরী যাই বেয়ে···
সবই আছে···উষার উষা আনবে যে—নেই সেই নেয়ে।

বাদলবুকে নীলার উঁকি ঐ দেখা যায় সুদূরে···
জ্বলন্ত প্রেম-ছন্দ বিছায় সেই চাহনির নূপুরে···
ঝঙ্কারে তার শঙ্কা কাটে···
চেনাশোনার বাটে ঘাটে
আধেক রেশে সেই সুবাসের পাই-যে আভাষ-মধুরে···
দৃষ্টি দোলে মিলবে কবে দৃষ্টি-অতীত বঁধুরে ?

অস্বীকার

দিলীপকুমার রায়

নই সখী, আর সে-আমি আজ—মিছে রাঙাও স্বর্ণতনু :
দোলায় তোমার মন দোলে, হায়, তবুও তুমি বর্ণধনু।
বাঁকা রেখায় জ্বালাও আশা,
শুধু, সে নয় ভালোবাসা :
রূপ-ক্ষণিকায় তোমায় ধেয়ায় আমার প্রতি স্বপন-অণু
চিরন্তনীর পরশমণি—যার ছোঁওয়াতে হেম ও-তনু।

আসতে কাছে চাও ? আমিও চাই, শুধু, নয় জিনতে চেয়ে :
চলব না আর মদির দেহের অধীর তরী নেশায় বেয়ে।
চায় না তো সে ধ্রুবতারা
তুফান-মোহেই আত্মহারা :
তাই চপলার চিকিয়ে-ওঠার পরেই আঁধার আসে ছেয়ে :
কোরো রমা, আজ ক্ষমা—আর মানব না হার জিনতে চেয়ে।

কবির ব্যথা ছবিব্রতা : রংসম্বল—ক্ষণপ্রভা।
তনুর তৃষা রিক্তদিশা : ছায়ার ছায়া—মনোলোভা।
আজ আমি চাই দূর আকাশে
ছুঁতে তোমায় দূর-দুরাশে—
ভ্রান্তিপারের শান্তিলোকে—কান্তি যেথায় বিছায় শোভা
জাগিয়ে কায়ার তৃষ্ণাতটে ঢেউ অকায়ার—স্বয়ংপ্রভা।

নিজের কবিতার প্রতি

বুদ্ধদেব বসু

(১)
হে নির্লজ্জ, হে অসহ্য, তবু তবু কেন আমাকেই, আমাকেই
তোরা পাগল করবি ? কেন কেন কেন আমার বুকেই
হানবি এই জোয়ার ? এই হাওয়ার ঝড়ের ঝাপটা ? এই

আকাশ-ধোয়ানো মেঘ-নিঙড়ানো বন্যা ? ওরে কথা, কথা,
ওরে দুরন্ত অফুরন্ত ওরে অবাধ্য উদ্দাম অজস্রতা
ওরে মুখর তোরা চুপ কর্। আর কত আর কত ব্যথা

আমাকে হানবি বল্ ? তোরা কূল-ছোঁয়ানো কূল-ছাপানো নদীর
ঢেউ-তোলা কলরোলে আর কত ভাঙবি আমাকে ? ওরে অধীর,
ওরে কবিতা, ওরে না-চাওয়া, না-হওয়া, হাওয়ায়-উড়ে-আসা কবিতার ভিড়

ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, তোরা কি যেতে পারিস্‌নে তার কাছে
যে স্বাধীন, যার প্রতিদিন দুশ্চিন্তার কাঁটায় ছেঁড়া নয় ? যে বাঁচে
মোটা টাকার মোলায়েম আরামে, নিশ্চিন্ত অবসরে, শোভন সভ্যতার ছাঁচে !

তার কাছে যেতে পারিস্‌নে তোরা ? আমার শান্তি নেই, সময় নেই,
আমার প্রতিদিন পরাধীন মলিন ছেঁড়াখোঁড়া, আমাকে যেতে হবেই
পথে, হাটে, ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ির ঘামে ভিজতে, জীবনের দাবি মেটাতেই।

তবু তবু তবু তোরা আসবি আসবি আমার কাছেই উদ্দাম হাওয়ায়,
আমার আকাশে বাতাসে আশে-পাশে দীর্ঘশ্বাসে আমার চাওয়ায়
ছোঁওয়ায় আসবি কলোচ্ছ্বাসে উর্দ্ধশ্বাসে, আমার ব্যথায় হতাশায়

হানবি বিদ্যুৎ, ভাঙবি আমার বুক। ওরে কথা ওরে কবিতা, ওরে
অজস্র অবাধ্য অফুরন্ত দুরন্ত কলরোল! কেমন ক'রে
তোকে বাঁধবো ? তোকে এড়াবো, ফেরাবো ? ওরে মূঢ় অন্ধ ব্যর্থ অবরুদ্ধ
আবেগ! ওরে
না-চাওয়া না-হওয়া ফিরে-যাওয়া ফিরে আসা—তবু ফিরে-আসা—
ওরে কথা, কথা, কবিতা!

(২) এজরা পাউণ্ডের অনুসরণে

ওরে কবিতা, ওরে আমার কবিতা,
ওরে আমার যৌবনের জীবনের জোয়ার-জলে
এলোমেলো টলোমলো ঢেউগুলি, ওরে
পৃথিবীর বাণিজ্যস্ফীতি আর সাম্রাজ্যপ্রসারের বড়ো রাস্তায়
বাঁধ-ছেড়া খাপছাড়া মুখচোরা ছোঁড়ার দল,
কী করবি তোরা ? কোথায় যাবি ?
যাবি কার কাছে ? কী বলবি গিয়ে ?

যাবি তোরা ধনীর দরজায়, ঢুকতে পাবি না,
কি বাইরে দাঁড়িয়েই দু'টাকা বখশিষ পাবি।
যাবি তোরা গরিবের ঘরে, তারা থাকবে হাঁ ক'রে তাকিয়ে,
না খেতে-খেতে ওরা বোকা হ'য়ে গেছে।

যাবি আত্ম-সম্বল আত্ম-বৎসল
আত্ম-তৃপ্ত মধ্যবিত্তের ঘরে-ঘরে।
তারা লোক ভালো, করে আর্টের চর্চা, যদিও খরচা
তাতে বেড়েই চলে। তারা বলবে 'দুটো টাকা গরচা!
আচ্ছা, দেখি।'

আসলে তোদের ছেঁড়া কাপড়টা তাদের রুচিতে বাধে, আর তোদের
পৈতৃক পরিচয়টা পছন্দ হয় না।...তেমন কেউ একজন হ'তো
যার বড়ো ঘরের উচুঁদরের গাড়ি-হাঁকানো সভা-জাঁকানো নাম, তা'হলে অন্তত
ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখা যেতো।...তারা উঠতে চায়, উঠতে চায়,
পড়তে-পড়তে মরতে-মরতে চড়তে, চড়তে, চড়তে, চড়তে চায়।

ওরে কবিতা, ওরে আমার কবিতা,
ওরে খাপছাড়া মুখচোরা ছোঁড়ার দল,
রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ঘুরে-ফিরে তোদের দিন যায়
কোথায় গিয়ে দাঁড়াবি তোরা ?

যুবকরা সিনেমায় ভিড় করে
আর খেলার মাঠে,
যুবতীরা মুখে রঙ মাখতে ব্যস্ত
নিখুঁত হওয়া চাই।
বয়স্ক পুরুষ টাকা-শিকারে বেরোয়,
মেয়েরা খরচা বাঁচায়,
বুড়োরা ধুঁকতে-ধুঁকতে মরে
আর শিশুরা চ্যাচায়।

কোথায় কোথায় যাবি তোরা, ওরে আমার
কবিতা, এই পৃথিবীর স্বার্থসিদ্ধি আর আত্মবৃদ্ধির
দারিদ্র্য আর অপমৃত্যুর
জীবিকাসংগ্রাম আর জীবনহত্যার
ধোঁয়াটে ঘোলাটে আঁকাবাঁকা রাস্তায় ওরে আমার
খাপছাড়া বাঁধছেঁড়া মুখচোরা ছোঁড়ার দল,
কী করবি তোরা এখানে ? কোথায় দাঁড়াবি ?
যাবি কার কাছে ? কী বলবি গিয়ে ?

(৩)
হায়রে, আমি যদি হতাম রাসায়নিক কি ভাষাতাত্ত্বিক
তারাতত্ত্ববিদ কি যন্ত্রবিশারদ,
ছবি-আঁকিয়ে কি গাইয়ে,
কি মিস্ত্রি মুচি দরজি কুমোর নাপিত ছুতোর যা-কিছু
লিখিয়ে ছাড়া আর যা-কিছুই হতাম
কত ভালো হ'তো সেটা, সত্যিকারের সম্মানের।

যে-কোনা, যে-কোনো লোক, হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই
পারে না হ'তে রাসায়নিক কি পদার্থবিদ
কি গাইয়ে কি আঁকিয়ে,
মিস্ত্রি কি মুচি, নাপিত কি দরজি হ'তেও পারে না :
কেননা সব কাজই শিখতে হয়,
মিস্ত্রি কি মুচির কাজ বিশেষ ক'রে।
কোনোখানেই অকুশল অনিপুণ অশিক্ষিত মূর্খ অজ্ঞের জায়গা নেই,
একেবারেই নেই মিস্ত্রি কি দরজির দরজায়।

যে-কোনো, যে-কোনা লোক, যে ক খ গ ঘ লিখতে পারে
আর দু'চারখানা বইয়ের পাতা উল্টিয়েছে
হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই হ'তে পারে
দস্তরমতো লিখিয়ে।
গাইতে গেলে যার হাঁ বেরুতো না
আঁকতে গেলে কাঁদতে হ'তো
মিস্ত্রি মুচি দরজি কুমোর নাপিত ছুতোর
কিছু হবার যোগ্যতা যার নেই
হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই সে হ'তে পারে
মস্ত বড়ো লিখিয়ে।

হায়রে, আমার এই লেখার কাজ!
এই পীড়িত, উৎপীড়িত, অশিক্ষিত-হাতে-বিক্ষত, বর্বরের-লোভে-লাঞ্ছিত
ইতরের-অত্যাচারে-রক্তাক্ত এই লেখার পেশা।

কত সুখের হ'তো সেটা, কত সম্মানের
আমি যদি হতাম পদার্থবিদ কি নৃতত্ত্ববিদ
মনস্তাত্ত্বিক কি ভাষাতাত্ত্বিক
পাহাড়-প্রয়াসী কি সমুদ্র-সন্ধানী।
ভাস্কর কি চিত্রকর
কি গায়ক নিরক্ষর,
মুচি মিস্ত্রি ছুতোর
দরজি নাপিত কুমোর
লিখিয়ে ছাড়া আর যা-কিছুই হতাম
কত সুখের হ'তো সেটা, কত সম্মানের।
কেননা আর কোনোখানেই কোনোকাজেই জায়গা নেই
অকুশল অনিপুণ অশিক্ষিত মূর্খ অযোগ্যতার।

ঘরে বাইরে

সমর সেন

I've been born, and once is enough.

তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিল
কামনার বিশাল ইসারা !
ট্যাকেতে টাকা নেই
রঙিন গণিকার দিন হল শেষ,
আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে,
সেইদিন লুপ্ত হোক, যেদিন পুরুষ পৃথিবীতে আসে !
ইতিহাসের চূর্ণ পাহাড়ে পিঙ্গল মানুষেরা মরে,
কর্কশ কাকের কণ্ঠে শুনি ধ্বংসের গান,
আর গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ
তোমাকে নিরন্তর কাপুরুষ প্রহার করে ;
সেইদিন লুপ্ত হোক, যেদিন মানুষ পৃথিবীতে আসে !

কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
চারদিকে মেথলার মত শালবনের অন্ধকার,

পাহাড়ের মত মেঘবর্ণ প্রাসাদ, অরণ্যে প্রেম ;
আর আজো তো আছে
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
আর বন্যার মত পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন ;
হে ঈশ্বর এ কী অপরূপ !

অনুর্ব্বর বালুর উপরে
কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান ।
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
নারীধর্ষণের ইতিহাস
পেস্তাচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া
দৈনিক পত্রিকায় ।
আর মধ্য এশিয়ার মরুভূমি, নীল-নির্জ্জন সমুদ্র
বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল !
তবু কিছুদূরে প্রখর রৌদ্রে ঘোরে
মহাযুদ্ধের ভগ্নদূত,
আর নীলরক্তবান নীলকর কবন্ধ মৃত্যু আনে ।

জানি, রক্তহীন অন্তরে প্রতিদিন বারে বারে আসে
ফুটবল মাঠের চঞ্চলতা,
চব্বিশ প্রহর কাঁপে
ভদ্রমহিলা দেখার তীব্র ব্যাকুলতা ;
আর মাঝে মাঝে উদ্যত যমদূত ক্লান্ত হতাশা আঁকে
দিনরাত্রির নরকের সিংহদ্বারে।

তবু জানি, ইতিহাসের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে;
তবু জানি—
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।
ততদিন
ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস
পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া
অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মত,
ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে
বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার।

বাচনিক

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

১

চিরকাল যদি বুদ্ধি থাকেই,
মানুষের মনে বুদ্ধির ঐশ্বর্য্য
হৃদয় কি পাবে কৈবল্যের ছায়া ?
এটা ত বুঝি নি কোনোদিনও কোনোকালে
বৈদগ্ধ্যেরই ভালে
বেঁচে থাকে শুধু বুদ্ধির ঐশ্বর্য্য।

২

অনাদ্যন্ত প্রশ্নের কটু পৃথুল স্পর্শ লাগে
ধ্রুব-বিনষ্ট নভোবিলাসীর বিপথের পুরোভাগে।
তবুও, মদির সুপ্তি যে আসে শ্রাবণের ব্যাভিচারে
কী অসংযমী মেঘ জমে চারিধারে।
আত্মরতির চূড়া-সজ্জিত উচ্চ হৃদয়-গিরি।
জীবনেরে শুধু ঘুরায় মার্গশিরী।

মেঘচূর্ণিত দিনের প্রান্তে,
হৃদয়ে লতায় প্রণয়ী কেশের ঢেউ।
আলঙ্কারিক কেউ
হয়ত বল্‌বে—হীন,
কিংবা বল্‌বে আয়ু তার অতি ক্ষীণ।
ছন্দান্তরে তাকে পাই আমি
সে কোন সত্যযুগে,
প্রথম মেঘের আবেশ ঘনায়
একদা সত্যযুগে।
সে ঘন মেঘের মায়া,
জীবনের কত শত যাত্রার
তোরণে ফেলেছে ছায়া।

৩

শত্রুপক্ষ রাত্রির পানে বিষাক্ত বাণ হেনে,
হয়ত পাঠাবে অভদ্র ইঙ্গিত।
হয়ত ভাব্‌বে মৃদু বুদ্ধির পাণ্ডু প্রলাপে ঢাকা
এই সরু রাত জীবনের এক ফালি।

তাকে নিয়ে শুধু আবেগের সমারোহে
পরমেরে দেবে আকাশের পানে ছেড়ে!
ক্ষতি নেই কিছু। মুক্তি পাক না তারা,
যারা মেঘভোজী পৃথিবীর অভিশাপে।

৪

হয়ত সেদিন,
চ্যুত পত্রের মর্ম্মর মোহজালে
শত বেষ্টনে ঘিরবে হতাশ্বাসে।
কৈশোরকের কোরক মৃত্যুকীটে
ভরবে তখন, উঠ্‌বে আর্ত্তনাদও।
হয়ত সেদিন,
স্নায়ু আর পেশীগুলো
বুদ্ধি-পন্থী হবে না, অথবা ভীরু।
প্রাকৃতিক হবে তাদের মৃত্যুগুলো।
প্রাকৃতিক হবে তারাদের নিভে যাওয়া।

বিরতি-ধূসর বিধবার দল
পালাবে সবার আগে,
অনুসরণের ক্লান্তি জড়িত পরিত্রাণেরই পথে।
মরণোত্তর শ্লেষের আঘাতে
ছিঁড়বে পুরোনো চিঠি।
খেয়ালী-পত্রে কবিতার মত, ভীষণ হাস্যকর এ!

৫

আমি তাই ভাবি,
পৃথিবীর থলি হত অসহ্য ভার,
যদি না জীবনে মৃত্যুর অধিকার।
যদি না বুদ্ধি ঘোরাত স্নায়ুর পথে।
মগজের মৃত উগ্র পাহাড়ী চূড়া,
ধূসর না হত তর্কের ধূলাঝড়ে।
পৃথিবীর থলি হত অসহ্য ভার
মানুষে মানুষে ক্লেদাক্ত ঠেসাঠেসি,
যদি সে ক্রুদ্ধ লুব্ধ ঈগল পাখি
নিচে না পাঠাতো শাণিত চঞ্চু-শিখা।

আকাশের উঁচু কঠিন নীলের ছাতে,
সে লোভী ঈগল বিরাট পক্ষ ঝাড়ে,
যুদ্ধান্তের শবেদের দেয় নাড়া।
আমি তাই ভাবি, বুদ্ধির ফুটপাথে
চক্রপিষ্ট নিরুদ্বেগের ছায়া।
'পাভ্‌লভী' গলি ধারালো কাচের গুঁড়ো।

শর্ব্বরী

যুবনা

তপ্তদুপুরের দাহ ছিলো বুকে,
তাই নিয়ে তোমাকে কামনা করেছিলাম, শর্ব্বরী,
তোমাকে কামনা করেছিলাম।
সে কামনায়
স্নেহ, প্রেম, পূজা সব ছিলো,
ছিলো ক্ষুধা, ছিলো তৃষ্ণা,
ছিলো জানোয়ারের চোখের
ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠা লালসা।

ভোররাতের দিগন্তশায়ী পাহাড়ের চূড়ার মতো
নীল তোমার চোখ, শর্ব্বরী,
নীল তোমার ঠোঁট।

তোমাকে কামনা করেছিলাম।
রক্তকণায় রক্তকণায় সে-কামনা।
রক্তকণার সংঘর্ষে যে কামনার ঐক্যতান,
সেই কামনা।
দুপুরের দাহ নিভে' যায়, নিভে' যায়—
কপাল পুড়িয়ে, চোখ পুড়িয়ে যখন নিভে' যায়,
তখন যে-কামনা জ্বলতে থাকে চোখের মণির পিছনে,
সেই কামনা।

আকণ্ঠ নীলে বিষিয়ে উঠ্‌লো, শর্ব্বরী,
নীল তোমার চোখ,
আর নীল তোমার ঠোঁট।

অভিসার

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভাঙা ভাঙা স্বপ্নের চূড়ো পেরিয়ে
চলে' এলেম তোমার দিগন্তের কিনারে।
কত ফুল বাজালো সুগন্ধের বাঁশী,
কত ফুল!
কত কুমারীর কঙ্কণ-ঝঙ্কারে
মুখর হল আলোহীন রাত :
আর আকাশে হাজার তারার মৌন নাচ
নিজেদের বিলিয়ে দেবার।

আঙুলে আঙুলে তোমার
জ্বলে' উঠ্‌ল উৎসবের আলো :
যেন মৌসুমী হাওয়ায়
সাপের মত কালো মেঘের হাসি!
আর দক্ষিণের মহুয়া-মাতাল আকাশে
আমার ভারী কান্না;
একটা ক্লান্ত ঝিঁঝিঁর ডাক।

রাত্রির নদীতে আজ
কান্নার কালো জোয়ার,
আর তারার অশ্রুজল!
কত রাত্রির নরম সিঁড়ি ভেঙে,
কত স্বপ্নের অলি-গলি পেরিয়ে
তোমার সাম্‌নে আজ এলেম :
কিন্তু সাম্‌নে আজ কান্নার কালো জোয়ার!

স্বপ্ন

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তোমার দু'টি নরম ভিজে চোখে
দেখি আমি স্বপ্ন :
পৃথিবীটা ছিল যখন কিশোর প্রাণের ইচ্ছার মত অপরিণত :
যখন সেখানে বসন্ত আসে নি
তার উচ্ছৃঙ্খল বিলাস নিয়ে—
পলাশের,
আর ভেঙে-পড়া-উর্ম্মির মর্ম্মরে মুখরিত
দক্ষিণ বাতাসের।

সৃষ্টির সেই সূচনায়
ছিল না কোনও ভাষা, কোনও প্রকাশ কোনও গান।
শুধু বিকাশের অসহ উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠ্‌ত কেঁপে, বাতাস উঠ্‌ত কেঁপে,
আর সেই কম্পনের গান রিন্‌রিন্‌ করে' উঠ্‌ত,
প্রতিধ্বনিত হত আলো আর উত্তাপে।

তোমার দু'টি ভিজে চোখে
দেখি সেই ধূসর অতীতের স্বপ্ন,
আর সেই অসহ কম্পন।

আত্ম-পরিচয়

নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আত্ম-পরিচয় কেমন করে দেব ?
আমার আমি কি একজন ?
একটি নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞায় কি আমার প্রকাশ ?
আমাকে ছড়িয়ে দিয়েছি এই জগতে
বিশ্বজনের চোখের সামনে,
নানা কথায় নানা ব্যবহারে নানা ভঙ্গীতে
আমার প্রকাশ।

উপলব্ধির কোনো স্থায়ী কাঠামোয়
ধরতে পারবে না আমাকে।
আমার চরিত্রকে আমি টুকরো টুকরো করেছি,
উড়িয়ে দিয়েছি বাতাসে বাতাসে।
বন্ধুর কাছে যে-আমি
তাই কি আমার পরিচয় ?
শত্রু কি আমার প্রকৃতিকে চিনেছে ?
পথের প্রচণ্ড কাবুলির কাছে যে-আমি
সেই আমি-র কাছেই কি ভিক্ষুকটি হাত পেতেছে ?

আত্ম-পরিচয় নেই।
খণ্ডিত আমার যেটুকু যে জেনেছে
তার কাছে ততোটুকুই সত্য।

এই বসন্তের খোলা দরজায় ভিড় করে দাঁড়াল
কটি বাক্যহারা অতিথি।
তারাও ভাবে, তারা জানে আমি কে।
কচি নেবুপাতাটি আমাকে চিনেছে,
ধরা পড়েছি হাস্নুহানার কাছে।

আজ সন্ধ্যায় তোমার কাছে এসেছি।
তোমার কাছে খুলেছি আমার হৃদয়,
জানিয়েছি আমার কামনার কাতরতা।
জিজ্ঞাসা কোরো না,
কাউকে আমি হত্যা করেছি কিনা,
ভেঙেছি কিনা কারো বুক।
আমি তোমার কাছে ধরেছি
আমার শত-বিভক্ত চরিত্রের একটি অংশ,
যাকে তুমি চিনেছ,
যা তোমার কাছে সত্য ॥

মৃত্যু

নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দেবহীন মন্দিরের দেহে শৈবালের কলঙ্ক,
মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দ্যকে জড়িয়ে আছে চাঁদের সবুজ আলো,
আর নিথর মর্ম্মরে মূর্চ্ছিত বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।
এখানে আমাদের প্রথম মধু-যামিনী।

প্রেম! গুঞ্জরণ হোলো স্তব্ধ,
শেষ হোলো কান্না আর দীর্ঘশ্বাস,
আর হঠাৎ সমস্ত রক্ত-সমুদ্রকে মন্থিত করে উঠল
বিষাক্ত বাসনা।
তখন আমরা ভুলে গেলাম আমাদের পরিচয়।

কামনার হোলো অবশেষ।
আমরা পড়ে রইলাম উভয়ের অপরিচিত,
দূর-বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো স্তব্ধ,—
কঠিন তুষার-দ্বীপ।

কখন উত্তর দিগন্ত থেকে এল ঠাণ্ডা বাতাস,
আর বুক কেঁপে উঠল ভয়ে।
এই অদ্ভুত পৃথিবী, এই নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা,
আর চক্রবালে মুমূর্ষু চাঁদের বিদ্রূপ।
ভয় করে,
এই চাঁদ অস্ত যাবে,
রুদ্ধশ্বাস অন্ধকার ভেদ করে আসবে
ক্ষমাহীন বিবর্ণ প্রত্যুষ।
আর, তখন কি দেবহীন মন্দিরে
পাণ্ডুর মৃত্যু-দেবতার আবির্ভাব?

তৃষ্ণা

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

মহানগরীর উপর নেমে এলো
কুয়াশা আর ধোঁয়ার যবনিকা।
সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ হলো;
গোলদিঘী হতে সব শিরদাঁড়া-ভাঙা পাখী
ঘরের দিকে ফিরে চলেছে।
গলায় মাথায় কম্ফর্টার জড়ানো
ভ্রমণবিলাসীর দল।
এবার রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্ত্তন হবে
নতুন দৃশ্যের উদ্বোধন গরম লেপের নীচে।
অবরুদ্ধ বিষাক্ত আবহাওয়ায় চোখমুখ জ্বালা করে,
বুকের ভিতর শুকিয়ে ওঠে,
মুখ দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে
মুক্ত বাতাসের অভাবে।

কেমন নেশার মতো তন্দ্রা আসে,
স্বপ্ন দেখি ; আচম্‌কা দক্ষিণ বাতাস
ঘরের জানলা দিয়েছে খুলে ;
সুদূরপ্রসারী রাজপথ ভোরের আলোতে ঝলমল।
পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলি
সবুজ আনন্দে ছেয়ে গেছে,
উপরে আকাশ নীল চোখের মতো,
আর নতুন নতুন পাখীর অদ্ভুত কলরব॥

অপস্মার

বিষ্ণু দে

কবে ভেসে যাবে সম্বিৎ
স্মরণের নীল পরপার !
হতোঽস্মি হবে জয়গান !
ডুব্‌বে অহম্ কশ্চিৎ,
দুর্গম দিন ক্ষুরধার
রাত্রিও হবে ক্ষীয়মান !

খুঁজে' মেলে নি ক ইসারা ;
ডাকঘরে নেই ঠিকানা,
চিঠি নেই ; দিবা নিশারা—
ভস্মলোচন তৃষা-রা
ভবঘুরে ঘোরে, ঠিকানা—
পালায় পিশাচ ইসারা !

হৃদয়ে তোমার জাগে ভয় ?
মরণের ভয় জীবনের ?
বিপুল বিদেশী বিশ্বের ?
ব্যর্থ গ্লানির পরাজয়
ধিক্কার জ্বালা দাহনের
ত্যক্ত সমাজ-নিঃস্বের ?

কোনো গোরোচনা গোরী কি
বাঁধে নি চরণে পরাণে ?
শোনো নি কি ঘুমপাড়ানি
কোমল কটির শিথানে ?
হিংস্র আঁধার হরি' কি
আলাদীন দীপ জ্বালে নি ?

কোন্ বিচিত্রবীর্য্য সে,
কোন্ পূর্ব্বজ দশরথ
দায়ভাগে নির্লজ্জ যে
রাজযক্ষ্মার ক্ষয়ভার
জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ
দিয়ে গেছে পিছে উপহার ?

তাই কি ঘুমের নীলিমা
বৈতরণীতে চেয়েছ ?
পলে পলে প্রাণ-পরাভব !
মরীচিকা ফাঁকা ত্রিসীমা !
তাই কি স্বপ্নে গেয়েছ
রসাতলব্যাপী নীল হিম
অপস্মারেরই বিপ্লব !

অস্থায়ী

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্ষার মেঘ-ভাঙা চাঁদ,
একটুখানি শাদাটে আলো চুঁইয়ে পড়েছিলো
শ্যাওলা-ঢাকা ছাদের ওপর
ভিজে ফেনার মতো।

নিষ্প্রভ আলোয়, ফিকে আকাশী শাড়ীতে
তোমায় দেখালো—

কী অদ্ভুত, বোঝানো যায় না।
হাত দুটি ধরে নিয়ে গেলাম এক কোণে।

বল্‌লাম—"বলো আবার সেই কথা।"
মোহন ভ্রূবিভঙ্গে শুধালে তুমি—"কী ?"

"ভালোবাসি—ঠিক তেম্‌নি করে।"
বল্‌লে "পারবো না"।
কী যেন ভেবে, থম্‌কে থেকে বললে :

"ভালো লাগে এতো, পুরানো সুর।
জানো না—কতো কঠিন,
কতো শিল্পীর দুঃসহ পরাজয়,
বিলম্বিত অস্থায়ীর নির্ভুল আলাপ।"

অন্তরা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আকুল, উতল রাত।
কালো শাড়ীর সিঁথেয়-সিঁদুর পাড়
অনাবৃত শুভ্র সুডৌল বাহুমূলে
আগোছালো ঝুলছে।

দৃপ্ত, দীপ্ত, সে অপরূপ।
কতো শতাব্দীর চাপা রহস্য ও মুখে!
নামিয়ে নিলাম চোখ।

এগিয়ে এসে বুকে রাখ্‌লে হাত,
নিটোল গ্রীবা হেলিয়ে প্রশ্ন করলে :
"ভয় কী ? শোনাবো সেই সুর ?"

বললে কতো কী। এখন মনে পড়ে না—
শুধু শুনেছি সে রাতে রুদ্ধশ্বাসের গুমরণ,
আর ধমনীতে শোণিতের গুঞ্জিত উচ্ছ্বাস,
ছন্দিত, ছেদহীন পরিবাদিনী।
তীব্র-রণিত স্থায়ী সুরের আশ্রয়ে
থামে না অন্তরার তান—

হারিয়ে গেলো পূর্ব্বালাপের
ভীরু, কৃপণ মূর্চ্ছনা।

বর্ষারাত্রি

ছায়া দেবী

মুক্ত বাতায়নে বসে আছি।
দেখ্‌ছি ঝালর-ঝোলা
নারিকেল পাতার চঞ্চল খেলা,
আর শ্রাবণ রাত্রির অশ্রু।

এতো ক্লান্ত শর্ব্বরীর
স্পন্দিত মৃকতার
মৌন বন্ধু আমি।

রজনীর তিমির-অন্তরে আছে
কতো ত্রুটি-ভীরু জল্পিত বাণী!
নিঃশব্দ নিশার পাত্র ছাপিয়ে
উপ্‌চে পড়ে কী অপরূপ!

জাগ্‌লো ছন্দ রাত্রির অরণ্যে—
ডুব্‌লো মন নিশীথের পিছল আঁধারে।

পণ্ডিচেরীর ঈশাণকোণের প্রান্তর

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

কোন
সঙ্গোপন
থেকে এল, এই উজ্জ্বল
শ্যামল
বিন্দুর শিখা!
এই পাষাণখণ্ড-কণ্টকিত
শুষ্ক রুধির-সঞ্চিত
প্রাণহীন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা
কার স্পর্শে পেয়েছে প্রাণ?
অমৃত-সিঞ্চিত বন-মঞ্জরীর অবদান
কোন অদৃশ্য সৌন্দর্য্যের উৎস থেকে উৎসারিত—
এই গরল-কুণ্ডলিত
ভুজঙ্গ-ভূমির অঙ্গে অঙ্গে
প্রস্ফুটিত মাধুরীর তরঙ্গে!

যোজনের পর
যোজন বিস্তৃত প্রান্তর ;
আজ সকাল বেলা
এসেছি এখানে। দূরে দূরে দেখা যায় রুক্ষ মাটির স্তূপের মেলা,
তারি উপর দণ্ডের মত দাঁড়ানো জমাটবাঁধা পাথরকুচির চাঙ্‌ড়া, যেন ক্ষিপ্ত মুণ্ড
নাসাখড়্গধারী গণ্ডার, যেন উদ্যত শুণ্ড
মদ-মত্ত মাতঙ্গের মত।

রাক্ষসী মেদিনী অবিরত
বৎসরে বৎসরে
নিজেই নিজেকে গ্রাস ক'রে ক'রে
সৃষ্টি ক'রেছে এই আরক্তদশন
বুভুক্ষার গহ্বর প্রাঙ্গণ।

বক্ষে তার
বালু-কঙ্করের বঙ্কিত পন্থার
কঙ্কাল।
তারি একপাশে ভস্ম-ভাল
শশ্মান ; প'ড়ে আছে দগ্ধ-শেষ চিতার
নিরুত্তাপ পাংশু অঙ্গার,
জীর্ণ মলিন বিক্ষিপ্ত কন্থার
রাশি, ভগ্ন কলসের কানা,

নর-কপালের করোটী, শকুনীর নখর-চিহ্ন, শব-লুব্ধ সংগ্রামে পরাজিত মৃত
বায়সের বিচ্ছিন্ন ডানা ;
বসে আছে অপরাজেয়
লোলুপ দৃষ্টির অধিকারী কৃষ্ণকায় সারমেয়।

তবু সেখানে সর্ব্বজয়ী জীবনের
বিকাশের
লিখা
এনেছে দুর্লভ তৃণ-মঞ্জরী, বিন্দু বিন্দু সবুজ গুল্ম-শিখা !—
আর
দুর্দ্দম দুর্ব্বার
মর্ত্ত্য-বিদ্রোহী তাল-বিটপীর বৃন্দ ; তাদের
অটল স্বরূপের
অভিযান তুলেছে উর্দ্ধের
উদ্দেশে, যেন সহস্রশির
বাসুকীর
শত শত কণা রসাতল ভেদ ক'রে
উঠেছে দুলে অনন্ত অম্বরে,
তারা
পান করে যেন সেই সুনীল সুধার অক্ষর-ধারা ;

যেন কোন খেয়ালী চিত্রকর, আষাঢ়ের
ঘনীভূত মেঘের
রঙের পাত্র শূন্য ক'রে নিয়ে
ধূম-কেতুর পুচ্ছের মত বিশাল তুলি দিয়ে
ঐ অভ্রংলিহ রেখার সারি করেছে অঙ্কিত,
তারি চূড়ায়
শাখায় শাখায়
করেছে তরঙ্গিত
হরিদ্বর্ণ রশ্মিবিকীর্ণ তীক্ষ্ণ-ধার
পাতার
ত্রিকোণ মণ্ডলিকাছন্দের নীহারিকাপুঞ্জ; সেখানে বিষাণ
বাজায় বাতাস, দোলে বিজয় নিশান;

তাদের
সর্ব্বঅঙ্গে পুরু ইস্পাতের
চক্রাকার আবর্ত্তনের
কালজয়ী আবরণ;
নল-কূপের মত তাদের মূল—
এই উষরপিণ্ডপৃথুল
পৃথিবীর জঠরের অতল-তলে
পলে পলে
ক'রেছে সঞ্চিত
মর্ত্ত্য-শ্মশান-মন্থিত
অমৃত।

হে সম্রাট শিল্পী, সুন্দর! কোন অচিন্ত্য লোকের
রহস্যের
বেদিকায় ব'সে আছ তুমি?
এই মরু-বাস্তব ভূমি
তোমার
নিমগ্ন কল্পনার
নির্লিপ্ত আনন্দের
পরম-বস্তু-রসের
রঞ্জনে রঞ্জিত হয়।
জ্যোতির্ম্ময়!
দাও দীক্ষা, অপূর্ব্ব রূপান্তর সাধনের মন্ত্র দাও আমায়;
যে মন্ত্রের শক্তিতে সত্তায়
বিলুপ্ত হবে মেদিনীর
মাতঙ্গ প্রকৃতির
মদমত্ত অভিযান, রাক্ষসী কামনার
বুভুক্ষার
বিক্ষুব্ধ আসক্তি;
জীবনের অভিব্যক্তি

হবে মূর্ত্ত, ঐ বিরাট তাল-বিটপীর নীলাম্বরচুম্বিত আত্মার মত, বর্ত্তিকা
জ্বলবে অন্তরে
ঐ ওজস্বান তৃণ-শিখার অক্ষরে।
দাও তোমার বর্ণমন্দাকিনীর লাবণ্যধারা-নিঝ্‌রিত তুলিকা,
স্পর্শে যার
দীর্ণ ক'রে আমার
কঠিন প্রাণ-খণ্ডের শিলা
মুঞ্জরিত হবে তোমার
অমর্ত্ত্য-মালঞ্চের
মাধুর্য্য মন্দারের
সৌন্দর্য্য লীলা।

অতন্দ্রিতা

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

আমার মুক্ত বাতায়ন তলে আছে বসি' কোন্ গণিকা রূপসী!
দিবা বিভাবরী কামনা-বিলোল অনিমেষ আঁখি রাখে উল্লসি'।
সমুখের পথে যে পথিক যায়,
তারে আনে টানি' মোহিনী মায়ায়,
স্ফুরিত অধরে বিকশিয়া ধরে সম্মোহ সৌদামিনী দীপ্তশিখা;
অঙ্গুলি-সঙ্করণলীলায় হৃদয়-রক্ত তোলে উচ্ছ্বসি'।
আছে বসি' কোন্ গণিকা রূপসী!

চির-দুর্মদা, চির-যৌবনা, চির-সুন্দরী সেই স্বৈরিণী,
বহুবল্লভ-চুম্বনলোভী, অযুতসঙ্গ-সুখসঙ্গিনী।
কত যে স্বপ্নবিভোল তরুণে,
কত শশাঙ্কে, কত যে অরুণে,
কত সুন্দর সুঠামে বাঁধিল সেই বিবসনা বাসনার বাসরিকা;
রূপ-অমরার দেবতাবৃন্দে বন্দী করিল মম উর্ব্বশী।
আছে বসি' কোন্ গণিকা রূপসী!

নতুন কবিতা

ক্রন্দসী—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতী ভবন। একটাকা বারো আনা।

আধুনিক বাঙালির কাব্যসাধনার বিশেষ একটা দিক ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কয়েকজন সজীব ও সক্রিয় কবি আছেন, যাঁদের প্রচেষ্টা বলশালী উচ্চারণের দিকে, কঠিন উজ্জ্বলতার দিকে, এবং আঙ্গিক কৌশল যাঁদের শব্দপ্রয়োগে মিতব্যয়িতা ও অদ্ব্যর্থ নৈপুণ্য। এঁদের ছন্দও তাই কানে-কানে-টানা ধনুকের ছিলার মতো টান, কোনোখানে একটু ঢিলে হবার উপায় নেই। মাথা খাটিয়ে এঁরা কবিতা লেখেন, এবং সেই শ্রম ধরা পড়লে লজ্জিত হন না। কবিতাকে জটিল ও দুর্গম, তথ্যবহ ও শাস্ত্রজ্ঞানসাপেক্ষ এবং সর্বোপরি নানা অ-বাঙলা সংস্কৃত শব্দে ও পরিভাষায় আকীর্ণ করতে এঁরা কুণ্ঠিত নন; রচনাবিন্যাসের অন্যমনস্কতারই কোনো প্রশ্রয় নেই এঁদের কাছে।

এই শ্রেণীর কবির মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে—এবং সম্প্রতি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনার কঠিন উজ্জ্বলতা আমার ভালো লাগে—যদিও স্বীকার করবো কখনো এঁদের কোনো-কোনো কবিতা ভালো বুঝতে পারিনে। শক্ত হ'য়ে চেয়ারে ব'সে নানা পুঁথিপত্র অভিধান ঘাঁটলে তবে হয়তো এই জাতের কবিতা সম্পূর্ণ বোঝা যায়; কিন্তু সেই ধরণের 'বোঝা'র উপর আমার বিশেষ আস্থা নেই। সত্যি বলতে, কবিতা 'বোঝা'টাই যে সমস্ত কথা—এমন কি মস্ত কথা—তাও আমি মানতে ইচ্ছুক নই। কোনো কবিতায় শুধু ছন্দের দোলাটাই হয়তো উপভোগ করি; কোনো কবিতা বিশেষ একটা উপমা কি রূপক-ব্যঞ্জনার জন্যেই মূল্যবান মনে হয়; কোনো কবিতার দুটো লাইন হঠাৎ মনের মধ্যে এমনভাবে গাঁথা হ'য়ে যায় যে পথে চলতে-চলতে হঠাৎ নিজেকে তা গুনগুন করতে শুনি। তখনই বুঝতে পারি সে-কবিতায় কিছু খাঁটি জিনিস আছে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও আমার উপভোগের মধ্যে বরাবর একটা ব্যবধান দেখতে পেয়েছি। তাঁর কবিত্বশক্তিকে স্বীকার ও সম্মান না-করা অসম্ভব; কিন্তু আমার উপভোগটা প্রায়ই হয়েছে অসম্পূর্ণ। প্রথম কথা, আমি ভালো সংস্কৃত জানিনে; অনেক শব্দ আমার মনে কোনো প্রতিধ্বনি জাগায় না; তা ছাড়া, অনেক সূক্ষ্ম ও সুদূর উল্লেখ আমার অজ্ঞতার জন্যেই আমার কাছে অর্থহীন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক সহানুভূতির অভাব; তাঁর ও আমার মেজাজে মিল নেই। তবু এ-কথা বলতেই হবে যে যখনই তাঁর কবিতা পড়ি তখনই মনে-মনে প্রশংসা না-ক'রে পারিনে। 'অর্কেষ্ট্রা'র আঙ্গিক অভিনবত্বে, ছন্দের দুঃসাহসী কৃতিত্বে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। 'ক্রন্দসী'তে আরো খানিকটা পরিণতি পাওয়া গেলো।

পরিণতিটা বিষয়বস্তুর। কবি বুদ্ধিজীবী সন্ন্যাসী, পৃথিবীর মায়ায় বিমুখ, পরমের সন্ধানী। অনেকগুলি কবিতাতেই আছে নিষ্ঠুর আত্মপরীক্ষা। 'প্রার্থনা' 'প্রশ্ন' 'অকৃতজ্ঞ' এ-সমস্ত কবিতায় স্থাপিত সমাজবিধি ও সংস্কারের সারাম আশ্রয়ের উপর তিনি প্রগতিক বিদ্রূপের কশা চালিয়েছেন। খুঁটে-খুঁটে দেখেছেন নিজের জীবনের ব্যর্থতা। মায়াবী জীবন অতি তুচ্ছ জিনিস দিয়ে তাঁকে ঠকাচ্ছে।

সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে
চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে। ('জাতিস্মর')

সিনেমা থেকে বেরোতে ভিড়ের মধ্যে 'চির অপরিচিতা' দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো—

শুধু তুমি অন্তর্হিত; ভ্রষ্ট লগ্ন; সমাপ্ত সুযোগ।
আবার নিষ্ফল হলো আজন্মের বিরাট উদ্যোগ॥ ('সিনেমায়')

তাঁর উপলব্ধির শেষ কথা এই:

জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্ব্বিকারে, নির্ব্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী; ('নরক')

কবির মধ্যে একটা অস্থিরতা এসেছে। এই কবিতাগুলি সন্ধানের। কিসের সন্ধান? নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ, আবেগবর্ণহীন প্রজ্ঞার। তাঁর আদর্শ সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা, জীবনের সুখ দুঃখ ভয় আশার অতীতে এক 'অনাম চিরসত্তা।'

জীবনগণিকা
ঘৃণ্য সংক্রামক ব্যাধি প্রসাধনে ঢেকে,
সার্ব্বজন্য অভিসারে ডেকে
ভুলাবে কি পুনর্ব্বার আত্মহারা পুরাণপুরুষে? ('প্রত্যাখ্যান')

জীবন নানা রঙের নানা ছলনায় ভোলায় ব'লে তাকে তিনি ঘৃণা করেন, কিন্তু তাঁর অভীষ্টও সিদ্ধ হয় না। 'নির্গুণ নির্ব্বাণে'র অবস্থায় মনে হয় কখনোই বুঝি পৌঁছনো যাবে না। এক জায়গায় গভীর বিতৃষ্ণায় তিনি স্বীকার করেন—

নাই নাই মৌন নাই, সর্ব্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ;
নির্ব্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় জ্বলন্ত হৃদয়;...
কৃত্রিম কল্পনা ত্যাগ; নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন,
অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা। ('সৃষ্টিরহস্য')

অর্থাৎ, সৃষ্টিটা যে চলছে সেটা জ্বলন্ত হৃদয়ের বাসনার জোরেই, নিরাসক্ত শ্বেত বুদ্ধির জোরে নয়। ব্যর্থতা ও হতাশা তাই কবির নিজের ভাগ্য ব'লে মেনে নিয়েছেন।

আদর্শ হিসেবে এটা আমার একেবারেই পছন্দ হয় না। এই বুদ্ধিজনিত বৈরাগ্যের সমাপ্তি বন্ধ্যা ধূসরতায়, এই আমার বিশ্বাস। কবির পক্ষে এটা বড়োই বেমানান। জীবনের সমস্ত উপঢৌকন ত্যাগ ক'রে কবি কোথায় পৌঁছলেন? কোনোখানেই না।—কী পেলেন তার বদলে? কিছুই না। কী তাঁর দেবার আছে? কিছুই না। এই পৃথিবীতে আমাদের বিচিত্র জীবন-লীলার নানা কোণে-ঘুপচিতে, নানা আবছায়ায়, নানা আঁকাবাঁকায় ও ইঙ্গিতে আলো ফেলবেন যে কবি, যে-কবি জীবনকে দেখবেন ও দেখাবেন, জীবনকে ভালোবাসতে শেখাবেন, ভালো ক'রে, আরো ভালো ক'রে বাঁচতে শেখাবেন, সামাজিক দিক থেকে সেই কবির রচনাই সব

চেয়ে সার্থক। আমরা কবির কাছ থেকে জীবনের পাঠ নিতে চাই; যে-শক্তিশালী কবি সেটা দেন না, জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তাঁকে অভিযুক্ত করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে।

একটা কথা মনে হয়: সুধীন্দ্রনাথ কি এ-জীবনের কথা কখনোই কিছু বলবেন না, যেখানে আছে ফুল আছে শিশু, আছে বৃষ্টি আর রোদ; আছে হঠাৎ খুসি হওয়া; আছে মানুষের আশা, চেষ্টা, জয়োল্লাস, আছে ক্লান্তি ও পরাজয়, আছে দুঃখ ও মৃত্যু। এটা কেমন ক'রে হ'লো যে এই অপরূপ চিরন্তন রহস্যের মধ্যে তিনি শুধু কালের নির্মম ধ্বংসকেই দেখতে পেলেন, নিছক মৃত্যুকে, আর দেখলেন বিশুদ্ধ জৈবধর্মমাফিক 'আলিঙ্গন—পুনরালিঙ্গন'! সুধীন্দ্রনাথের রচনায় এমন কোনো উপমা কি রূপক-মূর্তি নেই যা আমাদের চির-পরিচিত কোনো অভিজ্ঞতাকে নতুন ও চিরন্তন ক'রে সৃষ্টি করে; এমন কোনো বিচ্ছিন্ন পংক্তি মগজে এসে লাগে না যার ধাক্কায় সহস্র অস্পষ্ট ও অচেতন স্মৃতি মর্মরিত হ'য়ে ওঠে।

সুধীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলছেন: 'আমার আনন্দ বাক্যে।' কথাটা সত্য। কিন্তু যে-অপূর্ব জাদুতে কবিতার বাক্য মন্ত্রের মতো শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে, যাতে কয়েকটি কথার সংযোজনায় জীবনের কোনো গূঢ়প্রদেশ উদ্ভাসিত হয়, সেটা তাঁর মধ্যে নেই। কথাকে তিনি ব্যবহার করেন মিস্ত্রি যেমন ক'রে ইঁট ব্যবহার করে; অতি সাবধানে কথার পর কথা সাজিয়ে তিনি কবিতা গঠন করেন, তাঁর মন তার্কিকের, তাত্ত্বিকের, তাঁর কবিতা ঠিক যতটুকু বলে তার বেশি বলে না, কবিতা শেষ হ'য়ে যাওয়ার পরে ইঙ্গিতের অন্তরাগ কিছু থাকে না। গদ্যের ন্যায়সম্মত ধরণটা তিনি কবিতায় আরোপ করেছেন। সেইজন্য, যদিও দেখতে দুর্বোধ্য, শব্দার্থ ও উল্লেখগুলো আবিষ্কার ক'রে নিয়ে আস্তে-আস্তে পড়লে তাঁর কবিতা খুবই সহজ, আমার মনে হয় অত্যন্তই বেশি সহজ। দর্শনের কোনো যুক্তির মতোই তাঁর কবিতাকে অনুসরণ করা যায়: ঠিক যেখানে শেষ হ'লো, সেখানেই ফুরোলো, আর-কিছু নেই। প্রতিটি কথার, প্রতিটি কবিতার 'অর্থ' অতি স্পষ্ট সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট।

সুধীন্দ্রনাথ কুশলী নির্মাতা, তাঁর কবিতা একেবারে নীরন্ধ্র শক্ত, যাকে বলা যেতে পারে সলিড। ছন্দে তাঁর অসাধারণ নিপুণতা; আঠারো মাত্রার পয়ারে আট-দশ-এর নিখুঁত ভারসাম্য আলেকজাণ্ডার পোপের কথা মনে করিয়ে দেয়:

মেঘার্ত্ত পাণ্ডুর শশী; শঙ্কাকুল শ্রাবণশর্ব্বরী;
নিঃস্পন্দ নিরিক্ত কুঞ্জ; পরিত্যক্ত অচ্ছোদ সরসী ('কুক্কুট')

চতুর অনুপ্রাসে, ব্যঞ্জনবর্ণের ঠাসবুনোনে তুচ্ছ বিষয়কেও ধ্বনির কল্লোলে গম্ভীর ক'রে তোলবার কৌশল তাঁর জানা আছে:

ডাহুক, সারসী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কাদম্ব, কুলাল
নির্ব্বিঘ্ন তিব্বতপানে নিরুদ্দেশ আসন্ন দুর্দ্দিনে।
চক্রচর চর্ম্মচটী লুক্কায়িত দুশ্চর বিপিনে।
প্রেতসঞ্চরিত কক্ষে চিত্রার্পিত সারিকা বাচাল। ('কুক্কুট')

'ক্ষতির সহিত ক্ষতি, অপচয়সনে অপচয়', এ-রকম দুর্বল লাইন 'ক্রন্দসী'তে আর বোধ হয় পাওয়া যাবে না, পয়ারের উপর সত্যি তাঁর নিখুঁত দখল। এ-বইয়ের যে-কবিতাগুলো বিশেষরকম ভালো, যেমন 'প্রার্থনা', 'প্রশ্ন', 'মৃত্যু', 'ভাগ্যগণনা', 'নরক', 'প্রত্যাখ্যান', সবই অসমমাত্রার পয়ারে লেখা, ঝোঁকটা নাটকীয় উক্তির। ছন্দের গতি অবাধ ও মন্থর, স্বচ্ছন্দ ও গম্ভীর। কিন্তু কয়েকটি পংক্তি সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানিয়ে রাখছি:

জন্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভীড়ে ('মৃত্যু')
হিরণ্ময়ের ক্ষয়ে সীসকের পরমায়ু বাড়ে ('পরাবর্ত্ত')
অসূর্য্যম্পশ্যরূপা পরাণপ্রিয়ার ('প্রশ্ন')

আমার মতে এ-সমস্ত লাইন নিশ্চয়ই ছন্দপতন।

তিনমাত্রার ছন্দেও কবির হাত খুব ভালো।

বর্ব্বর বায়ু চিরায়ু অচলচূড়ে ('জাতিস্মর')
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি ('উঠপাখী')

এত ভালো লাইন একজনের কাছ থেকে খুব বেশি আশা করা যায় না। তিন মাত্রার ছন্দে লেখা তাঁর 'জন্মান্তর' কবিতা ('কবিতা': ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) এ-বইয়ে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম। কী-

কারণে সুধীন্দ্রনাথ ও-কবিতা বাদ দিয়েছেন জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় বাদ দিয়ে 'ক্রন্দসী'কে ততটুকু দরিদ্র করেছেন।

ছন্দের প্রসঙ্গে এ-কথাও বলতে হবে যে ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ সুধীন্দ্রনাথের একেবারেই আসে না, এবং কেন যে তিনি তাতে লিখেছেন সেটাই আমার আশ্চর্য্য মনে হয়। অমন চমৎকার পয়ারের পাশে

সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা,
সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলা বাঁচা,
বাঁচা, কেবল বাঁচা। ('বিরাম')

ছিলোনাকো অন্তরে আর আশা;
দুঃস্থ মাথার চিন্তাগুলো কণ্ঠে খুঁজে পাচ্ছিলো না ভাষা;
হচ্ছিলো বোধ অবুঝ হৃদয়খানা ('বর্ষশেষ')

এ রকম দুর্বল মেরুদণ্ডহীন পংক্তি সুধীন্দ্রনাথের মতো সতর্ক ও সচেতন কবি কেমন ক'রে মুদ্রিত করতে পারলেন! যে-কবি এমন ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারেন,

হয়তো একদা সেথা মণিময় অমারজনীতে
পাবি, কবি, অকস্মাৎ অজানিত দয়িতের সাড়া। ('পরাবর্ত্ত')

যে-কবি এমন ছবি আঁকতে পারেন,

দীর্ঘায়িত নিশা
বয়স্ফীত বারাঙ্গনাপারা
দুর্গম তীর্থের পথে হ'য়ে সঙ্গীহারা
ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে
দুর্ব্বার অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায় আমার কাঁধে, পরণের শতচ্ছিদ্র কাঁথা
বিষায় জীবনবায়ু সঙ্কীর্ণ কুটীরে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে ক্ষণে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন তার সন্ত্রস্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোর জাতিস্মর অবচেতনায়। ('নরক')

তিনি শুধু শক্তিমান নন, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, ও সেই শক্তির উপর সম্পূর্ণ অধিকারও অর্জন করেছেন। তাঁর পক্ষে ঐ ভাঙা-ভাঙা ছন্দে বোবা হ'য়ে পড়াটা বড়োই শোচনীয়।

এ-কথা ব'লে এ-আলোচনা শেষ করবো যে বাঙলা কবিতার নতুন পরিণতির ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথকে একজন প্রধান কর্মী ব'লে মেনে নিতে এখন আর বাধা নেই। তিনি সক্রিয়, তিনি পরিণতিশীল, তিনি আন্তরিক পরিশ্রমী। তাঁর কবিতা ভালো ক'রে পড়বার ও বিশেষরকম আলোচনার যোগ্য; তাঁর নির্মাণের কলাকৌশল, তাঁর জমাট ও জমকালো গঠনভঙ্গি আমাদের এই অতি শিথিল অতি তরল রচনার দেশে সত্যই মূল্যবান। নিশ্চয়ই তিনি এখানেই থামবেন না, নিশ্চয়ই তাঁর কবিত্বশক্তির বিবর্তনে একদিন তাঁর 'ভগ্ন বৃত্ত পূর্ণ' হবে; তাঁর অন্তরের এই ব্যর্থতার গ্লানিমা কেটে গিয়ে জ'লে উঠবে নতুন আশা ও উদ্দীপনার আলো।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন। ৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কবিতা

তৃতীয় বর্ষ   পৌষ, ১৩৪৪   দ্বিতীয় সংখ্যা

অলস মিলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিন তুমি দূরের ছিলে মম,
তাই ছিলে সেই আসন পরে যা অন্তরতম।
অগোচরে সেদিন তোমার লীলা
বইত অন্তঃশীলা।
থম্‌কে যেতে যখন কাছে আসি,
তখন তোমার ত্রস্ত চোখে বাজত দূরের বাঁশি।
তোমার ছায়া আমার মনে ফিরত চুপে চুপে,
কায়া নিত অপরূপের রূপে।
আশার অতীত বিরল অবকাশে
আসতে যখন পাশে;
একটি ফুলের দানে
চির ফাগুন দিনের হাওয়া আনতে আমার প্রাণে।

অবশেষে যখন তোমার অভিসারের রথ
পেল আপন সহজ সুগম পথ,
ইচ্ছা তোমার আর নাহি পায় নতুন জানার বাধা,
সাধনা নাই, শেষ হয়েছে সাধা।

তোমার পালে লাগে না আর হঠাৎ দখিন হাওয়া ;
শিথিল হোলো সকল চাওয়া-পাওয়া।
মাঘের রাতে আমের বোলের গন্ধ বহে যায়
নিঃশ্বাস তার মেলে না আর তোমার বেদনায়।
উদ্বেগ নাই, প্রত্যাশা নাই, ব্যথা নাইকো কিছু,
পোষ-মানা সব দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু।
অলস ভালোবাসা
হারিয়েছে তার ভাষাপারের ভাষা।
আছে এখন ঘরের কোণে আধা কলস মাত্র,
নাই সেদিনের ঝরনাতলার চির-উছল পাত্র।

মুহূর্ত্ত

নিশিকান্ত

হোক সে মুহূর্ত্ত, হোক সে ক্ষণ-কাল, তবু জানি, সেই মুহূর্ত্তটিতে
ধন্য আমি, সে মুহূর্ত্তে আমার মর্ত্ত্যজীবনের মাটির কলসী
পরিপূর্ণতায় 'চ্ছলিত সুধার আধার ; শুধু সেই অমৃতবিন্দুর
উপলব্ধিতে দেহ অলৌকিক, অঙ্গের প্রতিটি রক্ত কণিকা
রূপান্তরিত তার স্পর্শমণির
পরশে ; অনুভূতির সঞ্চারে
তারি দীপকের বিবস্বান ঝঙ্কার।

প্রিয় ! এই যে নির্ঝরিণীধারা অবতীর্ণ আজ আমার কণ্ঠতলে,
যে প্রাপ্তির মন্ত্র প্রতি প্রশ্বাসের উত্থান-পতনে উচ্চারিত হয়,
উৎসারিত এই যে-অনাহত সুগম্ভীর ধ্বনির তরঙ্গ-সঙ্গীত,
অবরুদ্ধতার এই যে সহস্রদুয়ার অকস্মাৎ উন্মুক্ত হ'ল,
গোপন-মঞ্জুষার উজ্জ্বল অন্তরের
মাণিক্য-মালার সন্ধান পেয়েছি,
এই অন্তর্জ্যোতি…এ ত নয় শুধু

মানসের স্বপ্নের নিষ্প্রাণকল্পনার ইন্দ্রজালদোলা বিলাসের মায়া।
হে অধর! তুমি ধরা দিয়েছ এই বসুন্ধরার বাস্তববেদিকায়
এই দেব-দুর্লভ নর-লীলাতে ; তোমার জ্যোতির্ম্ময় অভ্যুত্থানে আজ
স্পর্শ করেছ বন্দিনী-পৃথ্বীর এই শৃঙ্খলিত তমিস্রার বন্ধন।
হে বন্ধু! তোমার পাবক-চুম্বনের
পুণ্য-আবেগে জাগ্রত আমার
হৃদয়ে প্রেমের রক্ত-মঞ্জরী।

সে মঞ্জরী পার হ'য়ে এসেছে উত্তপ্ত-ধূসর মরুভূ-বিস্তার,
নিরুত্তাপ পাংশুবর্ণ তুষারের মেরুর মুমূর্ষু-প্রাণে
বহ্নির অমৃত ঢেলে এলো সে, দুর্গম অনতিক্রমনীয়তার
উত্তুঙ্গশিখর লঙ্ঘন করেছে, করেছে মন্থন কণ্টকাচ্ছন্ন
অরণ্য-পন্থা, তার এক পলকের
প্রল্লাস বিবর্ত্তন-বারিধির দৃপ্ত
অধিকার তুচ্ছ কোরে দুলেছে

জন্মজন্মান্তর পারের ঈপ্সিত-লোকে ; এ মুকুল নন্দন-মালঞ্চের
মন্দারবিজয়ী গন্ধের অধিকারী, এই যে রঞ্জিত-আনন্দের গোলাপ…
এ যে অচিন্ত্যস্বরূপের প্রসূন…ভাগবত-মর্ম্মের স্ফুরন্ত-প্রভার
নবারুণরক্তিম মাধুর্য্য অনলসঞ্চিত, এ যে মূর্ত্ত করেছে
মানব-জীবনের শাশ্বত-বিকাশ-
বাণী, যে-জীবন অমৃতের পুত্র,
প্রকাশের সূর্য্য, অনন্ত-প্রজ্ঞার

সিন্ধু যার চিত্তে। হে প্রিয়! আত্মার এই জাগরণে যে সুর মন্দ্রিত
হয়েছে আমার নর্ম্ম-মুরলীর নন্দিত রন্ধ্রে, এই দেহ-বীণার
তন্ত্রে তন্ত্রে যে রাগিণীর ঝঙ্কার, তার তালে তালে, তানে, গমকে
ধ্বনিত করে এই সমর্পিত সত্তার শত গান। যে মুহূর্ত্তে এই
অপূর্ণ-পরাণ শরণ নিয়েছে
তোমার চরণে, যে মুহূর্ত্তে জপ
করেছি তোমার দীক্ষামন্ত্র, সেই

মুহূর্ত্তেই আমি দাঁড়িয়েছি এই সুখদুঃখসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের
সংঘাতক্ষুব্ধতার পর-পারে, সে মুহূর্ত্তে আমি পূর্ণতায় উচ্ছল,
অম্বরবিহারী রাজহংসের মত মুক্তপক্ষ, সে মুহূর্ত্তে মিলায়
স্বর্গ আর মর্ত্ত্যের ব্যবধান, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, চক্ষুতারকা
পেয়েছে দ্রষ্টার দৃষ্টি, হয়েছি
উদ্ভাসিত আজ তোমার বৈদূর্য্য-
ধামের প্রাঙ্গণে, আলোর আবর্ত্ত

আমার দশ দিকে ঘিরে ঘিরে নেয় বরণ ক'রে এই চিরন্তন-দীপ্তির
লোকে, হয়েছে অপসারিত অসীম নীলিমার যবনিকা, আর
আদিত্যরূপের আবরণ। সুন্দর! দেখা দিলে আজ, আমার অন্তরে
আকীর্ণ হ'ল তোমার হিরণ্ময়-কান্তির স্বর্ণ-মণ্ডল ; হে বিরাট!
মর্ত্ত্য-মানবের এই উপলব্ধির
সম্পূর্ণতায় হয় তুচ্ছ সহস্র
শতাব্দীর গ্রহনক্ষত্রের প্রোজ্জ্বল

প্রয়াণ। এই ক্ষুদ্র জীবনের বিন্দু ধারণ করেছে আজ প্রবাহিত
ব্রহ্ম-পুত্রের স্রোত···সিন্ধুমিলনের কল্লোলিত গান। হে পাবক! দেখো,
তোমার ওজস্বান-পলকের স্পর্শ হয় শিখায়িত সঙ্গীতের সুরে,
করে জীবনের যন্ত্র ঝঙ্কৃত ; তোমার ঐ কোটি কল্পরচনার
করাঙ্গুলি দল করে উন্মোচন
আমার কল্পনা-কমলকলিকার
বন্ধনী ; দীপ্ত করে তার মৃণাল

উজ্জ্বল বর্ত্তিকার মতো,···অচঞ্চল অতন্দ্রিত সে ; কোনো ছায়া নাই,
অন্ধকার লুপ্ত, দিবা শর্ব্বরী আপ্লুত শুধু একটি রশ্মিতে···
একটি কিরণের গভীরে মগ্ন। একটি নিমেষের মাহেন্দ্রলগ্নের
উদয়-উৎসবে এসেছিল সেই কিরণ, ক্ষণিকের বিদ্যুৎঝলকে
চেতনায় দিল এই বহ্নি দোলা ;
শুধু এক কণা শুভ্র শিশিরের
স্ফটিককপোলে উদিত কালের

তপনের সোনার স্বাক্ষর রঞ্জিত; একটি প্রহরের নিশায় পেয়েছি
বাঞ্ছিত বৃন্দাবনের মধুযামিনীর মিলনে লীলায়িত এই
রাসপূর্ণিমালীন রসের বাসর; আমার নিকুঞ্জকুসুমের বক্ষে
শুধু এক বেলার বিকাশের বৃন্তে চির-বসন্তের প্রণয়ালিঙ্গন;
এক মুঠি ধূলায় ধরেছি আমি
সেই দিগ্বিজয়ী পান্থচরণের
চিহ্ন; ঐশ্বর্য্যের জলধি মূর্ত্ত

এই আনন্দময়-মুহূর্ত্ত-মুক্তায়। হে বিরহী, হে বিরহিণী! এই
মালঞ্চে এসো, এ মঞ্জরীর সৌরভে মধুতে রিক্ততার দুঃখ
ভোলো, দূর করো নিরাশ্বাস ব্যথার বিষাদ; নয়নের
অশ্রুজল মোছো, লোকলোকান্তরের কাঙ্ক্ষিতকান্তের কর-স্পর্শে হও
জাগ্রত, শুধু একটি চুম্বনের
তলে যার অসীম-কালের বিরহ
পূর্ণ হয়, এসো তার কাছে, তারি
অমৃত-প্রেমের ধারা পান করো।

আমি নহি স্বর্গের দেবতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কতোবার! আর কতোবার?
কতোবার ক'বো এক কথা?
আমি নহি স্বর্গের অভ্রান্ত দেবতা,
তবু তুমি বৃথা বার-বার
আমার অন্তরে চাহ ঈশ্বরের অন্ধ উদারতা!

চারিদিকে অবজ্ঞার একি অমানিশা!
তোমার বুকের মধ্যে মোর চোখ হারায়েছে দিশা,—
সেই দুঃখ যদি বড়ো হয়,
মোরে আর ক্ষমিবে না তুমি?
রাখিবে না স্নেহের সঞ্চয়?
আমার প্রলুব্ধ দৃষ্টি যদি তব সুপ্রচ্ছন্ন স্তনপ্রান্ত চুমি'
মুহূর্ত্তের মধুস্বাদে ভ'রে নেয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার,
দেহে আনে বাসনার বিহ্বল জোয়ার,
কখনো কি ক্ষমা নাই তার?

বলেছি তো! আমি নহি স্বর্গের উন্মুক্ত দেবতা,
তবু তুমি কেন বার-বার
আমার অন্তরে চাহ ঈশ্বরের অন্ধ উদারতা?
ওই তব কুমারীর কমনীয় দেহ
একদিন লভিবে তো কেহ?
কিংবা ক্রূর কালচক্রে অকস্মাৎ কোনো একদিন
তব স্নিগ্ধ তনুজ্যোতি বিনিঃশেষে হবে তো বিলীন?
অনাগত দিবসের ওই সব কথা
মনে-মনে ভেবো একবার:
দেখিবে তোমারও দেহে মোর সব হৃদয়ের ব্যথা
ধ্বনিয়া উঠিছে বার-বার!

আজ এই চাঁদ-ছোঁয়া অন্ধ অন্ধকারে
আপনার শ্রীদেহের সম্পদে সম্ভারে
কী অজস্র এলোমেলো অপরূপ তুমি:
আমার বিহ্বল দৃষ্টি যদি তব অনাবৃত স্তনপ্রান্ত চুমি'
দেহে আনে কামনার রক্তিম জোয়ার,
মুহূর্তের মধুস্বাদে ভ'রে নেয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার,
কখনো কি ক্ষমা নাই তার?

শিশিরের সাথে মিশে সুরভিত চুলের সুবাস,
রজনীরে করে রুদ্ধশ্বাস,
নমনীয় চারু চোখ, শুভ্র গ্রীবা, স্তনযুগ, আরক্ত অধর
বক্ষে মোর ঢেউ তুলি' রক্তস্রোত করে তীব্রতর!
সব কথা অকপটে বলিবার নয়,
আমারি রক্তের ঢেউ আমি করি ভয়!

কতো বার, আর কতো বার,
আমারে ফিরায়ে দেবে? কোন ছলে, সুকৌশলে
চাঁদ-ছোঁয়া অন্ধকার-তলে
ক্ষিপ্র পদে কম্প্র হাতে
রুদ্ধ করি দিবে তব দক্ষিণ দুয়ার?

আমি নহি স্বর্গের অভ্রান্ত দেবতা,
তবু তুমি বৃথা বার বার
আমার অন্তরে চাহ ঈশ্বরের অন্ধ উদারতা।

আমার অবোধ ওষ্ঠ যদি তব মধুওষ্ঠ চুমি
মুহূর্ত্তের মধুস্বাদে ভ'রে নেয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার,
দেহে আনে কামনার কবোষ্ণ জোয়ার,
কখনো কি ক্ষমা নাই তার ?
ওইখানে ভুল !
আমাকে ভেবেছো তুমি নিরুপম দেবতা অতুল !
মোর দুই উপবাসী আঁখি
তোমার উরুতে খোঁজে কামনার অদ্ভুত ইসারা,
তব যুগ্ম পূর্ণ পয়োধর—কী ধারণ করিয়াছে তারা ?
সব কথা অকপটে বলিবার নয়,
আমারি রক্তের ঢেউ আমি করি ভয় !

আজ এই অন্ধকার আকাশের তলে
অনঙ্গের শরবিদ্ধ পলাতক আমি,
রাখি মোর ভীরু মুখ তব কম্প্র তুঙ্গ বক্ষঃস্থলে
দীর্ঘ রাত্রি যামি'
অস্থির আবেগে যদি চাহি তব দেহের নির্য্যাস
হবে পূর্ণ মোর অভিলাষ ?

নির্ব্বিঘ্নে বুলায়ে এক রক্ততপ্ত চম্পক অঙ্গুলি
বাসনার স্বেদ আর লালসার ধূলি
নিঃশেষে মুছিয়া নেবে—তাই নেবে নাকি ?
হে উষ্ণ কোমল পাখি,
আজ এই অন্ধকার আকাশের তলে
কোন ছলে, সুকৌশলে
রুদ্ধ করি দিবে তব দক্ষিণ দুয়ার ?

বিমুখ কোরো না মোরে,
তোমার অজস্র স্মৃতি আজ মোর স্বপ্নের ভিতরে
বিদ্যুতের মতো বেগে যথা ইচ্ছা ঘোরে,
আর মোর দিনের চিন্তায়
পাখির আবেগে যেন ডানা ঝাড়া দেয়।

মধ্যাহ্ন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আলিসার নড়বড়ে ছাদে
ছোট ছেলেদের দুরন্ত দাপাদাপি :
দূরের অগ্নিবর্ণ লৌহ চিমনীর
অস্পষ্ট তামাটে ধূম্রচ্ছায়া
ঊর্দ্ধ আকাশের শীর্ষে
ক্রমশ স্বতন্ত্র সামিয়ানা প্রসারিত করে।

দুরন্ত ছেলেদের দাপাদাপি
পরে স্তিমিত হ'য়ে আসে,
এইবার অলস মধুর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন :
বাইরের বারান্দায়
উদ্বৃত্ত অন্নের আক্রোশে
কৃষ্ণবর্ণ কাকের কলুষিত আর্ত্তনাদ ;

কবিতা
পৌষ, ১৩৪৪

রৌদ্রমাখা হলদে ঘাসে
ছনের গোয়ালের ছায়া
তন্দ্রাতুর তির্য্যক আশ্রয় ছড়ায়।

বয়স্করা ঘুমের আরাধনা করে,
সন্তানবতীরা শিশুদের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত,
আর অন্দরের আনাচে কানাচে
কাকচক্ষুকে পর্য্যন্ত প্রতারিত ক'রে
সঙ্গলিপ্সু স্বামীরা সতীদের সান্নিধ্য খোঁজে।

শীত রাত

জীবনানন্দ দাশ

এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে ;
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা,
কিংবা পেঁচার গান : সেও শিশিরের মত, হলুদপাতার মত।

শহর ও গ্রামের দূর মোহানায় সিংহের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে :
সার্কাসের ব্যথিত সিংহের।

এদিকে কোকিল ডাকছে—পউষের মধ্য রাতে ;
কোনো একদিন বসন্ত আসবে ব'লে— ?
কোনো একদিন বসন্ত ছিল তারই পিপাসিত প্রচার ?
তুমি স্থবির কোকিল নও ? কত কোকিলকে স্থবির হয়ে যেতে দেখেছি
তারা কিশোর নয়
কিশোরী নয় আর ;
কোকিলের গান ব্যবহৃত হয়ে গেছে।

সিংহ হুঙ্কার ক'রে উঠছে ;
সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,
স্থবির সিংহ এক—আফিমের সিংহ—অন্ধ—অন্ধকার।

চারদিককার আবছায়া—সমুদ্রের ভিতর জীবনকে স্মরণ করতে গিয়ে
মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে, কুয়াশার পঞ্জরে হারিয়ে যায় সব।
সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।
কোকিলের গান
বিবর্ণ এঞ্জিনের মত খ'সে খ'সে
চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ।
হে পৃথিবী,
হে বকযন্ত্র,
পাশ ফিরে শোও
কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবে না আর।

হঠাৎ-মৃত

জীবনানন্দ দাশ

অজস্র বুনো হাঁস পাখা মেলে উড়ে চলেছে জ্যোৎস্নার ভিতর
কাউকে মৃত্যু ফেলে দিল
নিচে—অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

রূপসী প্রথম প্রেমের আস্বাদ পেতে যাচ্ছিল :
শোনো—গলার ভিতরে তার মৃত্যুর গোঙ্‌রানি ;
সে নিজেও মৃত্যু যেন,
বিবেক নেই আর তার।

কবি চোখ মেলে বলেছিল :
আমার হৃদয়ের ভিতর ইন্দ্রধনুর মত কত বুদ্‌বুদ্‌,
হিম মৃত্যু এসে চোখ অন্ধকার ক'রে ফেল্‌ল তার।

এই সব হঠাৎ-মৃত্যু
এই সব হঠাৎ-মৃত
আজ এই শীতের রাতের অরণ্যের কিনারে
বিক্ষুব্ধ বাঘের মত গর্জ্জন ক'রে উঠছে যেন।

গর্জ্জন ক'রে উঠছে আমার হৃদয়ের অরণ্যে।

রূপ—প্রেম—খ্যাতি—সুপক্ক রৌদ্রের ভিতর
দাঁতের এনামেলে ঝিকমিক্ ক'রে ওঠে
পবিত্র সমুদ্রের মত ;—
চিরন্তন।

হায়, সোনালি বাঘ-প্রেত,
তোমাদের জন্য শূয়ারের মাংস
শূয়ারের মাংস শুধু ;
মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

স্বপ্নের ধ্বনিরা

জীবনানন্দ দাশ

স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে ব'লে যায় : স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো;
নিস্তব্ধ শীতের রাতে দীপ জেলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে
স্থবিরের চোখে যেন জমে ওঠে অন্য কোন্ বিকালের আলো।

সেই আলো চিরদিন হয়ে থাকে স্থির।
সব ছেড়ে একদিন্ আমিও স্থবির

হয়ে যাব ;—সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে র'ব বিছানায় শুয়ে ;
অন্ধকার ঠেস্ দিয়ে জেগে র'ব
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মত।

স্থবিরতা,—কবে তুমি আসিবে বল ত'।

স্থবির-যৌবন

জীবনানন্দ দাশ

তারপর একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে
কহিবে : তোমারে চাই—তোমারেই নারী ;
এই সব সোনা রূপা মসলিন যুবাদের ছাড়ি
চ'লে যেতে হবে দূর আবিষ্কারে ভেসে।

বলিলাম ;—শুনিল সে :—'তুমি তবু মৃত্যুর দূত নও—তুমি'—
'নগর—বন্দর ঢের খুঁজিছি আমি ;
তারপর তোমার এ জানালায় থামি
ধোঁয়া সব ;—তুমি যেন মরীচিকা—আমি মরুভূমি—'

শীতের বাতাস নাকে চ'লে গেল জানালার দিকে,
পড়িল আধেক শাল বুক থেকে খ'সে ;
সুন্দর জন্তুর মত তার দেহকোষে
রক্ত শুধু? দেহ শুধু? শুধু হরিণীকে

বাঘের বিক্ষোভ নিয়ে নদীর কিনারে—নিম্নে—রাতে ?—
তবে তুমি ফিরে যাও ধোঁয়ায় আবার ;
উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত বিবর্ণ এবার—
বরং নারীরে ছেড়ে কঙ্কালের হাতে

তোমারে তুলিয়া লবে কুয়াশা-ঘোড়ায়।
তুমি এই পৃথিবীর অনাদি স্থবির ;—
সোনালি মাছের মত তবু করে ভিড়
নীল শৈবালের নিচে জলের মাঁয়ায়

প্রেম—স্বপ্ন—পৃথিবীর স্বপ্ন, প্রেম তোমার হৃদয়ে।
হে স্থবির, কী চাও বল তো—
শাদা ডানা কোনো এক সারসের মত ?
হয় তো সে মাংস নয়—এই নারী ; তবু মৃত্যু পড়ে নাই আজো
তার মোহে।

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো এক বিকেলের জাফরান দেশে।
কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধূলো হয়ে গেছে কত ভেসে।
মরণের হাত ধ'রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে !

কমলালেবু

জীবনানন্দ দাশ

একবার যখন দেহের থেকে বের হ'য়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে ?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষু'র বিছানার কিনারে।

তুমি যখন কথা বলো

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

তুমি যখন কথা বলো লীলা
আমি চুপ ক'রে চেয়ে থাকি।
কেমন ক'রে বলো দেখতে দেখতে
কী যে বলো শোনার কথা মনে থাকে না।
এ আমার অবহেলাজনিত অমনোযোগিতা নয়
তোমার বলার ভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ ক'রে রাখে।
তাই তো তুমি যখন প্রশ্ন করো : কী বলছিলুম বলো তো?
আমি মৌন হ'য়ে থাকি।
কী তুমি বলছিলে না-ই বা বলতে পারলুম
আমি তো বলতে পারি
কতোবার তোমার অধরের তিলটি নেচে উঠলো
কেমন ক'রে কুঞ্চিত হ'লো তোমার অপরূপ ভ্রূযুগল
আর আমার মনের বেলা কতোবার উদ্বেলিত হ'লো
তোমার উচ্ছ্বসিত হাসির ঢেউয়ে।

চিঠি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

তোমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো চিঠি লিখি কেন
জানতে চেয়েছ।
কেন বড়ো ক'রে লিখিনে
কেন বেশী ক'রে লিখিনে।
ব্যঙ্গ করেছ হয়তো এ আমার নতুনতরো স্টাইল
আভিজাত্য নতুন ধরণের।
না হ'লে সময় যার প্রচুর, চিঠি কেন তার দীর্ঘ হয় না।
এ বড়ো কঠিন প্রশ্ন।
আমার স্বভাবমুখর লেখনী কেন মূক হ'য়ে যায়
তোমাকে চিঠি লেখার সময়,
কেন কথা খুঁজে পায় না
এর কৈফিয়ৎ দি' কী ক'রে।
লিখতে ব'সে ভাবি : কী লিখি,
কী এমন আছে নতুন তথ্য
যা এখনো তুমি জানো না।
কিছু মনে পড়ে না।

শুধু একটি প্রশ্ন বারে-বারে মনে আসে :
কেমন আছো তুমি।
জানতে ইচ্ছে হয়
তোমার সময় কাটে কেমন ক'রে একা একা।
তোমার চিঠিতে এর জবাব থাকে না।
থাকে, নতুন পড়া উপন্যাসের
আর পুরাতন প্রতিবেশিনীর নির্দয় সমালোচনা।
গভীর দার্শনিক গবেষণা, পৃথিবীর ইতিবৃত্ত
আরো কতো কী।
সবি থাকে, শুধু থাকে না তুমি কেমন আছো।
আমার ভালো লাগে না।
এ তো চলে সাহিত্যের আসরে
মাসিকের পাতায় আর চায়ের টেবিলে।
তারই উচ্ছিষ্টে তোমার চিঠি ভরা দেখে
আমার ভালো লাগে না।
আমার চিঠি চলে পুরানো ধারায় পুরানো পথ বেয়ে
একই প্রশ্ন বারে বারে করি।
আমি জানাই আমি কেমন আছি
আর জানতে চাই তুমি আছো কেমন।

ছোট গল্প

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের মত পীতাভ দিনগুলি
শ্লথগতিতে শেষ হয়।
এখন দিনেও চোখে দেখি নে।
রাত্রের অন্ধকার কালো পাথরের মত জমাট
আর ঠাণ্ডা।
এই ত আমার দিন রাত্রির ইতিহাস।
জীবনের যৌবনাবর্ত্তে
বহু লোককে, বহু মুখকে
শতপাকে জড়িয়েছি।
এখন শ্লথ-গ্রন্থি—
অনেকেই খসে পড়েছে।
ভেতরটা ফাঁকা হল-ঘরের মতো করুণ।
এমন সময় মনে পড়লো
অন্ধকার গলিতে
ঝুল-কালি মাখা
ভাঙা লণ্ঠনের মত তোমার মুখ।

বহু বৎসরের পুরোনো হাওয়াদের
যাতায়াত সেখানে। আর দুর্গন্ধ।
যেন বহুকাল কোনো স্মরণীয়
ঘটনা-না-ঘটার ঝড় বয়ে চলেছে
তার চার পাশে। কেউ সল্‌তেটাও
বাড়িয়ে দিতে আসে না।
এ দেখে মনে পড়ে এক সংস্কৃত শ্লোক।
সে শ্লোকটা এখানে না বল্লেও
এটা বলা যেতে পারে, যে
আমি আর রাকেশলোভন,
বা আরও অনেকে, যারা
না জন্মালেই পারতো এ পৃথিবীতে,
বা জন্মালেও আপত্তি করার কিছু নেই,
তারা ত অমর,
ইজিপ্টের মামিদের মত।
মোটের ওপর,
এ ধরণের জন্মগ্রহণে
পৃথিবীর অন্তঃপুরচারিণীদের
চিত্ত-চাঞ্চল্যের কোনো কারণ ঘটে না।

এর কোনো ক্ষমা নেই,
ক্ষমা করার সুযোগও নেই।
তবু, তবু—এ রকম করে থেকে যাওয়া
বেঁচে যাওয়া,
উৎসবতাড়িত মন নিয়ে—
তোমার কী মনে হয়?—
আত্মহত্যার সুযুক্তিটাও ত মাথায় আসে নি।
মাঝে মাঝে মনে হত
কোনো যুদ্ধে চলে যাই।
এ দারিদ্র্যের যুগে
অতি সস্তায় মরণ লাভ,
বীরত্বের সুনামটাও উপরি।
কিন্তু ছোটবেলায়
বাগদিপাড়ার এক যাত্রার কথা
মনে পড়ে গেল।
টিনের তলোয়ার নিয়ে কী
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ!
আর এক হতে পারতো।

মিনিটগুলোকে
দম দেওয়া সেলুলয়েডের ঘোড়া
বানিয়ে নিয়ে
সারা দিন তার পিঠের ওপর
চড়ে বেড়ানো।
এতে মৃত্যুকেও ফাঁকি দেওয়া গেল,
জীবনকেও ফাঁকি দেওয়া গেল।
কারণ, যে মন বাঁচবে বা মরবে,
সে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়ার পিঠে।
এবং, কোনো এক অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তে,
সে ঘোড়সওয়ারের পতনের কাছে
মরা বা বাঁচা অবান্তর।
কিন্তু দম ফুরিয়ে যাওয়ার
নিরপেক্ষ তত্ত্বটি রয়েই গেল
আকাশটার মত
নীরন্ধ্র, নীল।—

চিলের ঝাঁক, শকুনের ঝাঁক
নামলো মাটিতে
নীল গহ্বর থেকে।
মাণিক রায় মারা গেল বেরিবেরিতে।
সেলুলয়েডের ঘোড়াটা
মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে
ড্রেনের ভিতর। আর,
সাংহাই ভেঙে চুরমার হচ্ছে,
বোমার নিচে।—
কিন্তু এ সব বিতর্কে
তোমার মুখের দিকে
এক পা'ও এগুচ্ছি না।
এখন মনে পড়লে হাসি পায়,
এই মুখ—
বুড়ো বেদানার মত তোবড়ানো মুখ,
বহু অপব্যয়ে কিনতে হয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে
কিনতে হয়েছিল আরও অনেক কিছু—
অপযশ,
অপমান,
অনিদ্রা,
অজীর্ণ,
প্রতিবেশীদের অভদ্র কৌতূহল। ইত্যাদি।
আর তোমার বিশ্রম্ভালাপের স্বরটা
এখনও কানে লেগে আছে।
যেন গভীর রাত্রে,
দূরে কোনো টানেলের ভিতর দিয়ে
ট্রেন চলে গেল। বা
ছাতের ওপর
অন্তত বিশ পঁচিশটা
ডাইনি বুড়ি
যেন সোল্লাসে ঝাঁট দিচ্ছে।

তবু এইটাকেই সাগ্রহে
আঁকড়ে ধরতে পেরেছিলুম
অষ্টভুজের মত।
কারণ সেটাই আমার প্রথম।
তারপর দ্বিতীয়ের আবির্ভাবও
হয়ে গেল।
একে একে বহু মুখ পরিক্রমার পর—
বহু মুখ—
উপন্যাস ও সিনেমা পুষ্ট
পাউডারঘষা মুখ—
এখন ক্লান্ত ও বিরক্ত।
এক একটা অস্পষ্ট বিবর্ণ নাম,
মাঝে মাঝে সময়ের পাহাড়ের গা বেয়ে
নুড়ির মত
গড়িয়ে গড়িয়ে নামে মনের ধারে।
তারপর নিচে অদৃশ্য হয়
এক অতল অন্ধকার কূপের ভিতর।

একটা শেষ পতনের শব্দ পাই—
চু-উ-ম্-ম্।
এককালে হয়ত মনে করা সম্ভব ছিল,
কোনো রাবীন্দ্রিক প্রান্তরে গিয়ে
বাসা বাঁধি।
পাশ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে।
'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' ইত্যাদি।
সে অর্দ্ধ-নিমীলিত জীবনে
মানব-মানবীর চলাফেরা
সম্ভব কিনা জানি না।
মোটের ওপর, অক্সিজেন সিলিণ্ডর
না নিয়ে গেলে জীবন ধারণ অসম্ভব
এটা মনে হয়েছিল।
শেষ অবধি তা' করতে হয় নি।
কারণ ইতিমধ্যে তুমি এসে পড়েছিলে
রক্ত-মাংসের মাহাত্ম্য নিয়ে।

আর সেই অদ্ভুত মুখ—
যাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেও
বাঁচা চলতে পারতো।
একদিন তুমিও ফুরিয়ে যেতে লাগলে
আমার কাছে।
তোমাকে ঘৃণা বা হিংসা করাও
আর গেল না।
সে অনেক দিনের কথা।
আজ আমি ক্লান্ত।
আঘাত দেবার শক্তি হারিয়েছি।
আমার সমস্ত সুখ,
সমস্ত দুঃখ নিয়ে নিভে যাচ্ছি
ধীরে ধীরে।
তোমার ভেতর যে স্থান সঙ্কুলন
এত কম হবে-
আগে তা ভাবিনি।

মাথা তুলতে গেলেই
লাগতো গুঁতো।
দুঃখ এই তুমি আমাকে
ঘৃণা করতে পারতে না।
সহজ আত্ম-নিবেদনে আমাকে
দিবারাত্রি মেরেছ। এখন অবশ্য
সে প্রশ্ন ওঠে না।
তোমার ছাতাপড়া মুখটা দেয়ালে টাঙানো।
হাওয়ায় দুলছে। আর দুলছে সেই
অন্ধকার পুরোনো গলিতে
মর্‌চে-পড়া শিকে ঝোলানো ভাঙা লণ্ঠনটা।
তার গায়ে তৈলাক্ত পতঙ্গশব।
বহু সহবাসী রাত্রির ভগ্নস্তূপ।

পদ্য-পদ্ধতি

পরিমল রায়

'বঙ্কিনাথও পদ্য লেখে'—
ওই কথাটা অমন হেঁকে
বল্লে কেন অজিতবাবু,
ভাবচি যতই হচ্চি কাবু।

জানেন না কি, আরেক হিষ্ট্রি,
পদ্য এবং ডেণ্টিষ্ট্রি
চর্চ্চা ক'রে আরেক কবি
মোটর-বাড়ী কিনলে সবই ?
দাঁতের রুগী প্রথমটাতে
আসতো না তো তেমন হাতে।
উদীন বাবু বুদ্ধি করে'
পণ্ডিত এক আনলে ধরে',
বল্লে তা'কে, "সমাস-বদ্ধ
সমস্‌কৃতের কঠিন শব্দ
চাই, পণ্ডিত, দু'চার হাজার !"

তারপরেই তো পূজোর বাজার।
উদীন্ বাবুর কঠিন পদ্যের
জুটলো এসে অনেক খদ্দের।
কিন্তু, শুনুন, ঘোর অঘটন,
যে-ই করে সে-কাব্য পঠন,
ফটাস্ করে' ভাঙে দন্ত,
অম্‌নি ছোটে হস্তদন্ত
উদীন বাবুর সার্জ্জারীতে!
দন্ত রোগের ডাক্তারীতে
এম্‌নি করে'ই পয়সা-টাকার
আঁকটা হ'ল বৃহৎ আকার।

লোক দেখেছেন এ-সব জাতের?
—তুচ্ছ গপ্প বভিনাথের

কয়েকটি কবিতা

পরিমল রায়

(১)

আমার প্রতিবেশিনী মিসেস্ মজুমদার বড়লোকের স্ত্রী,
সখ করে' সেতার কিনেছেন, বাজাবার জন্যে নয়
ওটা বাড়ীতে রাখা ভাল দেখাবে বলে'।
পাঁজিতে যেদিন পূর্ণিমা লেখে,
কিম্বা বাতাসে যেদিন বসন্ত লাগে,
যন্ত্রটাকে অহোরাত্র লাঞ্ছিত হ'তে হয়,
—ওর আর্ত্তনাদ আমি ঘরে বসে-বসে শুনি।

কিন্তু একদা মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি,
কেতকীর গন্ধে যেন ঘর গেছে ভরে',
আর অন্ধকারের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নূপুর বেজে চলেছে
স্বর্গের কোনো অপ্সরীর নাচের মত!
অপূর্ব্ব স্বরের মূর্চ্ছনা! অপরূপ সুর-তরঙ্গ!
—আজ মিসেস্ মজুমদারের হাতে জাদু লেগেছে!

ভোরবেলায় কিন্তু খোঁজ নিয়ে শুনি,
মিসেস্ মজুমদার গেছেন স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে।
ইন্দ্রবাবু—নিরীহ গো-বেচারী ইন্দ্রবাবু—
(আধুনিকা মিসেস্ মজুমদারের ভাষায়)
ওঁদের ছোট ছেলেটির আবাসিক গৃহ-শিক্ষক যিনি,
চুরি করে' তিনিই বাজাচ্ছিলেন সেতার।
জানতে পেলে চাকুরী যাবে!

(২)

গরজমল সগরমল সিমেন্ট কোম্পানীর কমিটি মিটিং,
দস্যুবৃত্তি লুঠের মাল—আর ক্ষুধার অন্ধকার,
মুনাফার ভৈরবী চক্রে ঘূর্ণী লেগেছে যেন!
ভগ্নাংশের হিসাবে কোথায় যেন একটু ভুল হয়েচে,
আড়াআড়িটা তাই নিয়ে।

এদিকে চাঁদে আর মেঘেতেও লেগেছে আড়াআড়ি,
রাহুর দস্যুবৃত্তি কেড়ে নিয়েছে
কেশর-ফাঁপানো সিংহের মত কালো-কালো মেঘ,

চাঁদের কেবলই হচ্চে হার,
আর আলো-ছায়ার জাদু লেগেছে পৃথিবীতে।
বোধ হয় সেই কাহিনীটার আর্য প্রয়োগেই
সমুদ্রের মধুক্ষরণ আর বাতাসের মধু গন্ধ।

(৩)

আজ বাড়ীতে কয়েকটি মেয়ে এসেছিলেন,
তাঁদের একটিকে দেখতে ভারী কালো আর ভারী কুৎসিত,
অন্ধকারে হঠাৎ চোখে পড়লে হৃদয় শীতল হয়,
—মনে হয়, ইনি বিধাতারও বিড়ম্বনা।

চা-পানের পর গানের আসর যখন বসলো,
আঁচল ঘুরিয়ে, মুখ বেঁকিয়ে, মুচকি হেসে
স্বরু হ'লো নিতান্ত অবধারিত সেই মেয়েসুলভ ন্যাকামী,
যাঁদের রঙ্ একটু ফর্সা,
যাঁদের ঠোঁট একটু পাতলা,
তাঁদের ঢঙ্টাই বেশি দেখবার।

একে-একে গান গাইলেন কিন্তু অনেকেই,
ভালো, মন্দ আর চলনসই।
কালো মেয়েটির পালা যখন এলো
সন্ত্রস্ত হওয়া গেল।
কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে এ কী অপূর্ব্ব বিস্ময়!
মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বরের এ কী অপরূপ ইন্দ্রধনু!
অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মেয়েটির মুখে,
—কুৎসিত মেয়েটি এত সুন্দর!

গদ্য-কবিতা

পরিমল রায়

যেখানে আমার হৃদয়-ভরা দুরন্ত অন্ধকার
তুমি সেখানে জোনাকীর মত কৃপণ!
ভেবেছিলাম তোমার একান্ত ঐশ্বর্য্যে
আমি হ'ব অকিঞ্চন—
কিন্তু তুমি দিলে অভিশাপ,
তাই এলো দারিদ্র্য, এলো হাহাকার,
পূর্ণিমার রাতে আকাশ জুড়ে এলো রাহুর দুঃস্বপ্ন!

কতদিন তোমাকে পাঠিয়েছি কবিতার চিঠি,
—কথার কত কারসাজী ছন্দে আর মিলে!
বলেছি, 'তুমি দেবী, তুমি লক্ষ্মী,
তোমাকে ঘিরে আমার হৃদয়ের শত সমুদ্র
হাজার কলরোলে গান গেয়ে উঠছে।'
কখনো লিখেছি,
'ঝরা পাতায় আকীর্ণ হ'ল বনতল,
ছোট্ট একখানি নীড়
তবু কোন্ যাযাবর এক পাখীর পথ চেয়ে
এখনো গাছের শাখায় মাথা খুঁড়ছে!'

কিন্তু হয়-তো সে-সব কবিতার অর্থবোধ হয়েচে যতটা,
বৈদগ্ধ্যের অনর্থ ঘটেছে তার বেশি।
ভেবেছ, সামুদ্রিক পীড়ায় অসুস্থ হ'য়ে
তোমার কাছে ওষুধ চেয়ে পাঠিয়েছি।
মনে করেছ, শিকল কেটে ময়না পাখী পালিয়েছে,
তোমার কাছে তা'রি শোকে কাঁদুনি গাইছি।

কিন্তু, মা ভৈঃ, মণিকা!
হালে এক নতুন ফ্যাসানের কবিতা লেখা হচ্ছে,
ছন্দ-মিলের বিড়ম্বনা নেই তা'তে,
সহজ ভাবে সোজা কথাটা বলাতেই বাহাদুরী।
এবার সেই ফ্যাসানের কবিতা পাঠালুম তোমাকে—

তুমি কি আমার স্ত্রী হবে, মনিকা?
আমার সঙ্গে বিবাহে আপত্তি আছে তোমার
—অনুর্ব্বর বালুর উপরে, কিম্বা হলুদ ঘাসের মাঠে?
শূকরের চামড়ার মত তোমার ধূসর ও মসৃণ ক্লান্ত উরুতে
কবে এসে নামবো
শীতের শকুনের মতো?

এবারের কবিতা হয়তো বোধ্য হবে সহজেই,
আর জবাবও মিলবে শিগ্‌গিরই,
এতদিন সেকেলে কবিতা লিখে-লিখে
তোমার মনের হদিস্ পেলাম না কিছুই।

সম্বরণ

হেমচন্দ্র বাগচী

দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী শুনি
আর শুনি নারীচিত্তজয়ের কাহিনী
চটুল, চঞ্চল প্রিয়ার হৃদয়-অধিকারের কাহিনী
কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন আর তপশ্চর্য্যা।
সূর্য্যকন্যা তপতীর অগ্নিময় রথের ঘর্ঘর-ধ্বনি শুনতে পাই—
তা'র আলোল কুন্তল্ মহাকাশে পরিব্যাপ্ত।
নিষ্ঠুর, বধির সূর্য্যকন্যা।
সে তা'র মদির যৌবনলাবণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে একাকিনী,
তা'র প্রিয় তা'র কাছে অনাবিষ্কৃত,
আবিষ্কারের আনন্দ তা'র নেই,
যৌবন-সংপূর্ণা নারী—
আকাশে তা'র রথ-ঘর্ঘর শুনতে পাই
নিষ্ঠুর, বধির সূর্য্যকন্যা।

চটুল, চঞ্চল তপতীর হৃদয়-অধিকারের কাহিনী শুনি,
নৃপতি সম্বরণের তপস্যার কাহিনী।
তপতীর অগ্নিময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করে সম্বরণ
কত বর্ষ জীর্ণ পত্রের মত খ'সে যায়।
তপতী তা'র নাম শোনে
সম্বরণের ধ্যানোচ্চারিত নাম।
একদা নামে স্নিগ্ধ সজল বর্ষণ
দিগ্‌দিগন্ত একাকার ক'রে
রথচক্রের অগ্নিবাণী ডুবে যায়।
অগ্নিময়ী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হ'য়ে আসে।
নিষ্ঠুর বধির সূর্য্যকন্যা
তা'র হাতখানি প্রসারিত ক'রে দেয়
সম্বরণ তা'র তপস্যা সার্থক মনে করে।

দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী শুনি
আর শুনি নারীচিত্তজয়ের কাহিনী
সম্বরণের তপঃশীর্ণ যতিমূর্ত্তি দেখতে পাই
নিষ্ঠুর বধির সূর্য্যকন্যার
অগ্নিময় রথচক্রঘর্ঘর শুনি—
আর, মনে হয় অসামান্যা নারীচিত্ত
সহস্রবর্ষের ধ্যানলভ্য।

রাতের চৌরঙ্গী

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

সহর অরণ্যের শেষ প্রান্ত থেকে গভীর রাতে
 যখন এক ফালি চাঁদ তার পটভূমিকা রচনা করে উঠে আসে,
তারই বিষাদমৃত্যু বিবর্ণ আলোতে প্রতিভাত হলো
 বিরাটদেহ ডাইনোসরের অসহায় নিদ্রা।

দিনের সামান্যতম আলোতে ওর দানবিক চেহারাটা যখন জেগে ওঠে
 তখন থেকেই গর্জ্জন করে চল্‌তে থাকে জীবনযন্ত্রের চাকা,
সেই সঙ্গে বিপুলায়ত দেহভারের হাঁসফাস শব্দ
 আর পায়ের থাবার কাঁটাগুলো ঝম্‌ঝম্ করে বাজ্‌তে থাকে।

রাস্তায় বিজলী আলো স্তিমিত, ছায়াচ্ছন্ন হোটেলগুলো :
 হিংস্র পশুর মুখবিবরের দাঁতের সারি ;
বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর সংগ্রাম, সারাদিনের অচেতন মত্ততা,
 মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ এখন তার রাতের বিশ্রাম।

কতো অসহায়, কতো করুণ তার দুর্ব্বল স্বীকৃতি
 শিশুর চেয়েও নির্ভরশীল আত্মসমর্পণ।
গলিত চাঁদের কী অপরিসীম স্নেহস্পর্শ
 ভোরের আঘাতে ওর ঘুম যেন না ভাঙে।

সেরিনাড

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নিবিড় নীরবতায় সবুজ আলো ঘিরে
পতঙ্গের অন্ধ পরিক্রমা।
বাইরে অজানা পোকামাকড়ের নৈশ প্রাণস্ফুরণ।
তুমি কি এখনো ঘুমোবে?
সঙ্কিত আকুতির চাপা হাওয়ায়
ভাঙবে না আফিমের ঘুম?

ওঠো, জাগো—জানো না
অকাল-বোধনশেষে বেদনার আকস্মিক নিরঞ্জন?

কে জানে—হয়তো ভবিতব্যের গুপ্ত গহ্বরে
সুপ্ত আছেন কোনো কাম্য, কৃতী জীব
নধর, চিক্কণ।
যথেচ্ছ ব্যসন আর অকৃচ্ছ জীবন যাঁর করতলে,
করবেন তোমায় কবলিত
লালায়িত সরীসৃপের স্থূল পরিতৃপ্তিতে।

তখন কিছুই বলিনি—বলি এখন।
অপেক্ষায় ছিলাম উচ্চকিত বিদ্যুতের প্রভা
আর কেঁপে-কেঁপে-ওঠা
আসন্নমুকুলা বল্লরীর মতো।

এলো না সে লগ্ন।
তবু—তবু আমি তো দিতে পারতাম
আমার কামনা-স্বপনের পুষ্পিত অনুরাগ,
তারা-ভরা আকাশের আনত-আসঙ্গ,
নীহারপুঞ্জের চূর্ণ চুম্বন
আর অন্ধকার সাগরের হাওয়ায় ভেসে-আসা
সফেন উদ্বেলতা।

জাগো—শোনো।

অবসর

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মধ্যবিত্তের রক্তেও বুদ্বুদ ওঠে।
যখন দেখি গাঢ় নীল আকাশের ওপর দিয়ে
ছোটো ছোটো শাদা মেঘের হাল্‌কা অলস গতি,
হেমন্তের শিরশিরে হাওয়া আর মিঠে আলো—
ছুটি আর আলস্যের স্বপ্ন ঘনায় চোখে।
মনে হয়, সব ছেড়ে তোমায় নিয়ে
পাড়ি দিই সফরে।

পাড়াগাঁয়ের স্তব্ধ দুপুর…
দূরে দিগন্ত-মেশা মাঠে সূচীমুখ রৌদ্রে
বুড়ো চাষা বোঝা-মাথায়
ধুঁকছে তবু চলেছে।
কলা-বাগানের আধ-ছায়ায়
ক্ষেতের নতুন কড়াইশুঁটি খেতে খেতে
আমরা দুজনে তখন হেসেই লুটোপুটি
কী যেন কথায়…

আর এক নির্জন ওয়েটিং রুমে
স্টেশনমাষ্টারের বাগান থেকে তোলা
দোপাটি আর গাঁদাফুলের মালা গেঁথে
গলায় তুমি পরিয়েছিলে।
কাছে এসে দাঁড়ালো এক ভিখারী ছেলে,
চোখ তুলে তাকাতে পারলো না—
লজ্জাসঙ্কোচে নয় দৃষ্টিসঙ্কোচে।
চায়ের পেয়ালা নামিয়ে দেখেছিলুম
দুদিন পরেই হয়তো গলে যাবে তার চোখ
জন্ম-অভিশাপে অথবা অবহেলায়।

পশ্চিমের সহরতলীতে
নদীর আঘাটায় শিশু গাছতলায়
আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলে,
আদর খাচ্ছিলে ধনীদের বেড়ালের মতো।
দূরে ধোঁয়া আর কুয়াশা-ঘেরা পল্লী থেকে
বেরিয়ে এলো জনতা আর কোলাহল।

দেওয়ালীতে দারু পিয়ে
টঙ্গাওয়ালা হয়েছে মাতোয়ালা,
মারছে আর শাসাচ্ছে বৌ-কে।

ভ্রমণ সাঙ্গ হল কতো কী দেখে।
ফিরে এলাম সযত্নরচিত নীড়ে,
আপন হাতে-গড়া সুবিধা-অসুবিধার
আরামপ্রদ উত্তাপে আর কলরবে।

কবেকার সোনালী বিস্মৃতি!
আবার বসন্ত আসবে—
আনবে নতুন চঞ্চলতা,
উভয়ে দেখবো সৌখীন স্বপ্ন মধ্যবিত্ত চোখে।

বেকারবিহঙ্গ

বিষ্ণু দে

অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা?
এ মরা সহরে নীড়সন্ধানী মন
হারায় চতুর উভচর দিশা তার।
চিরকাল কাকতালীয়ের যাওয়া আসা—
কোন্ প্রারব্ধে করেছে সমর্পণ
বহুধাছিন্ন ত্রিশঙ্কু তার ভার।

জানি ত লক্ষ্মী বসতে বাণিজ্যেই
সেই সাধনায় মেনেছে বেচারি হার।
সরস্বতীর পঙ্কজে লাগে কাঁটা।
বিরাট বিশ্বে কবে ডুবে গেছে থেই।
তবু হায় নেই হাতের নাগালে ডাঁটা
নীলোৎপলের অনঙ্গ অধরার।

কৈশোরে ছিল ধর্ম্মঘটের সখ
যৌবনে নয় চট্‌কলে কেরানীও।
বাড়ীতে বাক্য অন্নধ্বংসসার।
মুরুব্বি নেই গ্রাম্য সে উমেদার।
এদিকে শরীরমন হল বরণীয়,
বসন্ত আসে, পাত্রী যে কেউ হোক্।

অতএব ঘুম মেসের তক্তাপোষে।
দৈনিকে দেখা কাজ খালি কোথা কসে'
খেলার নেশায় ভিড় ভরো মাঠ চযে'।
আর দেখো হেসে সিনেমার পস্টার।
এলবর্ট্ হলে সন্ধ্যায় শোনো বসে'
ইতিহাস ঘেঁষে নানাঘাটে উদ্ধার।

তারপরে যদি ক্লান্তিই বাঁধে বাসা
রেডিওসচল ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা
পাণ্ডুর চাঁদে নিভে যায় নব আশা
তবু বিদ্রোহী, খেলো না শকুনিপাশা।
ইতিহভাগ্য জড়াক্ না নাগপাশে—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরো না, অন্ধ, বন্ধ জটায়ু পাখা।

মুকুর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শিরিষের পাতায় পাতায়
বাদুড়ের মত কাঁপ্‌ছে তখন অন্ধকার।
আমার যাবার দিন এলো,
যেন রাত্রি-শেষের তারা।

তোমার নরম আঙুলে ছিল মৌন-ভাষার স্পর্শ,
কান্নার মত কম্পিত নরম ভাষা।
চুপি-চুপি কানের কাছে মুখ এনে বললে—
(তোমার কোঁক্‌ড়া-কালো চুল
আমার কাঁধে আর গালে আর কপালে কর্‌ল চুম্বন):
রাখো না তোমার লরেন্স।

বই বন্ধ হ'ল :
শিরিষের ডালে তখন শ্যাওলার মত ঘন অন্ধকার
আর দূর আকাশে যেন প্রসবের ব্যথা।
পাণ্ডুর আলো এলো যেন দূত
উঠল চাঁদ
আর নিষ্প্রভ হ'ল আশে-পাশের তারা।

নগ্ন চাঁদ উঠে এলো
যেন স্নানের ঘর থেকে এলে তুমি বেরিয়ে।

পৃথিবী তা'র বাঁধা পথে ঘুরবে,
অন্ধ তা'র গতি
ভারী পরিমিত :
আর আমার যাবার সময় এলো
শেষ হ'ল তোমার কাছের দিনগুলি,
যেন রাত্রিশেষের তারা।

কিন্তু শেষ হ'ল কি সব কিছু ?
হয়তো এর পরে যখন বসে' থাকব কোনও পাথরের ওপর,
হাতে থাকবে
রবীন্দ্রনাথ কি শেলী :
তখন সন্ধ্যা আস্‌বে।
আর হঠাৎ চমকে উঠবো যেন কা'র ফিস্‌ফিসে কথায়।
বই হবে বন্ধ :
পূব আকাশে কাঁপবে পাণ্ডুর আলো
আর উঠে আসবে নগ্ন চাঁদ
যেন স্নানের ঘর থেকে তুমি বেরিয়ে এলে
ঝল্‌মলে
ঝকৃঝকে।

নতুন সূর্য্য

অনুপম গুপ্ত

গাছে গাছে ভোরের পাখীদের কলরব উল্লাস
তবু লাবণ্য ঘুমায়,
পেলব বাহুদুটি শিথানে পতিত
প্রিয়তমের কণ্ঠচ্যুত মালার মত।
আর ফুট্‌ফুট্ নরম গর্বিত দুই বুকে
শ্লথ হল শাড়ির শাসন
বালিশে জটিল খোঁপাটি,শিথিল।

পূবের জানালাতে নতুন সূর্য্যের প্রেম
লাবণ্যের গোলাপ-পাপড়ি ঠোঁটে
আলোর কণা কাঁপে,
আর নতুন সূর্য্যের প্রেমে রক্তিম হল
ফুট্‌ফুট্ নরম গর্বিত দুই বুক।

তার সাদা গালে
নতুন সূর্য্যের প্রেম।
ঠোঁটে আলোর কণা।
জলে ওঠে মনের আকাশে আমার
দিনমানের দেদীপ্য রবি
আমার নতুন সূর্য্যের প্রেম,
রাত্রির বিরহ-বিছানো বিছানার কোলে জলে ওঠে
লাবণ্যের ঘুমন্ত জলন্ত তনুছবি।

আমাদের কোঠাবাড়ি

অনুপম গুপ্ত

আমাদের কোঠাবাড়ি
পৃথিবী-দালানের ছাদের আলিসা।

আষাঢ়ের বর্ষণ মুখর মদির দুপুরে
লাবণ্যরে ঘিরে-ঘিরে আমি
কপোতের মত নাচি।
ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে মুখর আমরা প্রেমে
হৃদয়ের গান শুনি বুকে মুখ গুজে সুখে।

কপোত-কপোতীর ছাদের আলিশা
আমাদের কোঠাবাড়ি,
কপোত-কপোতীর মত কূজন-মুখর
আমি আর লাবণ্য।

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

বুদ্ধদেব বসু

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
শেষ তব শীর্ণ ছায়া শুষে নিলো আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য্য।
করো, জয়ধ্বনি করো,
ছিন্ন হ'লো ঘন অন্ধকার
মেঘবর্ণ মেখলা লুণ্ঠিত—
ঐ এলো প্রেমিক বণিক-বীর
তব নগ্ন কৌমার্য্যেরে ত্বরিতে করিতে
সভ্যতাসন্তানবতী
দীর্ণ তব হৃৎপিণ্ডের রক্তের যৌতুকে।

হে আফ্রিকা, হও গর্ভবতী।
আনো আনো বাণিজ্যের জারজেরে
দ্রুত তব অঙ্কতলে।
পূর্ণ হোক্ কাল।

স্থূলোদর লোলজিহ্বা লোভ
আত্মস্ফীত বাণিজ্যের বীজ
হোক পূর্ণ হোক।
করো,
বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক বিকৃত জাতক
তার জয়ধ্বনি করো।
উন্মত্ত কামার্ত্ত ক্লীব, আত্মরক্ষা আত্মহত্যা তার।

হে আফ্রিকা,
অবসন্ন বণিকবৃত্তির নিহিত মৃত্যুর 'পরে
বিদ্যুৎ-চমকে
কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।
হে আফ্রিকা, হে গণিকা-মহাদেশ,
একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখার
শতাব্দীর পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়।
করো,
মৃত্যুরে মন্থন করি' নবজন্ম কাঁপে থরোথরো
জয়ধ্বনি করো।

পুনরুজ্জীবন

সমর সেন

(১)
শান্ত-নীল চোখে জীবনের ক্লান্তি,
সেই পুরাতন স্পন্দমান বাসনা আর নেই,
সেই স্বাধিকারপ্রমত্ত রক্তের অন্ধ জয়গান।

শুধু গোয়ালে গরুর কাশি, অগ্নিচক্রে পৃথিবী কাটে,
আর শীর্ণ ছায়ারা ঘোরে শীতের শব্দখর সহরে;
তুচ্ছ পরিণাম!

(২)
আবার নিঃশব্দ হিংস্র প্রান্তরে
রক্তপতাকা আকাশে ওড়ে:

প্রখর, নিঃশব্দ দিন,
অমাবস্যার আকাশের ঘনগম্ভীর গান,
মহাশূন্যে শুনি বুঝি গাণ্ডীবটঙ্কার!
—আবার বারে বারে মনে হয়
সঙ্কীর্ণ শেষ মৃত্যু এখনো দূরে, বহুদূরে,
আবার দিকে দিকে যুগান্তরের ডম্বরু বাজায়
উদ্যত জীবন্ত পৃথিবী।

শেক্‌স্পীয়রের সনেট্‌ অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

XXXIII

দেখেছি অনেক বার রাত্রিশেষে খেয়ালী তপন
রাজসিক অনুগ্রহ অকাতরে বর্ষে গিরিশিরে,
সবুজ মাঠের পরে এঁকে দেয় স্বর্ণ চুম্বন,
দিব্য রসায়নে করে স্বর্ণতোয়া পাণ্ডুরা নদীরে।
নিমেষ না যেতে পুন হীন মেঘ পায় অনুমতি
সে-স্মিত, স্বর্গীয় মুখ আবরিতে কলঙ্ককালিতে ;
ধরারে অনাথ ক'রে দিনমণি ধায় গূঢ়গতি
পশ্চিম দিগন্তপানে অপমানে আত্মবলি দিতে।
একদা প্রত্যূষকালে সেইমতো মোর ভাগ্যরবি
সর্ব্বজিৎ আশীর্ব্বাদ ঢেলেছিলো আমার কপালে ;
কিন্তু শুধু মুহূর্ত্তেক দেখেছিনু সেই মুখচ্ছবি,
লুপ্ত সে-গৌরব আজ সমুদ্ধত মেঘের আড়ালে।
তথাপি আমার প্রেম অবজ্ঞিতে পারে না তাহারে ;
কলঙ্ক সূর্য্যের ধর্ম্ম, কি আকাশে কি মর্ত্ত্যসংসারে॥

XXXIV

নির্ম্মল, নির্ম্মুক্ত দিন তুমিই তো দেবে বলেছিলে,
তুমিই তো এনেছিলে শূন্য পথে বিনা আচ্ছাদনে :
কুৎসিৎ দুর্য্যোগে আজ কেন তবে আমারে ঘিরিলে,
লুকালে নির্ভীক রূপ কেন হীন ধূমাবগুণ্ঠনে ?
যদিও বিদারি মেঘ মাঝে মাঝে চাও মোর পানে,
ঝঞ্ঝাহত মুখ হতে মুছে নাও বাদলের কণা,
তবু সে-সকলি ব্যর্থ।—সে-বৈদ্যের গুণ কে বাখানে,
যে ক্ষত আরোগ্য ক'রে ছেড়ে যায় ক্ষতের লাঞ্ছনা ?
তোমার লজ্জায় আজ দুঃখ মোর হবে না নির্ব্বাণ ;
যদিও সন্তপ্ত তুমি, ক্ষতিগ্রস্ত আমি যে তথাপি
দোষীর শোচনা করে পীড়িতেরে যে-সান্ত্বনা দান,
পীড়ার দুর্ব্বহ গ্লানি লঘু হয় তাতে কি কদাপি ?
তোমার প্রেমাশ্রু তবু মুক্তাসম দুর্ম্মূল্য, দুর্ল্লভ,
তা পেয়ে কেবলি ভুলি যত তব অপরাধ, সব॥

নতুন কবিতা

কঙ্কাবতী—বুদ্ধদেব বসু। কবিতা-ভবন, দুই টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য। এসব কবিতা পড়তে বসে এগুলো কেন বিদ্রোহের কবিতা নয়, এসবের ভিতর ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই কেন, কিংবা হাড়ের থেকে সৌন্দর্য্য ঝ'রে প'ড়ে এসব কবিতায় কঙ্কালমুণ্ডের টিটকারি উড়ছে না কেন—এ-রকম সব গূঢ় জিজ্ঞাসা আমার কাছে অত্যন্ত অবান্তর ব'লে মনে হয়। বাস্তবিক বিদ্রোহ আমাদের জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকলেও সেটা মানবাত্মার পক্ষে ব্যর্থতারই জিনিষ; এবং যেখানে বিদ্রোহের ততটা অবসর নেই সেখানেও কি জোর ক'রে বিদ্রোহ আনতে হবে? শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধনা—এমন কি শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাধনা কি তা নয় যা বহুর স্খলন এবং ক্ষরণ এবং অসামঞ্জস্যের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে জ্যামিতির—এবং যেখানে কোনো মহত্তর জ্যামিতি আর জ্যামিতি নয় শুধু—সমন্বয় ও সৌন্দর্য্য খুঁজে নিতে পারে? আমরা স্বীকার ক'রে নেব যে 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য, এবং প্রেমের কবিতাগুলো এই বইয়ের ভিতর কতদূর কবিতা হয়েছে বা অপ্রাসঙ্গিক জিনিষ হয়েছে তাই নিয়ে এই কাব্যের বিচার। অন্য নানারকম কবিতার মত প্রেমের কবিতার আবির্ভাব হয়েছে বিভিন্নরকম ব্যাপকতা, গভীরতা, শূন্যতা বা অন্ধকার নিয়ে। বুদ্ধদেবের এই সব প্রেমের কবিতার ভিতর কোথাও নিরালম্ব শূন্যতা, শববাহকদের গুমোট নিস্তব্ধতা বা নিষ্ক্রিয় অন্ধকারের বিভীষিকা নেই; কিংবা শাদা সূর্য্যের আলোও হাড় আর কড়ি কড়ি আর হাড় ব'লে মনে হয় যে-দেশে, সে-প্রদেশ নেই এখানে। তা নাই বা রইল, এই বইটি হ'ল কবিতারাজ্যের আর একটা facet। এই কবিতাগুলোর মধ্যে তিনি বরং জীবনকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। জীবন চারদিককার প্রকৃতির রস ও প্রেমাস্পদার সৌন্দর্য্যের ভিতর নিজেকে গহন ক'রে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আমাদের

চলতি পথের ওপারে কোনো ধূসর প্রাসাদের মত যেন: যেখানে অন্ধকার সিঁড়ি রয়েছে, রয়েছে রূপ ও কামনার আরশী, জানালায় রঙীন কাঁচ, বাইরে আধো আঁধার, ধূ ধূ শাদা পথ, ঝাপসা ছায়ার ঝিকিরমিকির আলো, হাওয়ার বেহালা, সোনা ও তামার মত চাঁদ, এবং যেখানে বেহালার বুকে নাম ফোটে কঙ্কাবতী—কঙ্কাবতী! বিচিত্রতর মনে হবে ব্রাউনিঙের রুডেল লেডি অব ট্রিপলিকে যে সুরে ডেকেছেন। কিন্তু সেই কবিতার পর 'কঙ্কাবতী'র সুর বিচিত্রতর মনে হবে।

কঙ্কাবতী-জড়িত কবিতাগুলোর কথা পরে বলব। 'কখনো' কবিতায় রয়েছে:

> আমি তো দেখেছি তারে—হ'লোই বা শুধু একবার!
> সোনার ঢেউয়ের মত তার সেই কেশের উচ্ছ্বাস,
> টলটলে আলো চোখে—ঢেউয়েতে দীপের ছায়া সম;
> আমি তো দেখেছি তারে—আঁখি যবে তারা হয়ে ফোটে,
> কত তারা—যারা দেখে নাই!

কিংবা 'বেহায়া' কবিতায়:

> কহিলাম আয়নার অচেনা মেয়েকে,
> আসিবে না এ তো জানা কথা!
> এইবার এই খেলা দাও তবে রেখে—
> সখ ছিলো মিটিয়াছে তো তা!
> অবনত হয়ে আসে মেয়েটির চোখ
> মুকুরে ঠিকরি পড়ে তারার আলোক।

এই লাইন ক'টির ভিতর এমন একটি সহজ স্বাদ রয়েছে যা কোনো অলঙ্কার বা জমকালো শব্দ-যোজনার অপেক্ষা রাখে না।

প্রেয়সীর 'চুল' এর উপর কবিতা লিখেছেন তিনি। রূপসীর চুল নিয়ে কবিতা লেখা চলে যা কাব্যসাহিত্যে ক্লাসিক হ'য়ে থাকতে পারে। কিন্তু এ কবিতাটি সে অমরতার দাবী করতে পারে ব'লে মনে হয় না। কবি লিখেছেন:

এখনো সিন্ধুর বুকে ঘুম যায় সন্ধ্যার ছায়ারা
এখনো রয়েছে রাত্রি অরণ্যের চরণে জড়ায়ে ;
আমার চোখের 'পরে সৃষ্টি করো রাত্রির তিমির,
আমার দৃষ্টির 'পরে ঢেলে দাও ঠাণ্ডা অন্ধকার ;
চুলগুলি খুলে দাও, খুলে দাও, ঢেলে দাও মোর
নয়নে আঢ়ুল ।

কবিতাটির ভিতর এ কয়টি লাইন এবং পরে তিন চারটি লাইন আমার বরং ভালো লাগল; কিন্তু আমার মনে হয় এর চেয়ে নিবিড়তর স্পর্শ দেওয়া যেতে পারত।

'একখানা হাত' কবিতাটির ভিতর কবি আবার সেই রোমাঞ্চের জন্ম দিয়েছেন যা কখনো আমাদের অন্ধকার অরণ্যে, জনহীন মধ্যসমুদ্রের ভিতর কিংবা মানুষের মনেরই ভিতর রক্তমাংসরম্য অথচ যেন মাংসহীন কোন্ রূপের আকৃতির ভিতর নিয়ে যায়। —আকাশে মেঘ জমেছে, পথ নিরিবিলি; সব চুপ; রাত দুপহর। পথের মোড়ে একটি বাড়ির নিচের ঘরে জানালায় আলো জ্বলছে; কাছে এসে চোখ তুলে তাকাতেই জানালা বুজে গেল:

নিলাম তাহারি ফাঁকে পলকের তরে
একখানা সাদা হাত দেখে,
দুইটি কবাট এসে বুজিলো তখন
দুই দিক থেকে।...
আবার দুচোখ ভ'রে ঘুম জমে এলো
সকল পৃথিবী অন্ধকার,
এই কথা না জেনেই মৃত্যু হবে মোর
হাতখানা কার।...
বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম হারায়েছে;
না জানি এখন কত রাত;
—কখনো সে হাত যদি ছুঁই, জানিবো না
এই সেই হাত।

এই কবিতাটি বাস্তবিক যা নয়—লঘু মুহূর্ত্তে একে সেই তুচ্ছ জিনিষ ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু কবিতা তো লঘু মুহূর্ত্ত নিয়ে নয়। যেই আবহাওয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে আমরা পরিচিত মুখকে পরিচিত মুখ বলে চিনি, সেই স্বপ্নের ধ্যান আবার যদি আমাদের চোখে জ'মে ওঠে তাহলে একখানা অচিহ্নিতপূর্ব্ব, অপরিচিত শাদা হাত, যা চিরকাল অপরিচিত থাকবে, তা আমাদের স্বাভাবিক জগতের ঘুমকে বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে চ'লে যেতে পারে।

আরশি, সেরিনাড ও কঙ্কাবতী এই কবিতা তিনটি কঙ্কাবতীর উদ্দেশে। এই কবিতা ক'টির ভিতর থেকে কোনো স্ট্যাঞ্জা ছিঁড়ে বার ক'রে সে-সবের সৌন্দর্য্য দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি না। কারণ এ কবিতাগুলোর সৌন্দর্য্য এদের ব্যাপ্ত প্রসারের সমগ্রতার ভিতর, স্বপ্নের ভিতর, আবেগের ভিতর; এবং এরকম আবেগময়ী রূপসী রূপ এর নিজের আঘ্রাণ নিয়ে বাংলা কবিতায় অনন্যসাধারণ। এসব কবিতা বাংলা কাব্যকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। এগুলো বুদ্ধদেবের পুরোনো সৃষ্টি; কিন্তু অনাসৃষ্টির নিষ্পেষণ নেই ব'লে নতুনের আস্বাদ এদের দেহ থেকে ঝ'রে পড়বে না কোনোদিন। আমার বুদ্ধির সতর্কীকরণ সত্ত্বেও হৃদয়ের আবেগে কয়েকটি স্ট্যাঞ্জা না খসিয়ে তৃপ্তি বোধ করছি না। এগুলো যেন কোনো কুহকময় অফুরন্ত প্রেমের জয়জয়ন্তী। বাঙালীর ও পৃথিবীর কাব্যের প্রেম ও কামনার অনেক অন্ধকারময় রজনী থিতিয়ে যেন এদের আবির্ভাব:

বেহায়া বেহালা কী কথা যে বলে, শুনতে পাও!
কঙ্কাবতী!
'ধু-ধু সাদা পথ তোমার আশায় হ'লো উধাও
কঙ্কাবতী!
ধু-ধু সাদা পথ;—সুদূর বিদেশ শেষের মোড়ে
সেখানে তোমাকে কেউ চেনে নাকো চেনে না মোরে,
কঙ্কা, চলো;

যেখানে তারারা সারারাত ভ'রে—আকাশ ভ'রে!
সারারাত ভ'রে হাহাকার করে রাউল বাও
কঙ্কা গো!
কঙ্কা, শয়ন ছাড়ো গো, নয়ন মেলিয়া চাও
কঙ্কা, জাগো,
কঙ্কা গো!' ('সেরিনাড')

কিংবা:

লোকের চোখের অতীত স্বপ্নে তোমার নামের স্বপ্ন বুনি;
(কঙ্কাবতী!)
গূঢ় গভীর মন্দির মাঝে ঘণ্টার মত সুগম্ভীর
পলকে পলকে ধ্বনি বেজে ওঠে—'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
আমার মনের গুহার বুকে।
আমার মনের অনেক গুহার চূড়ায়-চূড়ায় শব্দ বাজে,
চূড়ায় চূড়ায় ঠেকে ভেঙে যায়, ছড়ায় হাওয়ায় ইতস্তত—
দশদিক থেকে কথা ক'য়ে ওঠে প্রতিধ্বনি:
গভীর গুহার গহ্বর থেকে গাঢ়কণ্ঠ প্রতিধ্বনি
আমার মনের অপার আকাশে হাজার হাজার প্রতিধ্বনি:
ডাহিনে ও বামে উপরে ও নিচে, এখানে ওখানে প্রতিধ্বনি:
প্রতিধ্বনি!
কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী গো—কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী
এখানে ওখানে প্রতিধ্বনি! ('কঙ্কাবতী')

অথবা নিচে উদ্ধৃত স্ট্যাঞ্জাটির আরো গাঢ় সৌন্দর্য্য:

আকাশ কোমল, আকাশ কালো।
কোমল-কালো সে আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা একশো কোটি
আলোর পাখার আড়ালে তাকায়, আবার লুকায়, তাকায় হঠাৎ,
আবার লুকায় আলোর পাখার আড়াল টেনে।
আমি মনে ভাবি, তোমার নামের শব্দের সুর ওরাও জানে,
সেই সুরে ওরা ঘুরে ঘুরে নাচে, দূরে আর কাছে বেড়ায় উড়ে—
ঝিকমিক!

সেই সুরে ওরা কখনো তাকায়, কখনো লুকায়, তাকায় আবার
মিটমিট!

এবং তারপর এই অপরূপ লাইন কয়টি:

আকাশের বুকে ফুটেছে তোমার নামের শব্দ একশো কোটি,
তোমার নামের শব্দ আমার মনের আকাশে তারার মতো,
ফুটেছে তোমার নামের শব্দ তারার মতন একশো কোটি—
কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী!
তারার মতন একশো কোটি! ('কঙ্কাবতী')

বইটির কোনো-কোনো কবিতায় পুনরুক্তি বেশী, কথার অজস্র ডালপালার ভিড়ে আবেগ চাপা প'ড়ে পাখা মেলতে পারেনি। কোনো-কোনো কবিতায় জায়গায় জায়গায় লঘু আমোদের ছোঁয়াচ রয়েছে, কিংবা একেবারে মুখের ভাষায় প্রতিদিনকার জীবনের নানারকম ভাঁজ আবিষ্কার করবার চেষ্টা আছে। কবিতায় সরল মৌখিক ভাষার এ-রকম ব্যবহার 'প্রগতি' পত্রিকার যুগ থেকে সুরু হয়েছে ব'লে মনে হয়; এবং বুদ্ধদেব এর একজন বড় protagonist। কিন্তু এ চেষ্টা সব সময় সম্যকভাবে উৎরেছে ব'লে মনে হয় না। 'মধ্যবর্ত্তী', 'কোনো মেয়ের প্রতি' 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি' ঠিক কবিতা হয়েছে ব'লে মনে হয় না। জীবনের ঠিক এই রকম শাদা খুঁটিনাটি ব্যাপার মৌখিক সোজা ভাষায় ফুটিয়ে কবিতায় রূপায়িত করবার মত প্রশংসনীয় শক্তির আস্বাদ পেলাম 'কঙ্কাবতীর' ভিতর। আমার মনে হয় এদিকে আরো পরীক্ষা ক'রে দেখবার অবসর আছে এবং বুদ্ধদেব নিজেও তা করতে পারেন। যদি প্রশস্ততর ভাবে সফল হন বাংলা কবিতায় একটা নতুন জিনিয দিতে পারবেন।

এইসব কবিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে গভীর এবং পৃথিবীর সীমান্তে যেন কোনো শেষ শতাব্দীতে 'তিমির-তোরণে চাঁদের চূড়া' এবং 'আঁধার-জোয়ারে জোনাকীর মত তারকা-কণা' নিয়ে, আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার জন্য সে যা-কিছু নিয়ে আসতে পারে তারই স্বপ্ন দেখে সময়সীমানাহীন 'শেষের রাত্রি'। আধুনিক বাংলাকাব্যে বুদ্ধদেব যে একজন

প্রথমশ্রেণীর কবি একমাত্র এই কবিতাটির উপরেও সে সত্য নির্ভর করতে পারত। এই কবিতাটিও কঙ্কাবতীকে নিয়ে; এবং কঙ্কাবতী সম্পর্কে বাকী তিনটি কবিতার চেয়ে কল্পনার প্রসার ও আবেগের গভীরতায় গাঢ়তর যেন—অবশ্য মহান। হিউগো যাকে বলেছিলেন immensité এই কবিতাটির ভিতর তারি গভীর প্রতিধ্বনি।

যেখানে জ্বলিছে আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মতো তারকা-কণা,
হাজার চাঁদের পরিক্রমণে দিগন্ত ভ'রে উন্মাদনা,
কোটি সূর্য্যের জ্যোতির নৃত্যে আহত সময় ঝাপটে পাখা।
(কোটি-কোটি মৃত সূর্য্যের মতো অন্ধকার
তোমার আমার সময়-ছিন্ন বিরহ ভার;
এসো চ'লে এসো; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা, কোরো না।)
তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে
আদিম রাতের আঁধার-বেণীতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জ ফুঁড়ে
সময় ছাড়ায়ে,—মরণ মাড়ায়ে,—বিদ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা।
(এসো চ'লে এসো, যেখানে সময় সীমানাহীন,
সময়-ছিন্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রিদিন।
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

Longinus বলেছিলেন, কবি আমাদের আনন্দই দেয় না—আমাদের হৃদয়ে আনে উন্মাদনা; এবং যে-সব শব্দ কবি ব্যবহার করেন সেগুলো 'very light of the spirit'—'শেষের রাত্রি' প'ড়ে তা উপলব্ধি করতে পারলাম আবার।

যাঁরা বলেন 'কঙ্কাবতী'র কবিতাগুলো আধুনিক সময়ের উপযোগী নয়—তাঁরা সময় বা আধুনিক সময় বলতে কোনো একটা কৃত্রিম কিছু তৈরি ক'রে নিয়েছেন। 'একখানা হাত' চিরকালই একখানা হাতের রহস্য; 'অন্ধকার সিঁড়ি' আজকের কোনো এক্স-রের আলোতেই অন্ধকার সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু হয়ে উঠবে না—এবং সেইজন্যই তা সবসময়ের। 'শেষের রাত্রি' আদিম-

রাত্রেও ছিল—রয়েছে বর্ত্তমানতম রাত্রির ভিতরে—এবং ভবিষ্যৎ কোনো রাত্রির ভিতরেই তা ফুরাবে না: অতএব সমসাময়িকতাহীন হয়েও তা সমস্ত কালেরই সমসাময়িক। যাঁরা সময় ও সৃষ্টিকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে তবুও আরো ভগ্নাংশে পরিণত করতে চান, সময় ও সৃজনের মুখের রূপ তা না হ'লে দেখতে পারবেন না ব'লে, তাঁদের প্রীতির জন্য সৃষ্টি ও সময় নিজেদের ব্যবহার ভুলে যায় না—মানুষের পৃথিবীর কোনো একটা তুচ্ছতম শতাব্দীর কোনো একটা তুচ্ছতম দিককে তুচ্ছতম শতাব্দীর তুচ্ছতম দিক ব'লেই মনে করে শুধু সেইসব দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণ;—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কোনো কোনো মানুষের মন এককণা বালির ভিতর সমস্ত পৃথিবীকে আবিষ্কার করে, স্বর্গ খুঁজে পায় একটি ঘাসফুলের ভিতর, হাতের তেলোর ভিতরেই যেন পায় সীমাহীনতাকে এবং অনুপলের ভিতরেই সময়হীনের আস্বাদ পায়। আমাদের মুখ্যতম কবিদের সঙ্গে বুদ্ধদেব সেই কবি যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন;—'কঙ্কাবতী' সেই কাব্য যার ভিতর এই আস্বাদ পেয়ে জলকে ততটা ইন্দ্রজাল ব'লে মনে হয় না মানুষের হৃদয়ের তৃষিত হবার অনুভবকে যতটা। পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য পড়লে হৃদয়ে এই বোধ জন্মায়; হৃদয়ে এই অনুভব জন্মাতে পারেন যেই কবি (এবং তৃপ্তির অব্যর্থ পানীয় তিনি সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসেন) তাঁর কবিতাকে সময় ও মৃত্তিকা এসে কখনও ক্ষয় করতে পারে না। সময় ও মৃত্তিকার ভিতর বাসা বেঁধে 'কঙ্কাবতী' মৃত্তিকা-ও-সময়োত্তর কাব্য। কবিতার ভিতরে এই প্রথম ও শেষ নিদর্শন না পেলে তাকে পিপাসাহীন শরীরের নিকট এক গ্লাস ব'লে মনে হয় শুধু।

বুদ্ধদেব বসুর কবিহৃদয়ের আভার থেকে 'কঙ্কাবতী'র জন্ম হয়েছে। বুদ্ধদেব অনেকদিন থেকে কবিতা লিখছেন। কঙ্কাবতী ছাড়া কবিতার বই আগেও আরো প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শুধু এই বইটির ভিতরেও নিহিত রইল তাঁর কবিযশ; এর রস পান ক'রে বুঝতে পারলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন প্রধান কবি; প্রধানদের ভিতর অন্যতম: তাঁর 'কঙ্কাবতী' অবশ্যম্ভাবী পিপাসা জাগিয়ে গভীর পরিতৃপ্তি-কুহক নিয়ে এসেছে।

জীবনানন্দ দাশ

সংক্রান্তি। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতী-ভবন, এক টাকা। বিমলাপ্রসাদ সম্প্রতি বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে এসেছেন। আমার মনে হয় তাঁর রচনাশক্তি ক্রমশই নিজের রাস্তা ক'রে নিচ্ছে। এ-বইয়ের প্রথম দিককার রচনাগুলি স্পষ্টতই তাঁর কাব্যের প্রথম পাঠ। পূরবী-মহুয়ার রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রায়ই ধরা পড়ে; ছন্দে মিলে অনুপ্রাসে স্বচ্ছন্দ লঘু গতিতে হালকা মেঘের মতোই পাঠকের মনের উপর দিয়ে ভেসে যায়, কোনো ছাপ রাখে না।

আমি বরং শেষের দিকের গদ্য কবিতা ক'টি বেশি পছন্দ করলুম। রীতি ও বস্তু, দু'দিক থেকেই এগুলো বেশি পরিণত। ছন্দ যেখানে অতি-তরল ও ভাবের দিক থেকে বিশৃঙ্খল, গদ্য সেখানে যেন একটি দৃঢ়তা ও সংহতি এনেছে। গদ্য কবিতায় বিমলপ্রসাদ হয়তো নিজের একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গি গঠন করতে পারবেন।

বর্ষার মেঘ-ভাঙা চাঁদ।
একটুখানি শাদাটে আলো চুঁইয়ে পড়েছিলো
শ্যাওলা-ঢাকা ছাদের ওপর
ভিজে ফেনার মতো।

কি

আকুল উতল রাত।
কালো শাড়ীর সিঁথেয়-সিঁদুর পাড়
অনাবৃত শুভ্র সুডৌল বাহুমূলে
অগোছালো ঝুলছে।
দৃপ্ত, দীপ্ত সে অপরূপ।...

সুন্দর ছবি। অবশ্য পদ্যরচনাতেও মাঝে-মাঝে তিনি মর্মরধ্বনি জাগান, যেমন:

বিরতি-তমসা তীরে—
ঘুরিয়াছি কতো আলো-ছায়া সাঁঝে,
খুঁজিয়াছি মৃত পল্লব-মাঝে
হারানো রজনীটিরে।

স্বাচ্ছন্দ্য আছে সর্বত্রই, কিন্তু এই গুণটিকে স্বীয় শক্তির দখলে আনা দরকার। বিমলাপ্রসাদের কাব্যক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আমি তারই আশা করবো। এ-বইয়ে যে-আশা পেলাম, পরবর্ত্তী বইয়ে তা যেন পরিতৃপ্তির রূপ নেয়।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু: সমর সেন। ৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রভাতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
কার্য্যালয়—কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কবিতা

তৃতীয় বর্ষ — চৈত্র, ১৩৪৪ — তৃতীয় সংখ্যা

মহামায়া

নিশিকান্ত

সমুখে প্রাচীরে ফাটলের বুকে আঁকা
সারমেয়মুখী ডাকিনী কাহারে ডাকে,
তারি দক্ষিণে দোলে অশ্বত্থ-শাখা,
পাংশুল পাখী সেথায় বসিয়া থাকে;
কৃষ্ণ-মেঘের মহিষমুণ্ডটিরে
কে বসালো নীল আকাশের বুক চিরে,
দিগন্তরেখা দ্বিখণ্ড করি' দাঁড়ায়েছে তালতরু,
সাড়ে-তিন গজ ধূসর ভূমিতে বিশাল সাহারা-মরু।

নেভে আর জলে জোনাকি-যোনির শিখা—
মসীর সাগরে বহ্নির বুদ্বুদ!
অট্ট হাসিছে রাতের অট্টালিকা—
দ্বারে বাতায়নে বর্ত্তিকা-বিদ্যুৎ:
শাদা আগুনের তরণীতে চাঁদ চলে,
তারায় রূপালি তীরের ফলক ঝলে;
চাহে মার্জ্জার চক্ষু মেলিয়া মূষিক-বিবর পাশে,
দৃষ্টিতে তার তিমিরদীর্ণ সূর্য্যহীরক হাসে।

ওঠে গম্ভীর অম্বুধিগর্জ্জন—
ভাষে অসংখ্য তরঙ্গসংঘাত ;
খর্জ্জুর শাখে ঝিল্লির প্রস্বন ;
সহসা বিধবা করিল আর্ত্তনাদ !
নবজাতশিশু হেসে ওঠে খল-খল,
শ্মশানযাত্রী করে ওই কোলাহল ;
লৌহদশনে হুঙ্কার করে দানবযন্ত্র যান ;
বাতাসে ভাসিল শেফালি ঝরার মৃদু মঞ্জুল তান।

সহসা উর্দ্ধে উঠিল রংমশাল
অভ্র ভেদিল মুহূর্ত্তে গতি তার ;
উল্কার শিখা তারি সাথে দিল তাল,
উৎসের গতি লভিল সে অধিকার।
বৃষভযানের চাকার কেন্দ্র-পাশে
তারি আবর্ত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে,
সে গতির বেগে বীজের বক্ষ অঙ্কুরি টুটিয়াছে,
হিমাদ্রিশির তাহারি মন্ত্র জপি নভে উঠিয়াছে।

সকল মূর্ত্তি মূর্ত্তিল কার মাঝে,
সারমেয়মুখী ডাকিনী কাহার মায়া,
কার বহ্নিতে সবার বহ্নি রাজে,
শশাঙ্কে কার শুভ্র-শিখার কায়া !
কোন্ সে ধ্বনির ধাত্রীর কোলে
জলধি ও শিশু তরঙ্গ তোলে,
সৃষ্টির গতি-উৎস কে আনে—কে তারে ধরিয়া রাখে,
অসংখ্য নামে নামখানি কার ওঙ্কার-সম থাকে !

অধিষ্ঠাত্রী

নিশিকান্ত

গভীর নীলে নিলীন রাত্রিগুলি
নীরব নিবিড় বিহ্বলতার মাঝে,
দিনগুলি মোর আলোয় আত্ম ভুলি'
মৌন-সোনায় সাজে ;

পাখী আমার পলে পলে
ঘুমের ঘোরে উড়ে চলে,
পাখী আমার মন্ত্র নিল রূপের রাণী স্বপ্নময়ীর কাছে,
তাইতো পাখীর প্রাণের বাঁশী রূপসাগরের অতল-তানে বাজে।

সকালবেলার গোলাপরাঙা আভা
মিলিয়ে গেল ঝরাশিশির দলে,
সন্ধ্যাবেলার শোভার স্বর্ণচাঁপা
ডুব্‌লো আঁধার জলে ;

আমার কুসুম শুধুই হাসে,
সৌরভে সৌন্দর্য্যে ভাসে,
আমার কমল প্রস্ফুটিত সন্ধ্যাউষার জন্মউৎস তলে,
তাই তো সকল রঙের গতি আমার রঙীন হৃদয় হ'তে চলে।

রূপার রৌদ্রে ভরা দুপুর বেলা
দীপ্ত রবির কিরণ-ধারা ঝরে,
দিনের শেষে রক্ত আবীর খেলা
দূরদিগন্ত পরে ;

উদয়অস্তঅচল আঁকা
আকাশ আমার মর্ম্মে রাখা,
সূর্য্য-শিশুর ঘুমজাগরণ ঢালে কিরণ আমারি অন্তরে,
তাই এ জীবন মর্ত্ত্য-ধূলায় স্বর্গ-আলোর সৌর-লিখন ধরে।

শৈল-চূড়ায় লোহিতে আর নীলে
লাগলো আলো বর্ণমাধুরীতে,
ইন্দ্রধনুর ঢেউ দোলে সলিলে
সুনীল তটিনীতে ;

আমার স্বচ্ছ সরোবরে
বিশ্বরমার ছায়া পড়ে,
আমার শৈল অভ্রভেদী অটলস্বরের সোনার সঙ্গীতে—
শিখর তোলে সকল আলোর অধিষ্ঠাত্রী আলোরে বন্দিতে।

রঙের রাজা

নিশিকান্ত

নীরব মেঘের পাখীদের
রঙীন পাখার অসংখ্য
চঞ্চল ছন্দ ভেসে চলে
সন্ধ্যার সিন্ধুর দিগন্তে
দলে দলে ;
তাদের গতির তরঙ্গ
মিলায় আমার অন্তরে
একটি মৌন-মরালের
অতল হৃদয়-তলে ।

দিনের দীপ্র-শতদল
নিখিল-প্রাণের পবনে
ছায় রজতের রূপের কিরণ ;
রাত্রির নিবিড় নলিনী
তিমির বরণ ;

আমার অলির গোপনে
স্ফটিকস্বচ্ছ সরসীর
আঁধার আলোর কমলের
ফোটার ঝরার স্বপন ।

উষার গোলাপ-কাননের
রক্তিম রাগের রাগিণী
শুকায় শিশির বিন্দুর সাথে ;
সাঁঝের সেতার থেমে যায়
উদয়-রাতে ;
উজল-চাঁদের যামিনী
থামায় জ্যোস্নার বাঁশরী
কাঞ্চনবীণার ঝঙ্কারে
নবীন রবির প্রাতে ;

আমার বাউল নিরালায়
অগম-প্রাণের গগনে
তার একতারার তালে-তালে
সকল দীপ্তির সঙ্গীতের
উৎস ঢালে,
চন্দ্রে তারায় তপনে
গানের দীপন-বিকাশে
উদয়অস্তবিহীন তার
সুরের অচল জালে।

সকল রঙের মাধুরীর
মিলন লগ্ন মোহানার
কেন্দ্র তুমি, ওগো সুন্দর,
সকল বধূর বাসরের
হে মোহন বর!
সকল বাণীর মালিকার
রতন কণ্ঠে দুলিয়ে
আমার মর্মে বোসেছ,
নিরঞ্জন রাজেশ্বর।

মেঘের ব্যথা

দিলীপকুমার রায়

ঐ মেঘের ছায়া লেগে
ওঠে হৃদয় আমার জেগে
আজ এ কোন্ বেদনায়?
পড়ে নয়নে কার আলো
আমি চাই বাসিতে ভালো
কোন্ সুদূর চেতনায়?

বলো কেমন আঁখি তার?
সে কি মেঘের মত নয়?
তার চাউনি কি অমার
বুকে আনে ক্ষমার জয়?

যদি তা-ই না হবে—তবে
বলো কেমন ক'রে কবে
ধূলি তারার কথা, হায়!
না না জানি প্রিয়, জানি
আমার বাদল পরাণ খানি
মেঘে তোমারি সুর গায়।

স্মরি' তোমার করুণায়
বুঝি আকাশ ছলছল!
সেও পায় নি যে তোমায়
ভেবে আমার চোখেও জল!

তাই মেঘের ছায়া দোলে
হৃদি ব্যথায় ব্যথা ভোলে,
কালোয় বিজ্‌লি ঝলকায়।
আশা- বৈরাগিনী সাঁঝে
শুনি তোমার বাঁশি বাজে
তৃষা- অশ্রু-অলকায়।

শোপ্যাঁর একটি জর্মন গানের অনুবাদ

দিলীপকুমার রায়

অন্তরে মোর গুঞ্জরে কী গান···
একটি ছোট গান···
তোমার মৌন প্রেমের স্বপন হয় সেথা উছল—
শুধু তোমার আশে।
মোর অশান্ত পিয়াস রচে রাগমালা তার (ঝঙ্কার-বিতান)!

অন্তরে মোর গুঞ্জরে কী গান···
একটি ছোট গান···
লক্ষ নিশার একটি তৃষা হয় সেথা বিভল—
রইতে তোমার পাশে।

ভাসব দোঁহে দূর গগনে—
তারায়-তারায় সুর-স্বপনে···
মোদের তরেই জ্বলবে চির-রবি
ধ্যান কোরো এই ছবি···
এনো সুধার দান···
শুনতে কি পাও গান—
ঐ অধরা গান?

সাহিত্যের ইতিহাস

হেমচন্দ্র বাগচী

সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক লেখা আর অনেক লেখকের মধ্যে
থাক্‌বে আমার নাম এককোণে,
জন্ম আর মৃত্যুর সন-তারিখ,
জীবনের বাইরের একটা রূপ,
অল্প কয়েকটি লাইন হয় ত,
কিংবা হয় ত দু' তিন পৃষ্ঠায় পরিচয়,
থাক্‌বে বিশ্লিষ্ট কয়েকটি চরণ কবিতার,
আর বিশিষ্টতার অতিশিষ্ট আলোচনা—
মিতব্যয়ী স্বল্পভাষী সাহিত্যের ইতিহাসে
থাক্‌বে আমার নাম একটি কোণে!

শুধু এরই জন্য কেন লিখ্‌ব কবিতা,
কেন দীর্ণ বিদীর্ণ কর্‌ব সমস্ত জীবন,
অবশেষে অনুতাপে জর্জ্জরিত কর্‌ব আপন হৃদয়কে!

সাহিত্যের ইতিহাসের একটি কোণ,
জন্ম আর মৃত্যুর সন-তারিখ,
জীবনের অতিস্থূল একটি রূপ,
আর অরসিকের স্থূলতর করলাঞ্ছন—
শুধু এরই জন্য কেন লিখ্‌ব কবিতা
কেন দীর্ণ বিদীর্ণ কর্‌ব সমস্ত জীবন—
আর সমস্ত হৃদয়!

যে আনন্দে গান গায় কোকিল
সে আনন্দ কৈ?
যে থরথর বাসন্তী নেশায়
শুনি সেই গান,
সে দরদ কোথায়?

নেই যদি তা', তবে কেন এই আবর্জ্জনা,
নামের অতি সচেতন মোহ,
আত্মবিলাপ, আর আত্মপ্রবঞ্চনা!

তার চেয়ে রচনাকে করি নৈর্ব্যক্তিক,
করি তাকে অপৌরুষেয়,
বেদের এক একটি উজ্জ্বল সূক্তের মত প্রাণবান্।
থাক্‌বে না কোনো নাম,
থাক্‌বে না সাহিত্যের ইতিহাসের স্থূল হস্তাবলেপ,
—স্থূলতর রেখায় জীবনের পরিচয়!
নিজেদের সৃষ্টির পরে আনি অতি ঘন নীল অঞ্জন,
ব্যক্তিত্বের অতিস্পষ্টতার সমাধি!

মানুষকে চিন্‌বে কে?
কবিকে জান্‌বে কে?
তার চেয়ে এস রচনাকে করি নৈর্ব্যক্তিক,
করি তাকে অপৌরুষেয়,—
বেদের উজ্জ্বল সূক্তের মত প্রাণবান্!

মাঠের যে সুর বাউল ধরে তার গানে,
যে সুরে মর্ম্মরিত হয় উদাস অরণ্য,

যে কারুণ্যে বিগলিততর হয় নদীর স্রোতোধারা,
এস, সেই কারুণ্য-কারু শিখে নি আমাদের কণ্ঠে,
আর শিখে নি তার আত্মবিস্মৃত সাধনার সৌন্দর্য্য।
যদি কেউ বলে, বেশ গান, সুন্দর গান,—
অমনি সে মাথা নত করে, আর বলে—'এ আমার সাঁই-এর!'
তা'র সেই অতি করুণ আত্মবিস্মৃতি ফিরিয়ে আনি
আমাদের সাধনায়!
মাঠের যে সুর বাউল ধরে তা'র গানে,
এস শিখি সেই সুর!

সাহিত্যের ইতিহাসের একটি কোণ,
শুধু তারই জন্য কেন লিখ্‌ব কবিতা,
কেন দীর্ণ বিদীর্ণ কর্‌ব আপনার সমস্ত সত্তাকে
আপনার হৃদয়কে!

অভিযান

ত্রৈলোক্য বিশ্বাস

শ্রাবণ মাসের একটা দিন,
সারা সকাল ধরে সে কী ভীষণ বৃষ্টি,
মাঠ ঘাট পথ জলে জলময়।
ওদিকটায় চোখ মেলে চাই, সমস্ত মাঠ গেছে ডুবে,
দু-একটা ঘাসের উঁচু মাথা চোখে পড়ে,
প্রলয়ের পর এ যেন সৃষ্টির নব উন্মীলন।

ভারি ভালো লাগল আমার।

তারপর,
বৃষ্টি-ক্ষান্ত মধ্যাহ্নের
শান্ত নির্জ্জন অবসরে
জল গেছে নেমে।
দেখা গেল শুকিয়ে আসা ধুলো কাঁকরের মাঠ।
প্রলুব্ধ হয়ে উঠল মন।
তাকে বেরুতে হবে অভিযানে
নূতন সৃষ্টির ওপর দিয়ে সেই আজ যাবে প্রথম।

একটি কবিতা

সুকৃৎকুমার মৈত্র

অলস নীরব রাত
মহিষের মসৃণ ত্বকের মত
ঘন-কৃষ্ণ অন্ধকার

আইভির লতায় পাতায়
রাত্রি আছে কুণ্ডলি পাকিয়ে
ঠাণ্ডা সাপের মত
জুঁইফুলে গন্ধ পাই গভীর রাতের
আর সবুজ বনের

গির্জ্জার সুতীক্ষ্ণ চূড়ায়
বিদ্ধতনু নীলরাত্রি ডানা মেলে আছে
আকাশে উড়ন্ত এক রাতচরা বাদুড়ের মত
রাজপথে ছায়া প'ড়ে আছে
মুক্তপক্ষ গভীর রাতের

চোখে ঘুম নেই
চেয়ে দেখি রাতের নগরী
চঞ্চলতাহীন
আমার মনের মত অনড় অলস

ভালবাসি অন্ধকার ভরা এই
নিশীথ নগরী
তাহাতে আমাতে বড় মিল।

স্বপ্ন

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূর দিগন্তে সন্ধ্যার রক্তরাঙা ছবি।
চিলেরা সাঁতার দেয় আঁধার জড়ানো আকাশে,
—শেষ সাঁতার ;—
আর কলের বাঁশীটা চীৎকার ক'রে ওঠে ;
কুলিদের কাজ শেষ হোল।

বল্‌লে, "বাইরে যাবে না আজ ?"
—তোমার চোখে ভাস্‌ছে বৈশাখী আকাশের করুণ কল্পনা,
অসংযত কয়েকটা চুল কেবলি উড়ে এসে পড়ছে
তোমার মুখের উপরে।
একটি রজনীগন্ধা পরেছো কবরীতে,
তারই অস্পষ্ট গন্ধের অনুভূতি স্পর্শ করলো
বুঝি আমার মনকে।

কিন্তু কী কালো তোমার চুল,
কী নিবিড়, মোহময়!
—মনে হয় যেন হাজার রাত্রির করুণ ইতিহাস।

সন্ধ্যা-আকাশে উঁকি দেয় সন্ধ্যাতারা,
তারই দিকে তাকিয়ে ভাবি : এই যৌবন !

যদি এই মুহূর্তে প্রলয়ের মেঘ ঘনিয়ে আসে আকাশে
যদি শোনা যায় ধ্বংসের ঝনন-রণন রব ,
—তবু প্রতীক্ষা করবো আমি ,
কখন তুমি
আমার দিকে ফিরে, চোখ বুজে বল্‌বে :
"ওগো ! বাইরে যাওনা একবার,
আমার প্রসাধন এখনো'যে শেষ হয়নি—যাবে না ?"

দু'বছর

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(১)

নিঃসঙ্গ গ্যাস পোষ্টগুলো কুয়াশায় মোড়া
আর আমি জানলার কাছে
চেয়ার টেনে, টানি সিগারেট ।
এখুনি সূর্য্য উঠ্‌বে,
আর শুন্‌ব মেথরদের গাড়ির ঘড়ঘড়ানি
আর পিচের রাস্তায় ব্যস্ত মানুষ কিলবিল ক'রে উঠ্‌বে
—নোংরা ভাঁড়ারে নেংটি ইঁদুরের মত ।
খবরের কাগজে কোলাহলে সহর উঠ্‌বে আর্ত্তনাদ করে
চীনেয় ভীষণ বোমা ;
আর পরশু হয়ত পার্কের পাশে
সাড়ে-বত্রিশ ভাজা খাব সেই আর্ত্তনাদের উপর ।
আর তারও পরের দিন
ক্যাসানোভা-ফের্তা কারুর গাড়ির চাকায়
ঘড়ঘড় ক'রে উঠ্‌বে সে আর্ত্তনাদ

—খোঁচা-খাওয়া স্বদেশ-সেবকের মত।
আর আমি হয়ত আর এক দিন
প্রদোষ-আঁধারে
স্বপ্ন দেখ্‌ব উর্ব্বশীর :
উর্ব্বশীর উচ্ছ্বাস আসুক এ মৃত সহরে।

(২)
পরশু তোমায় দেখ্‌লুম
কবির কল্পনা নহ—
ঢ্যাপ্‌সা দেহ নিয়ে স্ট্র্যাণ্ড্‌ রোডে স্বাস্থ্য-সঞ্চয় করছো
শুনেছি ব্যস্ত হয়েছ সৃষ্টিকর্ত্তার সাহায্যকল্পে।—
আমার শুধু মনে পড়ল তোমাকে ;
—সেই বছর দুই আগেকার তুমি—
দু'বছর, দু'বছর গেছে কেটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ?

(৩)
সেদিন দেখেছি সূর্য্যোদয়
—দু'বছর আগে—
দেখেছি রঙিন আশ্বাস
বসন্তের গাছে।
কী নিষ্ঠুর আজকের বসন্ত।
শেলীর মৃতদেহ ঠুক্‌রে খেয়েছে হাঙরে
আর উর্ব্বশী, সেও হয়ত হ'য়ে পড়েছে মোটা।

(৪)
পড়ার টেবিলের পাশে তাই
একটি মেয়ের ছবি
—একটি কিশোরী মেয়ের চঞ্চলতা।
হঠাৎ শুনি হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল :
—সে হাসি স্থূল মাংসের
আর বললো—

মিথ্যে এই সূক্ষ্ম আলোচায়া
দু'বছর আগেকার,
ওই মুখ আর ওই ভুরু
চুলোয় যাক—
সে গলার স্বরে থল্‌থলে মাংসের আভাস।

বসন্ত আজ বেহায়া
ঝিয়েরা উনুন ধরায়
এখুনি সূর্য্য উঠবে।

আট বছর আগের একদিন

জীবনানন্দ দাশ

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'ল তার সাধ ;

বধূ শুয়েছিল পাশে—শিশুটিও ছিল ;
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল,—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি !
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মত ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মত কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্ত্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইসারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারীর ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থাকে জীবনের
স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন্ বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা
এই জেনে।
অশ্বত্থের শাখা
করে নি কি প্রতিবাদ? জোনাকীর
ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে

করে নি কি মাখামাখি ?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলে নি কি : 'বুড়ী চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
চমৎকার !—
ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার ?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'ল ;—
মর্গে কি হৃদয় জুড়োল
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মত রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ;—কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখে নি কোনো খাদ ,
সময়ের উদ্বর্ত্তনে উঠে এসে বধূ
মধু,—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্ত্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে ।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে
চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ী চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু'একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
আমিও তোমার মত বুড়ো হব—বুড়ী চাঁদটারে আমি ক'রে দেব কালীদহে
বেনোজলে পার ;
আমরা দুজনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার ।

সমস্যা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রসাধনের তুচ্ছতম পরিবর্ত্তনে
তোমাকে একেক বার একেক রকম দেখি,
আর ভাবি, বদলালো কী
তোমার রূপ, না আমার চোখ,
শাড়ীর রং না মনের রং।

আমাকে সংশয়ে দুলতে দেখে
তুমি খুসি হোয়ে জিজ্ঞেস করো
কেশ রচনার কোন্ ধরণটা আমার ভালো লাগে
শাড়ীর কোন রংটা শরীরিণীর রঙের সঙ্গে
ভালো মানায় সব চেয়ে।
সঠিক জবাব দিতে আমার দেরী হোয়ে পড়ে।
ভাবি পরিবেষ বাদ দিয়ে
শুধু বেশের কথা ভাবলেই কি চলবে
কিংবা, নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্যই কি তুচ্ছ করার বস্তু?

খাসা দিন

বিষ্ণু দে

কর্কশ কিন্তু ক্ষীণকায় ঘণ্টাগুলোর বাঁধের মধ্যে
সকালটায়
এরি মধ্যে জোয়ার লাগল,
ভাসিয়ে দিলে জ্যোতির্ম্ময় বিকালটা বুঝি।
কেনেস্তারা পিটিয়ে চল্‌ছে খালি ট্রামবাসের গান।
পাতা ঝরে' ঝরে' পড়ছে
পোড়া কাগজের মৃদু আওয়াজে
আর দূরদিগন্তের সেতুবন্ধ
সার্কুলার রোড্‌টা বেঁকে গেল কড়ায়ার
জিলিপির প্যাঁচে।
দুর্ব্বলচিত্ত ম্যাকাডামে ছাপ পড়ছে
প্রতিটি পদক্ষেপের।

ছটা জাপানী একটা কবোষ্ণ ট্যাক্সিতে চলেছে
শূন্যে পাগুলো ডুবিয়ে।

চমৎকার দিনটা।
বেঙ্গল ক্লাবে বড়ো সাহেব ফিরছেন পায়ে হেঁটেই।
ইংলণ্ড যেন,
চকৃখড়ির পাৎলুন উপকূলপ্রান্তে,
আর ওপরে
চিম্‌নির টিপি।
পাছে এই খাসা দিনটা তাঁর বিফলে যায়,
আহতেরা আর রিক্তেরা তাই নাকি শপথ করেছে,
যে তারা আর কিছুতেই যন্ত্রণা বোধ করবে না।
—পল মোরাঁ

পুরাতন

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উন্মন দিনে যৌবন-উৎসব।
স্মৃতিসন্ধানী বিলাস-পুরাণ পড়ে আর ফিরে চায়—
হাসি-বাঁশী কবে মিশে গেছে হায়,
মনে পড়ে শুধু প্রগল্‌ভ কলরব।

গোপন সানুর সোনালি ধ্বনিতে পাহাড় অভ্রভেদী
রূপালি তুষার-খচিত সে চায় নীল আকাশের বেদী।
রুক্ষ বক্ষপরে
শ্যামলিমা-হারা শুভ্রশিরের অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

উৎসবের আদিম কাননে
যত ফুল, যত ফল ফুটেছিল বর্ণে আর রসে,
ঝরিবে এবার বুঝি। তাই শোভা প্রতীচী গগনে
অভ্যাসের অধ্যাসের—দিনান্তের দিগন্ত-ব্যর্থতা।

শিহরায় পাণ্ডুদেহ মৃত্তিকার শিশির-পরশে
ভুলে যায় কবেকার করভার কুমারী-মত্ততা।

নির্বেদ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বলেছিনু বটে গেরুয়া শাড়ীতে মানায় বেশ।
সেই হতে তব উদাসী নয়ন, আলুল কেশ।
যখন আবেগ-উদ্বেল মোর হৃদয় কাঁদে
আদিম আঁধার-বন্যা ছাপায় ধৈর্য্য-বাঁধে,
লাস্য-লীলায় অবহেলি, খোঁজো অশেষ-লেশ!
আমি কি চেয়েছি পরমহংস-স্নিবেশ?

বৈরাগী প্রিয়া-হাতে হাত দিয়া পথ-চলা,
অন্যমনার শূন্যদৃষ্টি কথা-বলা—
তার চেয়ে ভালো শব-সাধনায় নিবিকার
সিদ্ধি-আশায় কামনানিলয় অঙ্গীকার।
মর্ম্মরপ্রাণ হয়নি তনুকা চঞ্চলা,
মায়াতিগ তুমি, বৃথা মম রাগ-ছলাকলা।

কাল রজনীতে বিধাতাকৃপায় ঘুচেছে খেদ।
ঘুচেছে তোমার রুক্ষ বিরাগ মোক্ষ-ক্লেদ।
বহুকাল-তোলা কিশোরকালের মোর ছবি
কুতূহলী চোখে দেখে তব ফোটে হাসি-রবি,
স্নেহ-চুম্বনে ভরিলে তাহারে অনির্বেদ।
তব বেদান্ত মোর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ!

শেষ হ'ল

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হে বন্ধু ! কম্পিত লজ্জিত বক্ষে
তোমারেই লাগিয়াছে ভালো :
শেষ-হীন আকাশেতে যেন কালো
দ্বিধান্বিত অন্ধকার
মিলনের সুনিবিড় প্রতীক্ষায়, কাঁপে থেকে-থেকে
গোধূলি আকাশে যেন শর্ব্বরীর ছায়া !

হে বন্ধু ! তোমাতে আমাতে আজ
শেষ হ'ল দ্বন্দ্ব ব্যথা লাজ,
শেষ হ'ল প্রেত-সম পীড়িত প্রতীক্ষা।
তোমার প্রেমেতে আজ দীক্ষা
হ'ল বেদমন্ত্রসম।

এর পর সব-দিন সব-রাত
শুধু কথা কওয়া, শুধু হাসি, শুধু গান :
পরিপূর্ণ হৃদয়েতে উচ্ছলিত প্রাণ।
আর সুনিবিড় আলিঙ্গনে উষ্ণ স্পর্শ মাঝে
ভুলে যাবো অতীতেরে জীর্ণ-বস্ত্রসম।
ভবিষ্যৎ কুটিল ভ্রুকুটি যদি করে
টানি দিব যবনিকা চুম্বনে-চুম্বনে :

অভ্রংলিহ শীর্ষে যেন তুষার-চূড়ায়
অনন্ত অচ্ছেদ্য প্রেম আকাশের সাথে।
পদতলে ঘন মেঘ প্রহরীর ন্যায়
অতীত ও ভবিষ্যতে শুধু বাধা ন্যায়।

পরিপূর্ণ বর্ত্তমান : সমুজ্জল, উদ্ভাসিত আলো,
কানে-কানে কথা কওয়া—ভালোবাসি, শুধু বাসি ভালো।

একটি পুরোনো ছবির প্রতি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ সরু চোঙের মত এই শস্তার রেস্তর্াঁ।
দিনের বেলাতেও জ্বলে ঘোলাটে আলো,
সারি সারি ময়লা টেব্‌ল্-চেয়ার।
ট্র্যামের আর বাসের আর গরুর গাড়ীর
বেসুরো চীৎকার এখানে আসে
আর ভেতরে ভীড় করে শস্তা মানুষের দল।

পেয়ালার ঠুং ঠাং,
বিঁড়ির গন্ধ,
ফুটবল মাঠের আলোচনা
কিংবা প্রফেসারের
কিংবা অফিসের।

সবাই তা'দের জীর্ণ আর ক্লান্ত দেহ টেনে আনে এখানে :
কেউ দুমড়েছে ধনুকের মত,
দুর্গন্ধ কারুর পোষাকে ;
কারুর চুল উস্কো-খুস্কো
আর হাতের ওপর স্পষ্ট, দড়ির মত শিরাগুলো।

'সাতাশ নম্বরে এক পেয়ালা চা, আর দুটো টোষ্ট',
'পনেরো নম্বরে চা আর মাম্‌লেট্' ;
এই ধরণের চীৎকার চারদিকে
আর তারই সঙ্গে জোট্ পাকিয়েছে
উপ্‌রিওলার মেজাজের কথা,
প্রফেসারের কদর্য্য লেক্‌চারের আলোচনা
কিংবা (নিম্নস্বরে) কোনও ছাত্রীর গল্প
কিংবা চিত্রতারকার দৈহিক সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ।

হঠাৎ দেয়ালের দিকে নজর পড়্‌ল :
একটা পুরোনো ছবি—

অনেক অনেক দূরে ছড়ানো সবুজ মাঠ
আকাশে তুলোর মত মেঘ,
একপাল ভেড়া
পেছনে রয়েছে বাঁকা টুপি আর ছেড়াঁ-কোট পরা
পাহাড়ী ছেলে।

হয়তো নিতান্ত সংস্কারের বশে
টাঙানো হয়েছে এই ছবি।
কিন্তু আমি যেন পেলুম
সেই সবুজ মাঠের নতুন ঘাসের সুঘ্রাণ;
এক ঝলক ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাস!

'আর কি চাই বাবু?'
চমকে উঠি!
একটু মশ্‌লা নি,
দিই খুচ্‌রো তিন্‌টে পয়সা:
বিঁড়ির গন্ধে আর ক্লান্ত লোকের শস্তা আলোচনায় ভরা
চোঙের মত সরু
শস্তার রেস্তরাঁ পড়ে' থাকে পেছনে।

বাসতৈয়ী

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

রাত্রি দিনের জ্বালেতে বন্দী পৃথিবী,
তাই দেখে দেখে তৃষ্ণা মেটে কি শুধু?
হে বাতায়নিক, তাই দেখে দেখে
নিভে গেলো চোখে অন্বীক্ষার আলো।

কাঠঘেরা চোখ কঠোর হয়েছে
সবুজে নীলে।
সাতটার পর সন্ধ্যা ঘনায় কাছে।
নরম হাতের আলো জ্বালাবার
গুঞ্জন শুনি চোখে।
মন-প্রান্তর আঁধারের ঘন ঘাসে
ভ'রে ওঠে। তবু তপ্ত বালুর জ্বালা।

তাই বুঝি আজ প্রলাপের মায়া
ছড়ায় কথা,—হে নভোচারী,
নীহারিকাদের চক্রব্যূহের ধূসর শাপে,
ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গমের অপটু গতি।

মধুসন্ধ্যার মদিরগন্ধী মেঘালু মুখে,
আজো অপাঙ্গ সাঙ্গ করে নি তুষার ছোঁড়া,
তবু দেখি পোত খর-সন্ধানী মেরুর পথে।
কুটিল চোখের প্রখর রাতে কি
হৃদয় দিলে ?

বাদামি রংয়ের পর্দারি পালে
সান্ধ্য ঝড়ে,
দুঃসাহসের সীমানা হারালো শ্বেত-সাগর।
দ্বীপান্তরের জাহাজ জড়ালো ঘুমে।
ডায়েরীর পাতা উড়ে গেলো হায়,
সান্ধ্য ঝড়ে।

আমি যদি বলি মনটা তোমার খাড়া পাহাড়,
তুমি ত তোমার ছায়াটাকে দেবে ছুঁড়ে,
লজ্জায় ঢাকা হল্‌দে বাড়ীর বুকে,
আমি যদি বলি মুখ্‌টা তোমার খাড়া পাহাড়।

সহজ আলাপে ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না
কঠিনচেতা,
মৃদুভাষণের শীর্ণতা জানি
লাগে না ভাল।
করুণ ইসারা বিফল, রাতের শাখে।
ড্রাগন্‌ ঘেরা যে হল্‌দে বাড়ীটা
কঠিন চেতা।
বাড়ী বদলের বিরতি পাঠাবে
ঠাণ্ডা হাওয়া।
'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমা' ও ত'
পালাবে দূরে।
সেদিন তোমার ডায়েরী পাবে কি খুঁজে,
যেদিন পাঠাবে রাত-জাগা বাড়ী
ঠাণ্ডা হাওয়া ?

কোলাহল শুনে থাকবে তারারা চেয়ে,
চুপি চুপি কও।
তোমার সূর্য্য জ্বালুক শিরায় জ্বালা।
লোকায়ত রূপ পাবে রক্তের গতি
স্বভ্র নেত্র ছড়াবে শ্রাবণ মায়া,
হে বাসতেয়ী !
মাঝামাঝি দিয়ে পথ পেয়েছি ত আমি।
মধ্যরাত্রে হঠাৎ চাওয়ার ভাষা,
আবেগমুখর আনাগোনা যেত শোনা
লিপিভারবাহী আঁধারের যাওয়া আসা।

বহু রজনীর জ্বলা আর নেভা থাক্‌লো
জাপানী ছবির নিদ্রালু রেখা হ'য়ে—
এ কথাকে আজ মরু-ঝড় এসে ঢাক্‌লো
ক্রুদ্ধ বালুর আলোড়ন বুকে ব'য়ে।

ওথেলো-অসিত হয়ে গেছ তুমি
কামনা-বিষে।
এ নাগরিকার অন্ত-আতিথ্য
বহুদূরে পলাতক।
ওথেলো নিশায় জিঘাংসা দেখি
গিয়েছে মিশে,
সে সবুজাক্ষ ড্রাগনের ঘুমে,
তাই আমি পলাতক।
তাই আজো রাতে ডালিয়ার প্রেত
ফেরে বিষাক্ত পায়ে।
দুঃস্বপনের ক্যাক্‌টাসে আজ ভরেছে মন।
তোমার জাপানী ছবিটা টাঙিয়ো
তারার গায়ে,
এই গ্রহ হতে গ্রহান্তরেও যাবে তা দেখা।
তারপর, ধর তোমার গানের
প্রবাল স্তূপে,
পালাবার পথে হতেও ত' পারে
জাহাজ-ডুবি।

গানের সূক্ষ্ম ক্যাথিড্রাল-চূড়া ডুবেছে ঝড়ে,
হে বাসতেয়ী!
বাতায়নিকের চেয়ে থাকা হল নিথর নদী
তোমারি চুলে।

আঁধারের মদে টল্‌লো আকাশ
টল্‌লো তারা।
শ্বেত সাগরের ঘন বাষ্পের
সর্পিলতা
জড়ালো তোমায়। তুমি তারে দিলে
রাতের মায়া।
পৃথিবীটা জোড়া জান্‌লার ফাঁকে
হল্‌দে বাড়ীর,
স্বপ্ন কি দেখ মদালস চোখে
হে বাসতেয়ী?

কয়েকটি দিন

সমর সেন

শুধু জনহীন চৌরঙ্গীতে পাথরের মূর্ত্তি,
খনির আগুনে সূর্য্যাস্ত আসে।
পরদিন
লাল জীবনের জাল সঙ্কীর্ণ আকাশে;
সহরের প্রখর সকালে
দূরে শবযাত্রার প্রতিধ্বনি
হৃৎপিণ্ডে মুহূর্ত্তের মৌনতা আনে।
জীবিকার স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন,
আশে পাশে ব্যর্থতায় চিরকাল মৃত্যু আসে আর যায়।

আজ বহুদিনের তুষার-স্তব্ধতার পর
পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।
তাই বসন্তের কার্জন পার্কে
বর্ষার সিক্ত পশুর মত স্তব্ধ ব'সে,
বক্রদেহ নায়কের দল
বিগলিত বিষণ্ণতায় ক্ষুরধার স্বপ্ন দেখে;
ময়দানে নষ্টনীড় মানুষের দল।
ফরাসী ছবির আমন্ত্রণে, ফিটনের ইঙ্গিতে আহ্বানে
খনির আগুনে রক্তমেঘে সূর্য্যাস্ত এলো।

Do you remember an inn, Miranda ?

বুদ্ধদেব বসু

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর-দোলা,
সারাদিনরাত জানালা খোলা
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে,
সাগর ভ'রে
ঢেউয়ের দোলা।
সারাদিনরাত হাজার ঢেউয়ের উচ্চস্বরে
দিগন্ত-জোড়া হাওয়ার ঝড়ে
কী যে লুটোপুটি ছুটোছুটি ঐ ছোট্ট ঘরে
মনে কি পড়ে ?
কত কালো রাতে করাতের মতো চিরে

ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে
তীক্ষ্ণ তারার নিবিড় ভিড়ে
ভাঙন এনে,
কত কৃশ রাতে চুপে-চুপে চাঁদ এসেছে ফিরে
সাগরের বুকে জোয়ার হেনে
তোমারে আমারে অন্ধ অতল জোয়ারে টেনে
মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা
মনে কি পড়ে ?
কত উদ্ধত সূর্যের বাণে তুমি আর আমি গিয়েছি ছিঁড়ে
কত যে দিনেরে চুম্বন টেনে দিয়েছি মুছে
কত যে আলোর শিশুরে মেরেছি হেসে
সেই ছোটো ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত ঢেউয়ের দোলা
সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
সারাদিনরাত জানালা খোলা।

দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বরে
তপ্ত ঢেউয়ের মত জোয়ার-জ্বরে
কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট্ট ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে ঢেউয়ের দোলা,
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে হাজার ঝড়ে
কত সমুদ্র তপ্ত জোয়ার-জ্বরে
মনে কি পড়ে ?
কত মৃত চাঁদে এনেছি ফিরায়ে রাত্রিশেষে
কত বর্বর শিশু-সূর্যেরে মেরেছি হেসে
ঘন-চুম্বন-বন্যায় কোন্ অন্ধ অতলে গিয়েছি ভেসে
মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা
মনে কি পড়ে ?

কৈশোর

সুশীলকুমার ঘোষ

ঘুড়ি ওড়ে আকাশে
সাদা সুতোয় বাঁধা রঙীন্ ঘুড়ি :
আসমানে ওড়ে ঘুড়ি,
—সুতোর প্রান্ত থাকে মাটিতে !

ওড়ায় ছোট্ট ছেলে
—বড়দের লুকিয়ে ।
ছোট আছে ব'লেই না তা'র এই মূঢ় বিলাস,
বড় হ'লে নিজেই হয়তো হাস্‌বে !
ঘুড়ি উড়ে উড়ে উঠে যায় কতো উঁচুতে
সুতো টানে অনেক—।
ছেলেটা ভাবে, উঠুক না
সুতোর সূত্রে রইল তো যোগ !

কিন্তু কখন আসে দম্‌কা হাওয়া
ছিঁড়ে যায় ঘুড়ি—
উড়্‌তে উড়্‌তে চলে লক্ষ্যহারা, সীমাহীন নীলে !
হয়তো বা সূর্য্যাস্ত-সিন্দুরের আড়ালে
যায় হারিয়ে !
ছেঁড়া সুতো জোড়ে না আর,
ঘুড়িও হয়তো পায় না কূল ।
কিন্তু তবু এই তো সত্যি,
—এই তো বিস্ময় !

নতুন কবিতা

চোরাবালি—বিষ্ণু দে। ভারতী-ভবন, এক টাকা বারো আনা।

বিষ্ণুবাবু,

আপনার সঙ্গে—ও আপনার লেখার সঙ্গে—আমার দশবছরের পরিচয়। ঢাকা থেকে অজিত দত্ত আর আমি 'প্রগতি' পত্রিকা চালাচ্ছি, এদিকে 'কল্লোল' উঠে যাওয়ার আগে অতি তীব্রভাবে আলোড়িত হচ্ছে, সেই সময়ে আমাদের সাহিত্য-গোষ্ঠীর উপান্তে মাঝে-মাঝে আপনাকে দেখা যেত। আপনার কবিতা তখন থেকেই আমার ভালো লাগে। সেই সময়ে 'প্রগতি'তে আপনার প্রচুর লেখা বেরুতো; বেশির ভাগই তার লঘুরসের পদ্য। সেই হালকা পদ্যগুলো 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ডিঙিয়ে সবই দেখছি এই বইয়ে স্থান পেয়েছে—এমন কি 'ডলুটা যখন ন্যাকামি করে'ও বাদ যায়নি। তার মধ্যে ট্রিয়োলেট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রচনাগুলোকে বিক্ষিপ্ত না রেখে যে ভাবে পারস্পরিক সংযোজনায় আবদ্ধ করেছেন তাতে যথেষ্ট নিপুণতা আছে। প্রত্যেকটি গ্রন্থির অর্থগৌরব ঢের বেড়ে গেছে; তা ছাড়া সমগ্র শব্দশৃঙ্খলেও একটি সামাজিক ইঙ্গিত ধারাবাহিকভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

'চোরাবালি'র অনেক রচনাই দেখছি হয় 'প্রগতি'তে নয় 'কবিতা'য় বেরিয়েছিল, অতএব অনেক রচনার সঙ্গেই আমার পাণ্ডুলিপি অবস্থা থেকে পরিচয়। অন্য রচনাগুলোও প্রায়ই একেবারে অপরিচিত নয়। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় আপনার 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি আমি এই প্রথম পড়লুম। দৈবক্রমে 'পরিচয়ে'র ঐ সংখ্যাটি আমার চোখে পড়েনি। কোনো সন্দেহ নেই, 'ঘোড়সওয়ার' একটি প্রথমশ্রেণীর কবিতা, বর্ত্তমান যুগের বাঙলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ-কথাও বলবো, এই জাতের কবিতা যে-কোনো ভাষাতেই গৌরবের বিষয় হ'তো। ছন্দের উপর—বিশেষ ক'রে তিনমাত্রার ছন্দে—আপনার অবাধ ও অগাধ দখল আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে। 'ঘোড়সওয়ারে' ছন্দের উত্থান-পতন এমন অভ্রান্ত, অনিয়মিত মিলের ও আকস্মিক অনুপ্রাসের বিস্ময়

এমন সঙ্গত ও সুন্দর, নাট্য ও গীতির মিশ্রণ এমন নিখুঁত যে সমস্ত কবিতাটি জটিল ও গম্ভীর সঙ্গীতের মতো মনের মধ্যে হানা দিতে থাকে।

কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার!

শেষের পংক্তিটিতে ঠিক যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায়। তা ছাড়া এ-কবিতার অন্যতম মহিমা আমার কাছে এই যে একে হৃদয়ঙ্গম করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়না, এমন কি ইয়ুং-এর রূপক বাদ দিয়েও।

বিষ্ণুবাবু, অকপটেই স্বীকার করছি আপনার কোনো-কোনো কবিতা আমি একেবারেই বুঝতে পারিনে। বিদ্বজ্জনের মুখে 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'র নানারকম দুরূহ ব্যাখ্যা শুনে আরো বেশি বিচলিত বোধ করি—ও-দুটি কবিতায় কেন যে এক স্ট্যাঞ্জার পর আর এক স্ট্যাঞ্জা আসছে, সেটাই আমার কাছে রহস্য। তবু, ও-দুটি কবিতাই আমি পড়তে ভালোবাসি; মাঝে-মাঝে চমক-লাগানো রূপকের দেখা পাই; মনের মধ্যে বিচিত্র ছবি ফোটে, আর ছন্দের কৌশল ধ্বনিমর্মরের মোহ ছড়ায়।

উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো।
সন্ধ্যা-আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণমায়ারে আনো

এনেছিলে বটে হাসি।
মেঘের রেশমী আড়ালে দেখিনি
বজ্রের যাওয়া আসা।

সোনালি হাসির ঝরণা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপলমায়া।—
মুখর সে গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।
হালকাহাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল?

পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।

বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে।
স্তব্ধ নিথর পাঁচ সায়রের বিল।

এ-সমস্ত শ্লোক একবার পড়লে বার-বার পড়তে হয়, মগজের মধ্যে এরা গুনগুন ক'রে ফেরে, অন্যমনস্ক মুহূর্তে কথাগুলোকে আবৃত্তি করি। এরা সম্পূর্ণই ধ্বনি-নির্ভর, এদের কাছে অর্থের প্রত্যাশা করিনে। আমার এক-এক সময় মনে হয় যে কবিতা যে আমাদের এমন প্রচণ্ডভাবে অভিভূত ও আলোড়িত করে সে তার ধ্বনিরই জোরে, অর্থমহিমার জোরে নয়। কবিতা যে কখনো পুরোনো হয় না, কখনো ফুরোয় না, কয়েকটি আপাতসামান্য শব্দের সমাবেশ থেকে যে একটি বিশাল ভাবমণ্ডল উৎসারিত হয়, তার কারণ কি শুধুই তার ধ্বনি নয়? তার ছন্দ নয়? সেই ধ্বনির উপরে আপনার স্বচ্ছন্দ প্রভুত্ব; স-মিল গদ্যে আপনি যে পরীক্ষা করেছেন তাতেও তার পরিচয় পেয়েছি। অন্য সমস্ত কথা ছেড়ে দিলেও, শুধু এই কারণেই কাব্যজগতে আপনার আসন স্থায়ী।

আমার মনে হয়েছে তিনমাত্রার ছন্দে আপনার দখল যতটা পাকা, পয়ারে ততটা নয়। পয়ারের বেগ ও তীব্রতা, তেজ ও বৈচিত্র্য আপনি অন্বেষণ করেন নি। দু'একজায়গায় যত্নহীন শৈথিল্য ধরা পড়ে, যেমন—

জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র, জানি যে সে সাধারণই মেয়ে,

'সাধারণই' কথাটা বড্ড বেখাপ্পা নয় কি? তারপর

আমাদের যামিনী জাগর
কাটে নাকো, সংস্কৃত কবিতার নাগরী নাগর
কাটাত যেমন;

এখানে 'সংস্কৃত' কথাটার উপর যে-ভার চাপিয়েছেন তা বইতে গিয়ে ওর উচ্চারণ পর্য্যন্ত বিকৃত হ'য়ে যাবে। মোটের উপর, পয়ারে আপনার গতি ততটা আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভীক নয়। এখানে এটাও অবশ্য বলা দরকার যে—

এই সব কথা লেকে বেজায় ভাবিত
করল, বিশ্বাস করো, খাঁটি কথা বলি,
সমাধানে কিছুতেই মন উপনীত
হল না,—ভাবনা বিষে নিদারুণ জ্বলি।

এখানে ছন্দের বায়রনি চটুলতা উপভোগ করেছি। তা ছাড়া, 'প্রথম পার্টি'

কবিতাটি পয়ারে আপনার শ্রেষ্ঠ—এবং সত্যিকারের ভালো—রচনা; তার

সহরের উপকণ্ঠে জ্বালে অন্তহীন দূর আকাশের নীলে
কোলাহলহীন কোন অলৌকিক দেয়ালির আলো।

এ দুটি লাইনে যা পেলাম তার মূল্য অনেক।

আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি: এ-বইয়ের ভূমিকার কী দরকার ছিল? ১৯৩৮-এ আপনার কোনো পরিচয়পত্রের দরকার নেই—আর যে-কোনো অবস্থাতেই কাব্যগ্রন্থ নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে—তাকে কেউ হাতে ধ'রে নিয়ে এসে সভায় বসিয়ে দিয়ে গেল এটা আমার ভালো লাগে না। আপনার বন্ধু সুধীনবাবু এই জিনিসই ভূমিকা হিসেবে না লিখে সমালোচনা হিসেবে লিখলে আপনার লাভ বেশি হত। আপনার কবিতার দুরূহতা তিনি সমর্থন করেছেন, কিন্তু সেটা-উত্তীর্ণ হ'তে পাঠক কোনো সাহায্য তাঁর কাছ থেকে পাবে না; বরঞ্চ তাঁর ভূমিকাও এত দুর্গম যে তা প'ড়ে পাঠকের আরো মাথা গুলিয়ে যাবে এবং আপনার উপরেই চিত্ত অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠবে। আমার মনে হয় এই ভূমিকা আপনার ও পাঠকের মধ্যে অকারণে একটা বৃহৎ বাধার সৃষ্টি করবে; এমনকি এমনও হ'তে পারে যে কোনো পাঠক, আপনার রচনার সঙ্গে যার পূর্বের পরিচয় নেই, প্রথমেই ভূমিকা প'ড়ে আপনার কবিতা পড়তেই চাইবে না। সুধীনবাবুর ভূমিকা প'ড়ে যা মনে হয় আপনার কবিতা ঠিক তা নয় এটা আমি সুখের বিষয় মনে করি। অধীত বিদ্যার উপরে নির্ভর না ক'রেও আপনার কবিতা উপভোগ করা যে সম্ভব আমিই তার প্রমাণ। আমাকে যদি শব্দার্থ ও উল্লেখ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, আমি নিশ্চয়ই ফেল করবো। তবে সুধীনবাবু যখন বলেন, 'ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষী; এবং যে-পাঠকের পড়া-শুনা আমার চেয়ে বেশী, তিনি কবিতা দুটির মধ্যে আরও অনেক কিছু খুঁজে পাবেন', তখন তিনি আপনার উপর যে-বিরাট পাণ্ডিত্য আরোপ করেন আশা করি সত্যি-সত্যি আপনি তত বিরাট পণ্ডিত নন।

আর একটা জিজ্ঞাস্য। 'ক্রতুক্বতম', 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির', 'সোৎপ্রাসপাশ', 'অলাতচক্র', (এমন আরো আছে) এই সব শব্দ ব্যবহার ক'রে সত্যি লাভটা কোথায়? আমি নিজে কথাগুলোর জমকালো আওয়াজ শুনেই খুসি, শারীরিক

আলস্য অভিধান দেখার বিঘ্ন, তা ছাড়া সাধারণ অভিধানে হয়তো সব পাওয়াও যাবে না। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না বেশির ভাগ পাঠক এ-সব কথায় এমন হুঁচোট খাবে যে সামলে উঠতে বেশ কিছু সময় নেবে? পাঠকের স্বচ্ছন্দ উপভোগকে এমন ক'রে নির্যাতিত ও নষ্ট করবার আমি তো কোনো কারণ দেখিনে। তা ছাড়া, আধুনিক কবিতার সাধনা মুখের ভাষা ও কাব্যের ভাষাকে কাছাকাছি আনবার; আপনার কি মনে হয় ন্যায়ের পরিভাষা কি মামির মতো মৃত ও প্রাচীন সংস্কৃত শব্দের স্থান আছে সেখানে?

আপনার কবিপ্রতিভায় আমি আস্থাবান; এ-দেশে কবিতা যাঁরা ভালোবাসেন, লেখেন ও লিখতে চেষ্টা করেন, প্রত্যেকেরই আপনার কবিতা খুব ভালো ক'রে পড়া উচিত সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। সেইজন্য যেখানেই আমার মনে হয়েছে আপনি ইচ্ছে ক'রে আপনার কবিতার উপভোগ্যতা হ্রাস করেছেন, সেখানে আমার মন প্রতিবাদ করেছে। আশা করি নিজের সংশয়ভঞ্জনের আশায় যে-সব প্রশ্ন করেছি তাতে অপরাধ নেবেন না। পরিশেষে, আপনার বন্ধু সুধীনবাবুর মারফৎ জানলুম যে আপনার মতো 'এলিয়ট-ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না।' তবে কিসের তাড়নায় লেখেন?

বুদ্ধদেব বসু

শবরী—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীহর্ষ পুস্তক-বিভাগ, একটাকা।

বাঙলাদেশের গদ্য কবিতার প্রচলন হওয়ার পর থেকে কয়েকটি যুবক কাব্য-রচনায় মন দিয়েছেন, কামাক্ষীপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। 'শবরী ও অন্যান্য কবিতা' তাঁর প্রথম বই। বইটিতে আগাগোড়া কোনো-কোনো আধুনিক কবির প্রভাব অত্যন্তই স্পষ্ট। প্রিয় কবির প্রভাবে আচ্ছন্ন হওয়া প্রথম বয়সে প্রায় অনিবার্য, সেটা অবশ্যতই দোষের নয়। তবে এটা কেটে যাওয়া দরকার; কবির প্রকৃত পরিচয় অন্যান্য কবির সঙ্গে সাদৃশ্যে নয়, তাঁর স্বতন্ত্রতায়।

'শবরী' খাঁটি বয়ঃসন্ধির সৃষ্টি। যে-অস্পষ্টতা, যে-সব মধুর ও পলাতক আবেগ, যে-ভাবালুতা, বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার অনিচ্ছা ও অক্ষমতা বয়ঃসন্ধির লক্ষণ, সেগুলো সবই এই বইয়ে পুরোমাত্রাতেই আছে। এদিক থেকে 'গণিকা'

কবিতাটি একেবারে ঠিক জাতের।

কোনও শিকারহীন প্রতীক্ষাকাতর রাত্রে
হঠাৎ কি আশ্চর্য্য হও না
তারার সোনালী আলোয়?
আর মুহূর্ত্তের জন্যেও কি কান্না পায় না
নিঃসঙ্গ শ্রাবণ রাত্রির মত?

এ-সব সুন্দর লাইন প'ড়ে সত্যেন দত্তর কথা মনে পড়ে, যিনি মেথরকে বন্ধু ব'লে বাঙলাদেশে বাহবা পেয়েছিলেন। মেথর কি গণিকা নিয়ে ভাবালুতার অবকাশ তাঁদেরই আছে, যাঁরা কখনো ভেবে দেখেন না কী কারণে মানুষ এত সভ্য হ'য়েও এই দুই শ্রেণীর উচ্ছেদ করতে পারছে না। এবং মেথর ও গণিকার উচ্ছেদ যাঁরা চান তাঁরা এদের জীবনের ভয়াবহ কুশ্রীতা নির্মম ও নির্লজ্জভাবেই উদ্ঘাটিত করবেন; কেননা মেথরকে মহৎ বলা মানেই তার অস্তিত্বের চিরন্তনতা স্বীকার ক'রে নেয়া ও আকাঙ্ক্ষা করা। সমাজের কোন্ ব্যবস্থার—বা ব্যবস্থার অভাবের—ফলে একজন স্ত্রীলোককে গণিকা হ'তে হয়, এই ধরণের কবিত্বময় 'প্রতীক্ষা' তার জীবনে সম্ভব কিনা, সত্যি তার মধ্যে 'নারী-দেহের অনন্ত ঐশ্বর্য্য' আছে কিনা, এ-সব কথা কামাক্ষীপ্রসাদ ভেবে দেখেন নি। কথাটা এই কবিতাটিকে উপলক্ষ্য ক'রে উঠলো, কিন্তু পতিত ও উৎপীড়িতকে নিয়ে এই ধরণের রোমান্টিক ভাব-বিলাস শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ ক'রে বাঙলা সাহিত্যের একটা বিশেষ লক্ষণ।

মোটের উপর কামাক্ষীপ্রসাদ লেখেন ভালো। তাঁর রচনা অনাড়ষ্ট ও মার্জিত; 'শবরী' ও অন্য কয়েকটি ছোটো কবিতা আমার বেশ ভালো লাগলো। 'মুদ্রা' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এখানে ঈষৎ পরিণতির আভাস আছে। তাঁর গদ্য ছন্দ এখন পর্য্যন্ত ভারি তরল, পরে তা নিবিড় ও সংহত হবে ব'লে আশা করা যায়। শেষের দিকে দুটি ছন্দের কবিতা আছে। ছন্দে এঁর হাত এখনো কাঁচা, 'অর্থ' কবিতার প্রথম লাইনেই ছন্দপতন। পরে কয়েকটি তরল লাইনে একটি ছবি পাওয়া গেলো মন্দ না:

নারিকেল পাতা কাঁপে;
টগরের গাছে দুটি ফুল,

একটি ভ্রমর।
চড়ুয়েরা কোলাহল করে,
কাক ডাকে, গাড়ী চ'লে যায়,
এক ঝাঁক টিয়া, দু'টি বক,
আর ক'টি ছাইরঙা পারাবত
আকাশের নীলে—'

একই জায়গায় ও একই সময়ে ভ্রমর, চড়ুই, কাক, টিয়া, বক ও পায়রার কী ক'রে সমাবেশ হ'লো সেটা একটা সমস্যা বটে। তা ছাড়া, 'পারাবত'! 'রণি' ওঠে' ধরণের কথাও বর্জনীয়।

যা-ই হোক্, 'শবরী'তে যে সম্ভাবনা আছে সেটা তুচ্ছ নয়, এবং কামাক্ষী-প্রসাদ তাঁর সম্ভাবনা পূর্ণ করতে পারবেন এমন ভরসা আমার আছে। তবে আশা করি দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি কোলন চিহ্নের এমন অরাজক অপব্যবহার করবেন না, এবং কোলনগুলো যাতে বিসর্গ ছাপা না হয়, সে-বিষয়েও যত্ন নেবেন।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন। ৬১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, "রংমশাল প্রেসে"
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু।
কার্য্যালয়—কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

সাহিত্যের স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা ব্যাপারটা কী, এই নিয়ে দুচার কথা বলবার জন্যে ফরমাস এসেছে।

সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার পূর্বেই কোথাও কোথাও করেছি। সেটা অন্তরের উপলব্ধি থেকে, বাইরের অভিজ্ঞতা বা বিশ্লেষণ থেকে নয়। কবিতা জিনিসটা ভিতরের একটা তাগিদ, কিসের তাগিদ সেই কথাটাই নিজেকে প্রশ্ন করেছি। যা উত্তর পেয়েছি সেটাকে সহজ করে বলা সহজ নয়। ওস্তাদ মহলে এই বিষয়টা নিয়ে যে সব বাঁধা বচন জমা হয়ে উঠেছে কথা উঠলেই সেইগুলোই এগিয়ে আসতে চায়, নিজের উপলব্ধ অভিমতকে পথ দিতে গেলে ঐগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা দরকার।

গোড়াতেই গোলমাল ঠেকায় "সুন্দর" কথাটা নিয়ে। সুন্দরের বোধকেই বোধগম্য করা কাব্যের উদ্দেশ্য এ কথা কোনো উপাচার্য আওড়াবামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয় তা তো বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধোঁকা লাগায়, ভাবতে বসি সুন্দর বলে কাকে। কনে দেখবার বেলায় বরের অভিভাবক যে আদর্শ নিয়ে কনেকে দাঁড় করিয়ে দেখে, হাঁটিয়ে দেখে, চুল খুলিয়ে দেখে, কথা কইয়ে দেখে সে আদর্শ কাব্য যাচাইয়ের কাজে লাগাতে গেলে পদে পদেই বাধা পাওয়া যায়। দেখতে পাই ফলস্টাফের সঙ্গে কন্দর্পের তুলনা হয় না, অথচ সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার থেকে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নেই, লোকসান আছে ফলস্টাফকে বাদ দিলে। দেখা গেল সীতার চরিত্র রামায়ণে মহিমান্বিত বটে কিন্তু স্বয়ং বীর হনুমান, তার যত বড়ো লাঙ্গুল তত বড়োই সে মর্যাদা পেয়েছে। এই রকম সংশয়ের সময়ে কবির বাণী মনে পড়ে Truth is beauty, অর্থাৎ সত্যই সৌন্দর্য। কিন্তু সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি, জ্ঞানে নয় স্বীকৃতিতে, তাকেই বলি বাস্তব। সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব, রামচন্দ্র যিনি শাস্ত্রের বিধি মেনে ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন তাঁর চেয়ে লক্ষ্মণ বাস্তব যিনি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে

অগ্নিশর্মা হয়ে তার অশাস্ত্রীয় প্রতিকার করতে উদ্যত। আমাদের কালো-কোলো আধবুড়ো নীলমণি চাকরটা, যে মানুষ এক বুঝতে আর বোঝে, এক করতে আর করে, বকলে ঈষৎ হেসে বলে ভুল হয়ে গেছে সে বেনারসি জোড় প'রে বরবেশে এলে দৃশ্যটা কী রকম হয় সে কথা তুচ্ছ, কিন্তু সে অনেক বেশি বাস্তব্ অনেক নামজাদার চেয়ে; এই প্রসঙ্গে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে কুণ্ঠা হচ্ছে। অর্থাৎ যদি কবিতা লেখা যায় তবে এ'কে তার নায়ক বা উপনায়ক করলে ঢের বেশি উপাদেয় হবে কোনো বাগ্মীপ্রবর গণনায়ককে করার চেয়ে। খুব বেশি চেনা হোলেই যে বাস্তব হয় তা নয়, কিন্তু যাকে চিনি অল্প তবু যাকে অপরিহার্যরূপে হাঁ ব'লেই মানি সেই আমার পক্ষে বাস্তব। ঠিক কী গুণে যে, তা বিশ্লেষণ করে বলা কঠিন। বলা যেতে পারে তারা জৈব, তারা organic, তাদের আত্মসাৎ করতে রুচি বা ইচ্ছার বাধা থাকতে পারে, অন্য বাধা নেই। যেমন ভোজ্য পদার্থ, তাদের কোনোটা তিতো, কোনোটা মিষ্টি, কোনোটা কটু; ব্যবহারে তাদের সম্বন্ধে আদরণীয়তার তারতম্য থাকলেও তাদের সকলেরই মধ্যে একটা সাম্য আছে, তারা জৈবিক, দেহতন্তুর নির্মাণে তারা কাজে লাগবার উপযোগী। শরীরের পক্ষে তারা হাঁ-এর দলে, স্বীকৃতির দলে, না-এর দলে নয়।

সংসারে আমাদের সকলেরই চারদিকে এই হাঁ-ধর্মীর মণ্ডলী আছে,—এই বাস্তবদের আবেষ্টন; তাদের সকলকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমাদের সত্তা আপনাকে বিচিত্র করেছে বিস্তীর্ণ হয়েছে; তারা কেবল মানুষ নয়, তারা কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, টিয়েপাখি, কাকাতুয়া, তারা আস্‌সেওড়ার বেঁড়া দেওয়া পানা-পুকুর, তারা গোঁসাইপাড়ার পোড়ো বাগানে ভাঙা পাঁচিল-ঘেঁষা পালতে মাদার, গোয়াল ঘরের আঙিনায় খড়ের গাদার গন্ধ; পাড়ার মধ্য দিয়ে হাটে যাওয়ার গলি রাস্তা, কামারশালার হাতুড়ি পেটার আওয়াজ, বহুপুরোনো ভেঙেপড়া ইঁটের পাঁজা, যার উপরে অশথ গাছ গজিয়ে উঠেছে, রাস্তার ধারের আমড়াতলায় পাড়ার প্রৌঢ়দের তাস পাশার আড্ডা, আরো কত কী যা কোনো ইতিহাসে স্থান পায় না, কোনো ভূচিত্রের কোণে আঁচড় কাটে না। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পৃথিবীর চারিদিক থেকে নানা ভাষায় সাহিত্যলোকের বাস্তবের দল। ভাষার বেড়া

পেরিয়ে তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় খুসি হয়ে বলি বাঃ বেশ হোলো, অর্থাৎ মিলছে প্রাণের সঙ্গে, মনের সঙ্গে। তাদের মধ্যে রাজা বাদশা আছে, দীনদুঃখীও আছে, সুপুরুষ আছে সুন্দরী আছে, কানা খোঁড়া কুঁজো কুৎসিতও আছে; এই সঙ্গে আছে অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া, কোনোকালে বিধাতার হাত পড়েনি যাদের উপরে, প্রাণীতত্ত্বের সঙ্গে শারীরতত্ত্বের সঙ্গে যাদের অস্তিত্বের অমিল, প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান বিস্তর। আর আছে তারা যারা ঐতিহাসিকতার ভড়ং ক'রে আসরে নামে, কারো বা মোগলাই পাগড়ি, কারো বা যোধপুরী পায়জামা, কিন্তু যাদের বারো আনা জাল ইতিহাস, প্রমাণপত্র চাইলে যারা নির্লজ্জভাবে ব'লে বসে কেয়ার করিনে প্রমাণ, পছন্দ হয় কি না দেখে নাও;—এ ছাড়া আছে ভাবাবেগের বাস্তবতা,—দুঃখ সুখ বিচ্ছেদ মিলন লজ্জা ভয় বীরত্ব কাপুরুষতা, এরা তৈরি করে সাহিত্যের বায়ুমণ্ডল, এইখানে রৌদ্রবৃষ্টি, এইখানে আলো অন্ধকার, এইখানে কুয়াশার বিড়ম্বনা, মরীচিকার চিত্রকলা। বাইরে থেকে মানুষের এই আপন করে নেওয়া সংগ্রহ, ভিতর থেকে মানুষের এই আপনার সঙ্গে মেলানো সৃষ্টি, এই তার বাস্তবমণ্ডলী, বিশ্বলোকের মাঝখানে এই তার অন্তরঙ্গ মানবলোক, এর মধ্যে সুন্দর অসুন্দর ভালোমন্দ, সংগত অসংগত, সুরওয়ালা এবং বেসুরো সবই আছে; যখনি নিজের মধ্যেই তারা এমন সাক্ষ্য নিয়ে আসে যে তাদের স্বীকার করতে বাধ্য হই, তখনি খুশি হয়ে উঠি। বিজ্ঞান ইতিহাস তাদের অসত্য বলে বলুক, মানুষ আপন মনের একান্ত অনুভূতি থেকে তাদের বলে নিশ্চিত সত্য। এই সত্যের বোধ দেয় আনন্দ, সেই আনন্দেই তার শেষ মূল্য। তবে কেমন করে বলব সুন্দর-বোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।

বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি ছাড়া কাব্যের আর একটা দিক আছে সে তার শিল্পকলা। যা যুক্তিগম্য তাকে প্রমাণ করতে হয়, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করতে চাই। যা প্রমাণযোগ্য তাকে প্রমাণ করা সহজ, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়। খুশি হয়েছি এই কথাটা বোঝাতে লাগে সুর, লাগে ভাবভঙ্গী। এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে, মা যেমন ক'রে ছেলেকে সাজায়,

প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসর ঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। কথার শিল্প তার ছন্দে, ধ্বনির সংগীতে, বাণীর বিন্যাসে ও বাছাই কাজে। এই খুশির বাহন অকিঞ্চিৎকর হোলে চলে না, যা অত্যন্ত অনুভব করি সেটা যে অবহেলার জিনিস নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।

অনেক সময়ে এই শিল্পকলা শিল্পিতকে ডিঙিয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্যকেই মুখ্য করে তোলে। কেননা তার মধ্যেও আছে সৃষ্টির প্রেরণা। লীলায়িত অলঙ্কৃত ভাষার মধ্যে অর্থকে ছাড়িয়েও একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়,—সে তার ধ্বনিপ্রধান গীতধর্মে। বিশুদ্ধ সংগীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই,—ভাষার সঙ্গে শরিকিয়ানা করবার তার জরুরি নেই। কিন্তু ছন্দে, শব্দবিন্যাসের ধ্বনিঝংকারের ও তির্যক ভঙ্গীতে যে সংগীতরস প্রকাশ পায় অর্থের কাছে অগত্যা তার জবাবদিহি আছে। কিন্তু ছন্দের নেশা, ধ্বনিপ্রসাধনের নেশা অনেক কবির মধ্যে মৌতাতি উগ্রতা পেয়ে বসে, গদ্গদ আবিলতা নামে ভাষায়,—স্ত্রৈণ স্বামীর মতো তাদের কাব্য কাপুরুষতার দৌর্ব্বল্যে অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে।

শেষ কথা হচ্ছে, Truth is beauty। কাব্যে এই ট্রুথ্ রূপের ট্রুথ্, তথ্যের নয়। কাব্যে রূপ যদি ট্রুথরূপে অত্যন্ত প্রতীতিযোগ্য না হয় তাহোলে তথ্যের আদালতে সে অনিন্দনীয় প্রমাণিত হোলেও কাব্যের দরবারে সে নিন্দিত হবে। মন ভোলাবার আসরে তার অলংকারপুঞ্জ যদি বা অত্যন্ত গুঞ্জরিত হয় অর্থাৎ সে যদি মুখর ভাষায় সুন্দরের গোলামি করে, তবু তাতে তার অবাস্তবতা আরো বেশি করেই ঘোষণা করে, আর এতেই যারা বাহবা দিয়ে ওঠে রূঢ় শোনালেও বলতে হবে তাদের মনের ছেলেমানুষি ঘোচে নি।

শেষকালে একটা কথা বলা দরকার বোধ করছি। ভাবগতিকে বোধ হয় আজকাল অনেকের কাছেই বাস্তবের সংজ্ঞা হচ্ছে যা-তা। কিন্তু আসল কথা, বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের বাছাইকরা জিনিস। নির্বিশেষে বিজ্ঞানে সমান মূল্য পায় যা-তা। সেই বিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায়

তারাই আমাদের বাস্তব। আর যে সব অসংখ্য জিনিস নানা মূল্য নিয়ে নানা হাটে যায় ছড়াছড়ি, বাস্তবের মূল্যবর্জিত হয়ে তারা আমাদের কাছে ছায়া।

পাড়ায় মদের দোকান আছে সেটাকে ছন্দে বা অছন্দে কাব্যরচনায় ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে। সেই মহলের বাসিন্দারা বলেন, বহুকাল ইন্দ্রলোকে সুধাপান নিয়েই কবিরা মাতামাতি করেছেন, ছন্দে বন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজমাত্র দেন নি—অথচ শুঁড়ির দোকানে হয় তো তাঁদের আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। এ নিয়ে অপক্ষপাতে আমি বিচার করতে পারি—কেন না আমার পক্ষে শুঁড়ির দোকানে মদের আড্ডা যত দূরে ইন্দ্রলোকের সুধাপানসভা তার চেয়ে কাছে নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হিসাবে। আমার বলবার কথা এই যে, লেখনীর জাদুতে কল্পনার পরশমণি স্পর্শে মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে সুধাপান সভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই। অথচ দিনক্ষণ এমন হয়েছে যে ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে মাতালের আড্ডার অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে যাচনদার বলবে, হাঁ, কবি বটে, বলবে, এ'কেই তো বলে রিয়ালিজ্‌ম।—আমি বলছি বলে না। রিয়ালিজ্‌মের দোহাই দিয়ে এ রকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়। ধোবার বাড়ির ময়লা কাপড়ের ফর্দ নিয়ে কবিতা লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব, বাস্তবের ভাষায় এর মধ্যে বস্তা ভরা আদিরস, করুণরস এবং বীভৎস রসের অবতারণা করা চলে। যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে দুইবেলা বকাবকি চুলোচুলি, তাদের কাপড় দুটো একঘাটে একসঙ্গে আছাড় খেয়ে খেয়ে নির্মল হয়ে উঠছে, অবশেষে সওয়ার হয়ে চলেছে একই গাধার পিঠে, এ বিষয়টা নব্য চতুষ্পদীতে দিব্য মানানসই হোতে পারে। কিন্তু বিষয় বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম্ নয়, রিয়ালিজ্‌ম ফুটবে রচনার জাদুতে। সেটাতেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে তবে অমনতরো অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা আর কিছুই হোতে পারে না। এ নিয়ে বকাবকি না ক'রে সম্পাদকের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে প্রমাণ করুন রিয়ালিষ্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু রিয়ালিষ্টিক ব'লে নয় কবিতা ব'লেই। পূর্বোক্ত বিষয়টা যদি পছন্দ না হয় তো

আর একটা বিষয় মনে করিয়ে দিচ্ছি, বহুদিনের বহুপদাহত ঢেঁকির আত্মকথা। প্রাচীনযুগে অশোক গাছে সুন্দরীর পদস্পর্শব্যাপারের চেয়েও হয়তো এ'কে বেশি মর্যাদা দিতে পারবেন বিশেষত যদি চরণপাত বেছে বেছে অসুন্দরীদের হয়। আর যদি শুকিয়ে-পড়া খেজুর গাছের উপর কিছু লিখতে চান, তা হোলে বলতে পারবেন ঐ গাছ আপন রসের বয়সে কত ভিন্ন ভিন্ন জীবনে কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের নেশার সঞ্চার করেছে; তার মধ্যে হাসিও ছিল কান্নাও ছিল ভীষণতাও ছিল। সেই নেশা যে-শ্রেণীর লোকের তার মধ্যে রাজাবাদশা নেই, এমন কি এম এ পরীক্ষার্থী অন্যমনস্ক তরুণ যুবকও নেই, যার হাতে কব্জি-ঘড়ি, চোখে চষমা, এবং অঙ্গুলিকর্ষণে চুলগুলো পিছনের দিকে তোলা। বলতে বলতে আরেকটা কাব্য বিষয় মনে পড়ল।—একটুকু তলানিওয়ালা লেবেল উঠে যাওয়া চুলের তেলের নিশ্ছিপি একটা শিশি, চলেছে সে তার হারা জগতের অন্বেষণে, সঙ্গে সাথী আছে একটা দাঁতভাঙা চিরুনি আর শেষ ক্ষয় ক্ষয়ে যাওয়া সাবানের পাৎলা টুকরো। কাব্যটির নাম দেওয়া যেতে পারে আধুনিক রূপকথা। তার ভাঙা ছন্দে এই দীর্ঘনিশ্বাস জেগে উঠবে যে কোথাও পাওয়া গেল না সেই খোয়ানো জগৎ। এই সুযোগে সেদিনকার দেউলে অতীতের এই তিনটি উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিশ্ববিধি ও বিধাতাকে বেশ একটু বিদ্রূপ করে নিতে পারে, বলতে পারে সৌখীন মরীচিকার ছদ্মবেশ পরে বাবুয়ানার অভিনয় করত ঐ মহাকালের নাট্যমঞ্চের সঙ,—আজ নেপথ্যে উঁকি মারলে তাকে আর চেনাই যায় না; এমন ফাঁকির জগতে সত্য যদি কাউকে বলা যায় তবে তার প্রতীক বাজারদরের বাইরেকার আমরা কটিই, এই তলানি তেলের শিশি, এই দাঁতভাঙা চিরুণি, আর ক্ষয়ে যাওয়া পাৎলা সাবানের টুকরো; আমরা রীয়ল, আমরা ঝাঁটানি-মালের ঝুড়ি থেকে আধুনিকতার রসদ জোগাই। আমাদের কথা ফুরোয় যেই, দেখা যায় নটে গাছটি মুড়িয়েছে; কালের গোয়ালঘরের দরজা খোলা, তার গোরুতে দুধ দেয় না, কিন্তু নটে গাছটি মুড়িয়ে খায়। তাই আজ মানুষের সব আশা ভরসা ভালোবাসার মুড়োনো নটে গাছটার এত দাম বেড়ে গেছে কবিত্বের হাটে। গোরুটাও হাড়-বের-করা, শিং-ভাঙা, কাকের ঠোকর

খাওয়া ক্ষতপৃষ্ঠ, গাড়োয়ানের মোচড় খেয়ে খেয়ে গ্রন্থিশিথিল ল্যাজওয়ালা হওয়া চাই। লেখকের অনবধানে এ যদি সুস্থ সুন্দর হয় তাহলে মিড্-ভিক্টোরীয় যুগবতী অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়া খেয়ে মরতে যাবে সমালোচকের কশাইখানায়।

কবিতার কথা

জীবনানন্দ দাশ

সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা র'য়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

বলতে পারা যায় কি এই সম্যক কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে? কেউ কেউ বলেন, আসে পরমেশ্বরের নিকট থেকে। সে কথা যদি স্বীকার করি তাহ'লে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেল্লাম। হয়তো সেই হীরের ছুরি 'পরীদেশের,' কিংবা হয়তো সৃষ্টির রক্ত চলাচলের মতই সত্য জিনিস। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের এবং কাব্য সমালোচনা-নমুনার নতুন নতুন আবর্ত্তনে বিশ্লেষকেরা এই আশ্চর্য্য গিঁটকে—আমি যতদূর ধারণা করতে পারছি—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খসাতে চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে আমি কি বিশ্বাস করি—কিংবা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবার মত কোনো সুস্থিরতা খুঁজে পেয়েছি কিনা—এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলব না আমি আর। কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্ত্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকাররূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে কবিতা রচনা করতে হবে তাদের এ দাবীর সম্পূর্ণ মর্ম্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ডবিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ

পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্ত্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানারকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্য্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সব চেয়ে আগে এবং সব চেয়ে বেশি ক'রে; কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।

আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা-খচিত—অভিব্যক্ত সৌন্দর্য্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা' হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহ'লে কবিতা সৃষ্ট হয় না—পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্যরকম, কোনো প্রাক্‌নির্দ্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত ক'রে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মত লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে; বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না; কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়; জীবনের সমস্যা ঘোলাজলের মূষিকাঞ্জলির ভিতর শালিখের মত স্নান না ক'রে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের সাদা রৌদ্রের মত;—সৌন্দর্য্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।

এ না হ'লে আমরা জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্য কেন পতঞ্জলির কাছে যাব না, বেদান্তের কাছে যাব না, ষড়্‌দর্শনের কাছে যাব না, মাঘ ও ভারবির কাছে না গিয়ে? জীবনের ও সমাজের ও জাতির সমস্যার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোক চাই—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওয়াহরলালের নিকট

যাব না কেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নিকট না গিয়ে; দার্শনিক বার্গসঁ'র কাছে যাওয়া উচিত, ইংলণ্ডের বা রুশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিদ সুধী ও কর্ম্মীদের নিকট যাওয়া উচিত—ইয়েট্‌সের কাব্যের নিকট, এমন কি এলিয়ট ইত্যাদির কাব্যপ্রচেষ্টার নিকটেও নয়।

এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি ক'রেই যেন, অথচ যা অত্যুক্তি নয়—আমার কাছে অন্তত সত্য ব'লে মনে হয়: কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্দ্ধনারীশ্বরের মত একাত্ম হ'য়ে থাকে না; ঘাস, ফুল বা মানবীর প্রকট সৌন্দর্য্যের মত নয়; তাদের সৌন্দর্য্যকে সার্থক ক'রে কিন্তু তবুও সেই সৌন্দর্য্যের ভিতর গোপনভাবে বিধৃত রেখা উপরেখার মত যে জিনিসগুলো মানবী বা ঘাসের সৌন্দর্য্যের আভার মত রসগ্রাহীকে প্রথমে ও প্রধানভাবে মুগ্ধ করে না—কিন্তু পরে বিবেচিত হয়—অবসরে তার বিচারকে তৃপ্ত করে। যাঁরা একথা স্বীকার করেন না, যাঁরা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস কিংবা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে সৌন্দর্য্যের মতই প্রধান জিনিস হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন তাঁদের আমি এই কথা বলতে চাই যে মানুষ—সে যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন—একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা দর্শন বা ধর্ম্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়,—যাকে বলা হ'ল কাব্য (বা শিল্প)—যার কতগুলো ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কি ধর্ম্মের আস্বাদেও যা পাই না—এবং ধর্ম্ম বা দর্শনের ভিতরে যে তৃপ্তি পাই কাব্যের ভিতর অবিকল তা' পাই না;—পৃথিবীর শতাব্দী-স্রোতের ভিতর মানুষ যদি এমন একটা বিশেষ রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করল (কিংবা হয়তো অমানব কেউ মানুষের জন্য সৃষ্টি করল)—কি করে সেই বিচিত্রতার নিকট তার অনধিগত, অতিরিক্ত দাবী আমরা করতে পারি? কিংবা সেই সব দাবী কবিতা যদি মেটাচ্ছে বা মেটাতে পারে ব'লে মনে করি তাহ'লে তার ন্যায্য ধর্ম্ম অভঙ্গুর নয়, আর; তার বিশেষ স্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই। সে যা দিতে পারে দর্শনও তা' দিতে পারে, ধর্ম্মও তা' দিতে পারে; সমাজসংস্কারক, জাতিসংস্কারক

মনীষীরা এমন কি কর্ম্মীরাও তা' দিতে পারে। তাহ'লে কাব্যের স্বকীয় সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমি জানি কাব্যের নিজের ইন্‌টিগ্রিটির প্রয়োজন রয়েছে। এবং এই প্রবন্ধের ভিতর আমার নিজের কথারই পুনরুক্তি ক'রে আমি বলব: 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।' দর্শন বা সমাজসংস্কার বা মানুষের কর্ম্ম ও মননের জগতে অন্য কোনো বিকাশের ভিতর এই কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঠিক এই ধরণের সারবত্তা নেই। হতে পারে কবিতা জীবনের নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন; কিন্তু উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মত নয়; যা উদ্‌ঘাটিত হ'ল তা' যে কোনো জঠরের থেকেই হোক্ আসবে সৌন্দর্য্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে; যদি তা' না দেয় তাহ'লে উদ্‌ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিংবা হয়তো নতুন কোনো চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,) কিন্তু তবুও তা' কবিতা হ'ল না, হ'ল কেবলমাত্র মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদ্‌ঘাটন—পুরোনোর ভিতরে সেই নূতন কিংবা সেই সজীব নূতন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্য্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে তাহ'লে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল; আরো নানারকম মূল্য—যে সবের কথা আগে আমি বলেছি—তার থাকতে পারে, আমার জীবনের ভিতর তা' আরো খানিকটা জ্ঞান বীজের মত ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টি-স্থূলতাকে উঁচু মঠের মত যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ষ আমোদের আস্বাদ দিতে পারে; এবং কল্পনার আভায় আলোকিত হ'য়ে এ সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীরভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রদীপ—ততই নক্ষত্রের নূতনতম কক্ষপরিবর্ত্তনের স্বীকৃতি-ও-আবেগের মত জ্বলতে থাকবে।

প্রত্যেক মনীষীরই একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে—নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে; কাব্যসৃষ্টির ভিতরে। আমরা হয়তো মনে

করতে পারি যে যেহেতু সে মনীষী কাজেই অর্থনীতি সম্বন্ধে—সমাজনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে মননরাজ্যের নানাবিভাগেই কবির চিন্তার ধারা সিদ্ধ। আমাদের উপলব্ধি ক'রে নিতে হবে যে তা' নয়। উপকবির চিন্তার ধারা অবশ্য সব বিভাগেই সিদ্ধ—যেমন উপদার্শনিকের। কিন্তু প্রতিভা যাকে কবি বানিয়েছে কিংবা সঙ্গীত-বা-চিত্র-শিল্পী বানিয়েছে—বুদ্ধির সমীচীনতা নয়,—শিল্পের দেশেই সে সিদ্ধ শুধু—অন্য কোথাও নয়। একজন প্রতিভাযুক্ত মানুষের কাছ থেকে আমরা যদি তার শ্রেষ্ঠ দান চাই, কোনো দ্বিতীয় স্তরের দান নয়, তাহ'লে তা' পেতে পারি সেই রাজ্যের পরিধির ভিতরেই শুধু যেখানে তার প্রতিভার প্রণালী ও বিকাশ তর্কাতীত। শেক্‌স্‌পীয়ারের কথাই ধরা যাক্ ;—তাঁর এক একটি নাটক পড়তে পড়তে বোঝা যায় মনোবৈজ্ঞানিকের নিকট যেমন ক'রে পাই তেমন ক'রে নয়, মানবচরিত্র ও মানুষের প্রদেশ সম্বন্ধে নানারকম অর্থ ও প্রভূত সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল কাব্যের সমুদ্রবীজনের গভীরে গভীরে মুক্তার মত, কিংবা কাব্যের আকাশের ওপারে আকাশে স্বাদিত, অনাস্বাদিত নক্ষত্রের মত সব খুঁজে পাওয়া গেল যেন। কারণ এখন আমরা প্রতিভার সঙ্গে বিহার করছি সেই রাজ্যে যেটি তাঁর নিজস্ব। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রকে যদি ইংলণ্ডের কোনো জনসভায় দাঁড়িয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতে হত এলিজাবেথীয় সমাজ সম্বন্ধে, আমি ধারণা করতে পারি না যে অন্য কোনো অভিজ্ঞ সমাজনীতিবিদের চেয়ে তা' কোনো অংশে অসাধারণ কিছু হত (হয়তো হাসি তামাসা এবং যুক্তিহীন মুখর প্রশংসা থাকত সেই সমাজ ও সমাজপতিদের সম্বন্ধে)। কিংবা শেক্‌স্‌পীয়রকে যদি ইংলণ্ডের কোনো বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের তখনকার রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হ'ত, সে অভিভাষণের ভিতর কোনো বাগ্মীতা থাকত বলে মনে হয় না—তা' নাই বা থাকল—কিন্তু তেমন কোনো সারবত্তাও থাকত না ইংলণ্ডের তখনকার রাজনীতিজ্ঞদের আলোচনায়ও যেটুকু রয়েছে ; কিংবা তার ঈষৎ প্রতিবিম্বও থাকত না শেক্‌স্‌পীয়রের নিজের কাব্যে অন্যরকম সারবত্তার যে আশ্চর্য্য ব্যাপক গভীরতা আমাদের বিস্মিত করে। বৈষ্ণব যুগ থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শেক্‌স্‌পীয়রের সম্বন্ধে যে কথা বললাম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঠিক সেই

কথাই বলা চলে—সব কবির সম্বন্ধেই। অন্য সমস্ত প্রতিভার মত কবি-প্রতিভার নিকট থেকেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হ'লে যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে ; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্ম্মও নেই—কিংবা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর ; এ সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্ম্মীদের হাতে যেন—কবির হাতে আর নয়।

কেউ যেন মনে না করেন আমি কবিকে কাব্যসৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে নিষেধ করছি। আমি তা মোটেই করছি না। কবি তার ব্যবহারিক জীবনে কর্ম্ম-ও-মননরাজ্যে যেখানে যে অসঙ্গতি বা অন্ধকার র'য়েছে ব'লে মনে করেন সব কিছুর সঙ্গেই সংগ্রাম ক'রতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ; এই প্রবন্ধের আরম্ভেই আমি বলেছি যে তা'র কাব্যেও কল্পনার-ভিতর-চিন্তা-ও-অভিজ্ঞতার সারবত্তা থাকবে। আমি তার প্রতিভার স্বধর্ম্মের কথা বলেছি ; কাব্য সম্পর্কে যে জিনিসের বিশ্লেষণ ইতিপূর্ব্বে আমি করেছি ; এবং ব্যবহারিক জীবনে যে স্বধর্ম্ম অসাধারণ কিছু দিতে পারে না-এমন কি কাব্যজীবনকে নষ্ট ক'রেও দিতে পারে না বলে উল্লেখ ক'রেছি। সে যদি বাস্তবিক কবি হয়, তাহ'লে তার কাব্যের মত অসাধারণ কোনো দ্বিতীয় জিনিস ব্যবহারিক জীবনের পদ্ধতি ও প্রকাশের নিকট দান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিমান লোকের মত কর্ম্ম ও চিন্তা দান করতে পারে সে,—ব্যবহারিক মানুষ হিসেবে। সেখানে তার কাব্যজগতে কল্পনা-মনীষার মুক্তি নেই—এবং তার প্রয়োজনও নেই।

যাঁরা আমার প্রবন্ধ এই পর্য্যন্ত অনুসরণ করেছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে আমি বলতে চাই না যে কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই ; সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকট ভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত

হয় না ; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি ক'রে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না : আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ ক'রেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তা হ'লে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধূলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য ;—অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ : সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা। সৃষ্টির ভিতর মাঝে-মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথাও যেন ছিল ;—এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে আরো অনেকদিন পর্য্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্য্যন্ত কোথাও যেন রয়ে যাবে ;—এই সবের অপরূপ উদ্গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়,—নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর ;—এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ ক'রে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয় ;—এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে—কাব্য জন্ম লাভ করে।

কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয় ;—কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মণ্ডিত ক'রে পরিবেষণ—না, তাও নয় ; কবির সেরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। 'কিঙ্ লিয়ার' কিংবা 'বলাকা'র কবিতায়—এবং পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যেই কবির কল্পনা-প্রতিভার বিচ্ছুরণে, কিংবা তার সৃষ্ট কবিতার ভিতর সেরকম কোনো লক্ষ্যের প্রাধান্য নেই। কবিতাপাঠ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র রসাস্বাদ : যার পরিচয় দিয়েছি ইতিপূর্ব্বে। কিন্তু তবুও কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ অন্তত

দুই রকম। প্রথমত শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে—এবং নতুন ক'রে গড়তে চাচ্ছে ; এবং এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোনো একটা সুষীম আনন্দের দিকে। এই ইঙ্গিত এত মেঘধবলিমা গভীর ও বিরাট, অথচ এত সূক্ষ্ম যে ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতা তাকে উপেক্ষা করলেও (সব সময় উপেক্ষা করে না যদিও) এই ইঙ্গিতের প্রভাবে তারা অতীতে উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে উদ্ধার লাভ করতে পারে। এইজন্যই সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কাব্য তাদের নিজের প্রণালীতে মানুষের চিত্তকে যত বেশি অধিকার করতে পারবে সভ্যতার তত বেশি উপকার। কিন্তু খৃষ্টান পাদরিরা যেমন জনতার হাজার হাজার বর্গ মাইলের দিকে তাকিয়ে বাইবেল বিতরণ করেন শ্রেষ্ঠ কাব্য সেরকম ভাবে বিতরিত হবার জিনিস নয়।

এই প্রসঙ্গেই ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে কবিতার দ্বিতীয় সম্বন্ধের কথা ওঠাতে পারি। কথাটা হয়তো স্বাদহীন শোনাবে, কিন্তু আমার মনে হয় তা' সত্য। কবিতা সকলের জন্য নয়, এবং যে পর্য্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন দিগ্‌বলয় অধিকার না করবে সে পর্য্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর 'কবি'র স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে ও বন্দরে—এবং মানবসমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না ; এমন কি তা' বিলাস, কল্পনাবিলাসি পর্য্যন্ত ব'লে আখ্যাত হয় এবং হবে এই সব স্থূল উদ্গাতাদের কাছে ;—যদিও আমরা জানি তা' কল্পনাবিলাস নয় কিন্তু কল্পনা-মনীষার সাহায্যে যেন কোনো মহান—কোনো আদিম জননীর নিকট—যেন কোনো অদিতির নিকট প্রশ্ন, বারংবার প্রশ্নের বেদনা, প্রশ্নের তুচ্ছতা ; বারংবার প্রতি যুগের স্তরে স্তরে যেন কোনো নূতন সৃষ্টির বেদনা ও আনন্দ ; অবশেষে একদিন সমস্ত চরাচরের ভিতর সকলের জন্য কোনো সঙ্গতির সৌন্দর্য্য পাওয়া যাবে ব'লে।

কবিতা আমাদের জীবনের পক্ষে সত্যই কি প্রয়োজন ? কেন প্রয়োজন ? কবিতা যে এত অল্প লোকে ভালোবাসে সেটা কি প্রকৃতিরই নিয়ম, না কি অধিকাংশের

বিকৃত কি দূষিত শিক্ষার ফল? যদি আরো বেশি লোকে কবিতা ভালোবাসতে ও বুঝতে শেখে তাহ'লে সেই অনুপাতে তারা ভালো ক'রে বাঁচতে শিখবে কিনা—অর্থাৎ সেই অনুপাতে সমাজের মঙ্গল হবে কিনা? মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীণ ও সুখের ক'রে গড়বার সংগ্রামে ও সাধনায় কবিতার স্থান কোথায়?—এ প্রশ্নগুলি কোনো হিতসাধনমণ্ডলীর কর্ম্মসচিবদের প্রশ্ন বলে মনে হয় কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসাগুলো নিটোল ও আন্তরিক, এবং বিশদভাবে নয়, সংক্ষেপে, হয়তো ইসারায় এসব জিজ্ঞাসার উত্তর আমার উপরের কয়েকটি লাইনের ভিতর নিহিত রয়েছে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে ভিড়ের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন আনবে কে? সেই পরিবর্ত্তন হবে কি কোনোদিন?—যাতে তিন হাজার বছর আগের জনসাধারণ কিংবা আজকের এই বিলোল ভিড়ের মত জনসাধারণ থাকবে না আর? যাতে এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ডে কিংবা ধরা যাক ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে গণ-পাঠক সে সবের গভীর বোদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে? ভাবতে গেলেও হাসি পায়। কিন্তু তামাসার জিনিস নয় হয়তো। যখন দেখি শুধু তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পীই শুধু নয়, এদিককার উচ্চস্তরের শিল্পীরাও দিকে দিকে স্বীকৃত হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় প্রথম শ্রেণীর কবি নির্ব্বাসিত হয়ে রয়েছে কেন? কিন্তু যখন দেখি তথাকথিত সভ্যতা কোনো এক দারুণ হস্তীজননীর মত যেন বুদ্ধিস্খলিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে প্রসবে পৃথিবীর ফুটপাথ ও ময়দান ভরে ফেলছে তখন মনে হয় যে কোনো সূক্ষ্মতা, পুরোনো মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির বিরুদ্ধে যা, পুরোনো প্রদীপকে যে-অদৃশ্য হাত নতুন সংস্থানের ভিতর নিয়ে গিয়ে প্রদীপকেই যেন পরিবর্ত্তন করে ফেলে; তার এই সাময়িকতা ও সময়হীনতার গভীর ব্যবহার যেন মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্য শুধু—সকলের জন্য নয়—অনেকের জন্য নয়।

কিন্তু তবুও সকলের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হবে কি? কবে? কে আনবে? কবিকে কি শিক্ষার অধিনায়ক সাজতে হবে? সৌন্দর্য্যপ্রবাদে স্পন্দিত করে

বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে? প্রপ্যাগ্যাণ্ডা করতে হবে? ডিক্টেটর সাজতে হবে জীবনের সঙ্গতি ও সুষমার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে? যদি কোনো শেষ বৈকালিক ইন্দ্রজালে আজকের এই সভ্যতার মোড় ঘুরে যায় তাহ'লে কবিকে কিছুই করতে হবে না আর; তার নিজের প্রতিভার নিকট তাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তার কবিতার দান অর্পণ করে; যে কতিপয় হয়তো ক্রমে ক্রমে বেড়েও যেতে পারে—মানুষের হৃদয় তার পুরোনো আপোষ-অবলেপের ভিতর আর থাকতে পারছে না বলে। আর যদি সভ্যতার মোড় ঘুরে না যায় তাহ'লে কমরেডের দল এবং সাহিত্যের হব্‌গব্লিনেরা কাব্যের জন্য একটা কিছু করবেনই নিশ্চয়। সাহিত্যজগতে গ্যয়টে বা ল্যাম, কিংবা তাঁর নিজের ভাবে পেটার, অথবা রবীন্দ্রনাথ অথবা ইয়েটস্, কিংবা স্বস্পষ্ট পরিধিবিশেষের ভিতর এলিয়ট ইত্যাদির মত প্রকৃষ্ট রসবোদ্ধাদের কথা ছেড়ে দিলেও বিদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীদের ভিতরেও এমন অজস্র খাঁটি রসবোদ্ধা আছে যার হীন ভগ্নাংশও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে নেই; এদেশে রসবোধ যে হৃদয়হীনভাবে বিরল কবির কোনো কোনো শিথিল মুহূর্ত্তের নিকট এর তিক্ততাও কম নয়।

কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, অতএব স্বখাতসলিলে ধাতস্থ আমাদের দেশের সাহিত্যকর্ম্মীদের সহানুভূতি যার জন্য একটুও নেই তিনি কি করবেন? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর চলে যাবেন—সহরে বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতর ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনামনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার জন্য সেই চেষ্টা করবেন;—আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর;—সেই কোন্ আদিম জননীর নিকটে যেন, নির্জ্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনো অদিতির নিকট।

তার প্রতিভার নিকট কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে;—হয়তো কোনো একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেতে বুননের জন্য।

বাংলা মিলের দুরূহ তত্ত্ব

অজিত দত্ত

কবিতা লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। সেটা অবশ্য আমারই অক্ষমতা, গোড়াতেই সে কথা স্বীকার করা ভালো।

কবিতা লিখতে আমার কষ্ট হয় ; কারণ, মিল দেওয়া জিনিসটা আমার মনে হয় ভীষণ দুরূহ। অথচ মিল ছাড়া গদ্য কবিতা লেখবার শক্তি আমার নেই। চরণের শেষে 'প্রিয়া' শব্দটি ব্যবহার করা মাত্র যখন দেখি 'হিয়া'র মত অপ্রচলিত ষোড়শ শতাব্দীর 'পদ্য'-ছাপ-মারা কথা, অথবা 'দিয়া' কিংবা 'নিয়া'র মত প্রাদেশিক শব্দ দিয়ে আমাকে পদ্য মেলাতে হবে, তৎক্ষণাৎ আমি কলম ছেড়ে উঠে পড়ি। বন্ধুরা যখন প্রশ্ন করেন কবিতা লিখি না কেন, আমি স্বীকার করি যে আমি আজকাল আর কবিতা লিখতে পারি না।

আমার নিজের অক্ষমতা তো আছেই। কিন্তু একথাও আমি নিবেদন করতে চাই যে বাংলা কবিতার মিল দেবার যে নিয়ম প্রচলিত, তা অনেক সময় কাব্যের রস নষ্ট করে এবং সাধারণত কবিসম্প্রদায়ের উপর নিদারুণ অবিচারের পরিচয় দেয়। যাঁরা মিল দিয়ে পদ্য লেখেন তাঁরা জানেন যে বাংলা প্রচলিত শব্দের মধ্যে তিনচারটির বেশি একরকম মিলের কথা খুঁজে পাওয়া কত শক্ত। কাজেই অনেক সময় সেই সামান্য ক'টি কথার মধ্যে মিল বজায় রাখতে গিয়ে ভাবকে বিকৃত করতে হয়, অনেক সময় কবিতার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা যায় না। বাংলায় যে মিলের এত অভাব তার কারণ স্বরান্ত শব্দে একটি স্বরের মিলকে (one syllabic rhyme) সাধারণত আমরা অত্যন্ত খারাপ মিল বলে' মনে করি, বাংলায় সে-জিনিস প্রায় অচল। অপরপক্ষে বহুস্বরের মিলকে আমরা খুব ভালো মিল বলি। 'ভালো মিলে'র প্রতি আমাদের এমনি মোহ, যে যিনি যত 'ভালো মিল' দিতে পারেন, আমরা অনেক সময় তাঁকেই তত বড় কবি বলে' ভাবি। এককালে সত্যেন্দ্র দত্তের যশ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকেও প্রায় ছাড়িয়ে গিয়েছিলো ; তার কারণ তাঁর ছন্দের হাত খুব ভালো ছিল আর তিনি খুব ভালো মিল দিতে পারতেন। বলা বাহুল্য,

আমাদের এই মাপকাঠিতে বিচার করলে প্রায় সব প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ কবিকেই খারাপ কবি বলে' ধরতে হয়, যদিও ইংরেজ পাঠকেরা কখনো সেটা মনে করেনি।

সংস্কৃত কাব্যে মিলের বালাই বড় একটা ছিল না ; কবিরা যখন মিল দিতেন অবশ্য খুব ভালো করে'ই দিতেন, কারণ সেটা তাঁদের কাছে ছিল নেহাৎই একটা অলঙ্কার। ভালো কবিরা এ-অলঙ্কারের ব্যবহার কমই করেছেন। কালিদাসের নামে প্রচলিত 'নলোদয়' নামে যে বইয়ে এই অলঙ্কার এবং অন্যান্য নানারকম বাক্‌চাতুর্য্যের বাহুল্য দেখা যায়, সমালোচকেরা সে বইখানাকে কালিদাসের বলে' স্বীকার করতে দ্বিধা করেন। কারণ—একথা আজকালকার আধুনিক মেয়েরাও জানেন—সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য বেশি গয়না পরার দরকার হয় না ; অপর পক্ষে বেশি অলঙ্কার তারাই ধারণ করে যাদের রুচি বিকৃত অথবা যাদের নিজস্ব রূপ খুব বেশি নেই। বাংলা দেশে কিন্তু—দুঃখের বিষয়—অলঙ্কারের দিকেই ঝোঁকটা বেশি। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে বাংলা দেশে যখন সবে সাহিত্যের সুরু, বাংলা-ভাষা যখন কেবলমাত্র গড়ে' উঠছে, তখন বাংলাদেশের একজন কবি সংস্কৃত ভাষায় পদ্য লিখে মিল, অনুপ্রাস, ইত্যাদির নানারকম কসরৎ দেখিয়ে বাহাদুরি কিনে গেছেন। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে অপ্রাচীন কবি জয়দেবের পদ্যের মত অন্তঃসারশূন্য অথচ সুখপাঠ্য জিনিসই চিরকাল বাঙালির প্রিয় হয়ে রইলো।

আমি বাংলা কবিতায় এক স্বরের মিলের পক্ষপাতী। তার প্রথম কারণ আমার বিশ্বাস কবিতা সুশ্রাব্য এবং সুপাঠ্য হবার জন্যে কমপক্ষে যেটুকু দরকার তার বেশি কবিদের কাছ থেকে আমাদের দাবী করা উচিত নয়। দুই বা ততোধিক স্বরের মিল কবিতায় প্রত্যাশা করলে আমার মতে কবিদের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। যেহেতু মিলটা কাব্যের নেহাৎই গৌণ জিনিস। কাব্য-রচনার পিছনে রয়েছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। ভালো কাব্যের ভিতরে যে প্রবেশ করবে সে দুর্ল্ভ আনন্দলাভ করবে, কিন্তু তার বাইরের রূপটাও বীভৎস বা নিরানন্দ না হয়। ছন্দ এবং মিলের প্রয়োজন এইটুকুই। কবিতার

রস যখন উপভোগ করা হচ্ছে, তখন মন ও কান কেউই বঞ্চিত হয় না। সেই জন্যই কবিতা-পড়ার আনন্দ এত পরিপূর্ণ।

আমি বলি কানটাকেই প্রাধান্য দেওয়া কেন? 'অন্ধকার'-এর সঙ্গে 'বন্ধ দ্বার' মিল দেখে আমরা তারিফ কেন করবো? এবং কবিদের কাছ থেকে এ-জাতীয় মিল আমরা চাইবোই বা কেন? প্রাচীন বাংলা কাব্যে মিলের এ কড়াক্কড় ছিল না। ভারতচন্দ্রের আগে পর্য্যন্ত সব কবিই মিল বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে' গেছেন। এবং তার দ্বারা তখনকার পাঠকদের রসোপভোগে বাধা জন্মেছে, এ রকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি এই অতি-আধুনিক যুগেও সে-সব কাব্য পড়লে মিলের 'দোষ'টাই যে বড্ড বেশি কানে লাগে, তা নয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারতে দুই স্বরের মিলটাই বরঞ্চ ব্যতিক্রম, কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙালি পাঠকের কোনোদিন সে-সব বই উপভোগে বাধা জন্মেনি। ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত, যে দুজন কবি আধুনিক বাংলা কবিতায় বহুস্বরের মিল প্রচলনের জন্য প্রধানত দায়ী, তাঁদেরকে কেউ প্রথম শ্রেণীর কবি বলবে না, যদিও এঁরা দুজনেই প্রতিভাবান ছিলেন, এবং বাংলা সাহিত্যে এঁদের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকা ভালো মিলের জন্য বিখ্যাত নয়, অথচ উৎকৃষ্ট কাব্য। দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায় তথাকথিত খারাপ মিল যথেষ্ট দেখা যায়। এঁরা দুজনেই উৎকৃষ্ট কবি—রসিকসমাজে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হবে না। অথচ যে-সব কবি কেবলমাত্র 'নন্দন'-এর সঙ্গে 'চন্দন' আর 'মৃদুমুখী যূথিকার' সঙ্গে 'সিধুসুখী স্তুতিকার'-ই মিলিয়ে গেলেন তাদের সেই সব নিতান্ত বাজে, অপাঠ্য পদ্যেরও যথেষ্ট পাঠক আছে। তার কারণ আমরা শিখেছি, এবং আমাদের দেশের সাধারণ পাঠক শিখেছে যে ভালো মিল ভালো কাব্যের একটা প্রধান লক্ষণ, এবং ভালো মিল মানে হচ্ছে বহুস্বরের মিল। এ-ধারণা পাঠকদের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছি আমরাই—আমরা যারা ভালো মিল দিয়ে পদ্য লেখাকে একটা প্রকাণ্ড কৃতিত্ব মনে করি, তা সে পদ্য যতই অন্তঃসারশূন্য হোক না কেন। এখানে অবশ্য আমাদের দেশের 'সমালোচক'দের কথাও এসে পড়ে—সেই সব

দিঙ্‌নাগ সমালোচকেরা যাদের সমালোচনার নমুনা হচ্ছে 'ইনি কবিতা না লিখিয়া ঘাস খাইলে পারেন' অথবা 'ইনি 'কথার' সঙ্গে 'পাতা' মিল দিয়াছেন, ইহাও ছাপার অক্ষরে দেখিতে হইল!' ইত্যাদি।

এ রকম মিল ছাপার অক্ষরে দেখলে কি হয় আমাকে কেউ বলতে পারেন? টেনিসন to *see*-র সঙ্গে they *be* এবং people *go*-র সঙ্গে lilies *blow* এবং thore be*low* মিলিয়েছেন; Bowning enter'd *gay*-র সঙ্গে noon*day* এবং since 'tis *so*-র সঙ্গে fate I *know* মিলিয়ে পাঠক বা সমালোচক কারুর মনোকষ্টের কারণ হয়েছেন বলে' জানা যায় না; সুইনবার্ন amo*rous*-এর সঙ্গে Ity*lus* এবং heart is *set*-এর সঙ্গে I for*get* নির্ভয়ে মিলিয়েছেন। যদি কেউ বলেন যে, ওটা ইংরেজিতেই চলে' এসেছে বাংলায় চলতে পারে না, কারণ বাংলায় এক স্বরের মিল আমাদের কানকে আহত করে, তাহ'লে আমি বলবো যে আসলে আমাদের কান মোটেই আহত হয় না, আহত হয় আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন চোখ। প্রমাণ, নিধুবাবুর টপ্পায় যখন পড়ি

> ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা
> ভ্রমরেতে গুণগুণ করে কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া,

তখন তো আমাদের কানে লাগে না। যখন শুনি

> যে হয় পাষাণের মেয়ে তা'র হৃদে কি দয়া থাকে
> দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে।

কিংবা

> ঘুরে যে ঢাকার সহর, দিল্লী লাহোর টাকা মোহর নিয়ে এলে
> খেলে না পয়সা সিকি কওহে দেখি তার কিছু কি সঙ্গে নিলে।

কই তখন তো আমাদের কানে লাগে না। এক স্বরের মিল যে সত্যিই শ্রুতিকটু নয়, তার আরও একটা প্রমাণ এই যে বাংলায় হসন্ত শব্দে এক স্বরের মিল চলে এবং মোটামুটি ভালো মিল বলেই গণ্য হয়। 'মন'-এর সঙ্গে 'বন', 'রূপ'-এর সঙ্গে 'চুপ' বা 'ধূপ', 'পাপ'-এর সঙ্গের 'তাপ', 'চুল'-এর সঙ্গে 'ভুল' মিল কে না দিয়েছেন? কার কানকেই বা তা আহত করেছে? আরো

দেখুন, 'কথা'র সঙ্গে 'ব্যথা'র মিল নিন্দিত হয় না, কারণ ব্যাকরণ এবং চোখের দিক থেকে এটা ভালো মিল। 'বঁধু'র সঙ্গে 'শুধু' মিল বাংলা পদ্যে প্রচলিত আছে—এবং তাতে কারো কানে কখনো আঘাত লাগেনি। অতএব এক স্বরের মিলমাত্রই যে আমাদের কানে লাগে সেটা বাজে কথা, লাগে চোখে। এবং চোখ দিয়ে আমরা কবিতা পড়ি বলে'ই যে কবিতাকে চোখের শাসন মানতে হবে, এ রকম রসিকানুচিত কথা গ্রাহ্য নয়।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে মিল বিষয়ে যে স্বাধীনতা দেখা যায়, যাঁরা সেটাকে অনুকম্পাবশত সহ্য করেন মাত্র, তাঁরা লক্ষ্য করলে দেখবেন—আধুনিক প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা কাব্যেও এ রকম মিলের অভাব নেই। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায়

হায় কি হোলো! বঙ্গদর্শন বঙ্কিম দিলে ছেড়ে;
হায় কি হোলো! দেশটা গেল সাপ্তাহিকে জুড়ে;
হায় কি হোলো! ভূদেব দিলো ছেড়ে গুরুগিরি;
হায় কি হোলো! হেম নবীনের নেইকো জাড়িজুড়ি।

পড়ে' মিলের দোষটা চোখে পড়ে না, বরং শুধু মিলটাই এখানে ভালো লাগে।

আরো আধুনিক কবিদের কথা ধরা যাক্। দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'যশ'-এ লিখেছেন:

কোথা যশ? কোথা যশ? কোথা যশ বলি;
আতি-পাতি খুঁজিলাম বিপুল বিপণি;
অলিগলি ঘুরে ঘুরে, পথ গেনু ভুলি
ঝিকিমিকি গোধূলি! হোলো না বিকিকিনি!

এ কবিতার মিল কি সত্যিই কানে আঘাত দেয়! আরো ধরুন

আজি দিবা দ্বিপ্রহরে, আম্রের উদ্যানে
হেরিলাম মূর্তিমান্ বৈশাখ মাসেরে!
ঈষৎ ঈষৎ রক্ত মদির নয়ানে
ঢুলুঢুলু নিদ্রাবেশ; স্বেদ নাহি ঝরে,
থাকে লগ্ন মুক্তাপ্রায় ললাট উপরে।

উপরের পাঁচ লাইনে দুটো জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। 'মাসেরে'র সঙ্গে 'ঝরে' ও 'উপরে' মিল কোনো কাব্যরসিককেই বিচলিত করবে না। যেহেতু কবিতাটি মিল বা ছন্দসর্ব্বস্ব নয়। দ্বিতীয় কথা, 'উদ্যানে'র সঙ্গে মিল দেবার জন্যে দেবেন্দ্রনাথকে নয়ন শব্দটিকে কেমন বিকৃত করতে হয়েছে দেখুন! রসিক ব্যক্তিরা বোধ হয় একমত হবেন যে এখানে 'নয়ানে' লেখার ফলে কবিতাটির সৌন্দর্য্যের খানিকটা হানি হয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে কবিতায় স্বরান্ত শব্দে বহুস্বরের মিলটা বাস্তবিকপক্ষে অবশ্য প্রয়োজন নয়। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং আধুনিককালে বিখ্যাত অনেক তথাকথিত কবির পদ্যে যে নির্দ্দোষ মিল ও ছন্দ দেখা যায়, অধিকাংশক্ষেত্রেই তা রসের অভাবকে প্রচ্ছন্ন রেখে সস্তা বাহবা নিতে সাহায্য করে মাত্র—তা'র বেশি প্রশংসা এগুলো দাবী করতে পারে না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই দেখা যায় আগাগোড়া 'ভালো মিল' এবং ভালো কাব্যের সমন্বয়। কিন্তু তার মধ্যেও এ জিনিস লক্ষ্য করবার যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে মিলের নৈপুণ্য দেখাতে চেয়েছেন সেখানে কাব্যের উৎকর্ষ লাভ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'শিলং-এর চিঠি', 'পুরাতন ভৃত্য' অথবা 'কথা ও কাহিনী'র কয়েকটি কবিতা রচনাচাতুর্য্যে প্রশংসার যোগ্য মাত্র; 'গীতাঞ্জলি'-'খেয়া'-'বলাকা'তেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। এবং এ-সব বইয়ে রবীন্দ্রনাথের মিল সব চেয়ে সহজ, সব চেয়ে লক্ষ্য না-করবার মতো।

আমার নিজের বিশ্বাস, অতিরিক্ত ভালো মিল যে কেবল কবিতায় নিষ্প্রয়োজন, তা নয়, ভালো কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা একটা ত্রুটি।

কেঁদে কেটে শেষটায় আষাঢ়ের বাইশে
হোলো বিনা চেষ্টায় যা চেয়েছে তাই সে।

এ রকম মিল দিয়ে উৎকৃষ্ট রস জমানো শক্ত। এমন কি রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও যখন পড়ি—

মায়ের বুকে সকৌতুকে কে আজি এলো তাহা
বুঝিতে পারো তুমি?

শোনোনি কানে হঠাৎ গানে কহিলো আহা, আহা,—
সকল বনভূমি।

কিংবা

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।

তখন কাব্য-পিপাসু মন আহত হয়। ভালো 'মিলের জন্যে যখন রবীন্দ্রনাথকে 'নাগিয়া'র সঙ্গে 'ভাগিয়া' মিল দিতে হয়, তখন রসিকচিত্ত ব্যথিত না হয়ে পারে না।

বর্ত্তমানে বাংলায় গদ্য-কবিতা লেখার যে একটা চাড় এসেছে, আমার মনে হয়, তার মূলে অন্তত খানিকটা পরিমাণে রয়েছে আমাদের অধুনা-প্রচলিত ছন্দ ও মিলের শাসনের প্রতি বিদ্রোহ। গদ্য-কবিতার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। আমার বক্তব্য এই যে কয়েকজন শক্তিশালী কবি ছাড়া গদ্য-কবিতার ভাষা ও ছন্দ আয়ত্ত করা অনেকেরই ক্ষমতার বাইরে। অনেকটা এঁদের রচনাই গদ্য-কবিতার উপর এত বিদ্রূপ ও নিন্দা টেনে আনছে। এ-সব লেখকদের অনেকের বিশ্বাস যে ছন্দ ও মিল দিয়ে কবিতা লেখার চাইতে গদ্য-কবিতা লেখা সহজ। তা যে নয় তার প্রমাণ আমি। আমি পদ্য লিখতে পারি কিন্তু গদ্য-কবিতা লিখতে পারি না। আমার মতো হয়তো আরো অনেকেই আছেন। তবু যে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে গদ্য-কবিতা লেখা সহজতর, সে-কেবল পদ্যের নিদারুণ শাসনের দরুণ। ইংরেজি কবিতা scan করলে দেখা যায় যে প্রায় সর্ব্ব ক্ষেত্রেই কবিতার বিভিন্ন চরণ অথবা একই চরণের বিভিন্ন foot, accent, syllable প্রভৃতির গুণতি কি ওজন একেবারে এক হয় না। অনেক সময় একটি foot-এ একটি বা দু'টি syllable ও বেশি থাকে, কিন্তু উচ্চারণের লঘুতা বা অন্যান্য কারণে সেগুলো ত্রুটি বলে গণ্য হয় না। তাছাড়া ইংরেজি কবিতায় মিলের স্বাধীনতা তো অনেকটা আছেই। বাংলায় এসব স্বাধীনতার এত অভাব যে কবিদের পক্ষে তার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়। যাঁরা সংস্কৃত

আলঙ্কারিকদের মতবাদ উদ্ধৃত করে' বলবেন যে কাব্যে বন্ধন হচ্ছে আসলে ভূষণ—মেয়েদের কঙ্কণ বা হারের মত, তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন যে গয়না পরে' 'রাজহংসগ্রীবা' লাভ করাকে আমি একটা বড় কৃতিত্ব মনে করি না। বাংলা কবিতার এখন বর্ম্মী মেয়েদের মত "goose-neck" অবস্থা হ'তে চলেছে; এই বিংশ শতাব্দীতে সে-সব ভূষণ কিছু ত্যাগ করলে বাংলা কবিতার ঘোরতর অকল্যাণ হবে বলে' মনে হয় না।

আমার প্রস্তাব বাংলা কবিরা স্বরান্ত শব্দে একস্বরের মিলকে 'ভালো মিল' বলে' গ্রহণ করুন। তার দ্বারা প্রথমত কাব্যের ভাষা যথেষ্ট নমনীয় ও মুখের ভাষার কাছাকাছি হয়ে আসবে, সে-কাব্য আমাদের মনে দাগ কাটবে সহজে। যদি এই রকম মিল বাংলায় চালানো যায় তাহলে কতগুলো অপ্রচলিত "শুধু পদ্যে ব্যবহৃত" কথার হাত থেকে আধুনিক বাংলা কাব্য সহজে নিষ্কৃতি পাবে। কবিদের পক্ষে এটা লজ্জার বিষয় যে এখনো বরষা, হিয়া, গরজে (গর্জ্জন করে), গো ইত্যাদি শব্দ পদ্যে ব্যবহার করতে হয়। পদ্য রচনায় খানিকটা স্বাধীনতা এলে এ-সব শব্দ আপনা থেকেই অপ্রচলিত হয়ে আসবে বলে' আমার বিশ্বাস, কারণ কোনো ভালো কবিই ইচ্ছে করে' এমন শব্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করতে চান না যা পাঠকের মনে কোনো দাগ কাটবে না। বাস্তবিক, এই সব অপ্রচলিত শব্দ এখন এত ভোঁতা হয়ে গেছে যে কবিতায় এ-সব শব্দ ব্যবহার করলে যা দাঁড়ায় তার অতি যোগ্য বর্ণনা হচ্ছে—"sound and fury signifying nothing."

মিলের কথাই বল্লাম বটে, কিন্তু বাংলা কবিতায় এখন ছন্দেরও সংস্কার হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বুদ্ধদেব বসু আজ যে সুযোগ দিয়েছেন, এ-রকম সুযোগ ভবিষ্যতে পেলে সে-সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য বলবার চেষ্টা করবো।

বাংলা কবিতা

সমর সেন

কবিতার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কী সেটা স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। অনেকে বলেন কবিতা আসে শুধু অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে। কথাটি বলা সহজ, কিন্তু সঠিক নয়, কারণ অন্তঃপ্রেরণা শুধু অন্তরের জিনিস নয়, তার মূল উৎস বিশাল ও বিক্ষুব্ধ বহির্জগত। এ সূত্রে কবিতার ভাষা ও ভাষার ব্যক্তিগত, স্বতন্ত্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতে পারি। আমরা কোনো বিশেষ সমাজে বিশেষ সময়ে জন্মাই, এবং সামাজিক জীব হিসেবে প্রচলিত কোনো ভাষা ব্যবহার করি। কিন্তু কবিতা লেখার সময় সে ভাষার উপরে যে স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে তার নাম ডিক্‌শন, এবং এই স্বতন্ত্র ব্যবহারের শক্তি কবির পুরুষকারের পরিচায়ক। অথচ এই পুরুষকার কাজ করে বহুশতাব্দীর শ্রমলব্ধ জটিল ব্যাকরণের সাহায্যে, এবং একটি বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায়। কবিতা অনেকটা নাটকীয় স্বগতোক্তির মতো, কিন্তু কাব্যবিচারে আমরা নাটকের কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করি কিংবা অস্বীকার করি। পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরতা অস্বীকার করা অসম্ভব। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করা, মেনে নেওয়া স্বাধীনতার সূত্রপাত।

এখনো অনেকে বিশুদ্ধ কবিতায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন; এঁরা হচ্ছেন পূর্ব্বযুগের ক্রিশ্চানদের মতো যাঁরা কুমারী মেরীর বিশুদ্ধ গর্ভধারণে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন। কবিতার কারণ এঁদের কাছে অনাবিল অন্তঃপ্রেরণা, অন্তঃপ্রেরণা এঁদের কাব্যলোকের নিরাকার ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্। একটি সহজ সত্য এঁরা ভুলে যান যে ভিতরের প্রেরণা যদি কবিতার মূল এবং একমাত্র উৎস হত তাহলে প্রতি বছরে, প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে মহৎ কবিতা রচিত হবার পথে কোনো অন্তরায় থাকত না। কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে, তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ কল্পনা নয়, পরিবর্ত্তনশীল শ্রেণীগতির, স্থানকালপাত্রের মুখাপেক্ষী, এবং মুখাপেক্ষী হলেও মাঝে মাঝে সমাজের মুখ বদলানোর কাজে

সাহায্য করতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্তঃপ্রেরণার মধ্যকার আত্মীয়তা জটিল কিন্তু অনস্বীকার্য্য। আমরা কিন্তু একটিকে মানলে অপরটিকে অবহেলা করি, মনে করি কাব্যের ঈশ্বরকে মানলে সমাজের কুবেরকে মানা অসম্ভব।

এ সব কথা বলার প্রয়োজন বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকে বোধ করি নেই, কিন্তু বাংলাদেশে যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে দেখলে এ কথা সহজে বোঝা যায় যে কাব্যবিচারের পার্থক্য প্রকৃত কাব্যরচনাকে কী ভাবে প্রভাবান্বিত করে। যাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁদের সংখ্যা বাঙালি কবিদের মধ্যে এখনো বেশি, তাঁদের লেখায় ভারসাম্য ক্রমশই কমে আসতে থাকে, এবং তাঁদের প্রতিভা শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটি ম্যানারিজিমের প্রকাশে, পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে কাব্যে মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, এবং মূলসূত্রহীন কাব্য এক-ধরণের মস্তিষ্কবিকৃতির নামান্তর।

কবিতা অবশ্য ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে; এবং ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া বলতে চলতি ভাষায় সাধারণত আমরা হৃদয়াবেগ বুঝি। কিন্তু হৃদয়াবেগেরও প্রকারভেদ আছে। বাংলা কবিতার অধিকাংশ এত নির্জ্জীব তার কারণ আমাদের কাব্যে significant emotion-এর একান্ত অভাব। এর জন্য মূলত দায়ী ভারতীয় ইতিহাসের গতি, এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের শেষের দিকের প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথকে যে যুগ জন্ম দিয়েছিল, সে যুগের প্রাণশক্তি বহুপূর্ব্বে নিঃশেষিত। তাঁর সময়ে যেটা ছিল কাব্যের বিষয়বস্তুর উপযুক্ত, এবং যে ভঙ্গিতে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন, তাদের জীবনশক্তি আজকে নেই। এ সব প্রসঙ্গ অনেকটা অবান্তর। কিন্তু যুগধর্ম্মের, কালান্তরের কথা মুখে বললেও এদের প্রকৃত অর্থ অনেকের কাছে দুর্ব্বোধ্য। সে জন্য মাঝে মাঝে অতি-সাধারণ কথার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগতিক ফলাফলের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আগে মাইকেলের মতো কবি ছিলেন, কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথের মতো উল্লেখযোগ্য

কবি হয়নি। দাসদেশে বুর্জোয়া সভ্যতার অগ্রগতি অল্পদিন পরেই দক্ষিং
হয়, কারণ বর্দ্ধিষ্ণু দাস-দেশ বুর্জোয়া প্রভুর স্বার্থবিরোধী। কয়েকদিনের ক্ষিং
চকিত প্রগতি, তারপর নিরুদ্ধ গতি, এদের দোটানায় আর যাই হোক, কোনে
দেশীয় প্রাণবান ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই দোটানায়
প্রভাব বর্ত্তমান।

তাই আমাদের কাব্য প্রকৃত ঐতিহ্যহীন। এক হিসেবে ভারতের বিপুং
সংস্কৃত সাহিত্য রবীন্দ্রনাথে শেষবারের জন্য স্বধর্ম্মে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল
যে স্বতন্ত্র দেশীয় ঐতিহ্যের গৌরব আমরা করি আসলে তা স্বাবলম্বী নয়
বর্ত্তমানে তার নিজস্ব মেরুদণ্ড নেই। এর অভাবে বিচারবুদ্ধিকে আমর
বরাবর বিসর্জ্জন দিয়েছি, অনুভূতির নামে ভাববিলাসের জয়গানে আমর
মুখর। রোমান্টিক আন্দোলনের একটি অন্যতম বিশেষত্ব, বিচারবুদ্ধির ও অনুভূতি
মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য টানা, এবং প্রথমটির বিসর্জ্জন, আমাদের দেশে উর্ব্বর ভূমি
পেয়েছে। এ ধারার সঙ্গে মিশেছে বৈষ্ণব কবিতার ভাববিলাস। আমাদে
কবিতার রক্তস্বল্পতার এটি একটি কারণ, অবশ্য এর প্রধান কারণ লেখক ও সমাজে
মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবধান। ইচ্ছে থাকলেও এ ব্যবধান কাটিয়ে ওঠা বাঙালী কবিদে
পক্ষে কঠিন। ভাবের ও ভাষার যে ভঙ্গিতে আজকাল তাঁরা অভ্যস্ত সাধার
জীবনের সঙ্গে তার সহজ যোগসূত্র নেই। পৃথিবীর সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা
আমাদের পরিচিত করেছে বটে, কিন্তু বণিক সভ্যতার গতিতে শিক্ষিত এব
অশিক্ষিতের মধ্যে, সত্যিকার শিক্ষিত এবং অর্দ্ধ-শিক্ষিতের মধ্যে দুস্তর
পারাবারের সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের অসংখ্য লোকের অক্ষরজ্ঞান নেই
সুতরাং লেখক ও পাঠক বলতে সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই বোঝায়। এই
রেডিও-পীড়িত, সিনেমা-জর্জ্জরিত, ফুটবল-উৎকণ্ঠিত শ্রেণীর জীবনযাত্রা শেষ পর্য্যন্ত
মহৎ কবিতার পরিপন্থী। ফলে আমাদের দেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবিরা নিঃসঙ্গ
এবং নিঃসঙ্গতায় লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে
কোনো আমূল সমাজবিপ্লব না ঘটে, কুটিল কালচক্রে ভাঙন না ধরে, ততদিন এই
নিঃসঙ্গতা, হতাশা আর অবিশ্বাস, বর্ত্তমান সভ্যতার যেগুলি বিশেষত্ব, তাঁদে

ঘিরে থাকবে, ততদিন তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রাণবান মূলসূত্রের অভাবে পীড়িত হবে। ইতিমধ্যে নেই মামার চেয়ে কানা মামার অন্বেষণ করাই ভালো। রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্ব্বলভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক-স্বর্গ। অন্যদিকে সাংসারিক সচেতনতা আধুনিক বাঙালি কবিদের সাহায্য করতে পারে, কারণ সচেতনতা, এমন কি নিজেদের সামাজিক ব্যর্থতার সচেতনতাও, ক্ষমতা এবং সংযম আনে। কালক্রমে যখন তাঁদের বিষয়-বস্তুতে আঁসন্ন পরিবর্ত্তনের ভাঙন ধরবে তখন অন্তত তাঁদের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরবর্ত্তী যুগের কবি এবং পাঠকেরা কৃতজ্ঞ থাকবেন।

স্বগত

সুধীন্দ্রনাথ দ

বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্ব্বোধ্য ব'লে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্ক আর ইংরেজী-ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে-অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং আত্মনির্ভরে অভাববশতই আমি যেকালে গুরুজনদের ভর্ৎসনাভাজন, তখন ওই অহেতু অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত। সুতরা আরম্ভেই জানিয়ে রাখছি যে স্বগত-শব্দটা স্বাগতের মুদ্রাকরপ্রমাদ নয়, ওঁ কালিদাসী রঙ্গনির্দ্দেশ শ্বেতদ্বীপ ঘুরে বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্থান পেয়েছে প্রা মাইকেলী যুগ থেকে। সে-কালের বিপুলায়তন পাত্র-পাত্রীরা স্বাভাবিক জাড্যে দৌরাত্ম্যে যখন কর্ম্মকাণ্ডে নিজেদের মনোভাব প্রকাশে অপারগ হতো, তখ তাদের অভিপ্রায় দর্শকের কাছে পৌঁছতো ওই বন্ধনীগত শব্দেরই দৌত্যে।

অদৃষ্টগতিকে আমিও সেই পঙ্গু সমাজের সভ্য। প্রকৃতিস্থ মানুষ যে-বয়ে বিষয়কর্ম্মে হাত পাকায় কিম্বা লোকসেবায় নেমে পরকালের পাথেয় জমায়, সে-কুলগ্ন শনির ক্রোধকটাক্ষে এসে আমার মনে কাব্যরোগের দারুণ দুর্লক্ষণ জাগে জ্যোতির্গণনায় দেখা গেছে যে সে-সময়ে বৃহস্পতিও আমাকে সদ্ভাবসূত্রে বেঁধেছিলেন তাই উক্ত ব্যাধি এ-ক্ষেত্রে আর মারাত্মক রূপ ধরেনি, আমার অধ্যবসায় চুকিয়ে রাশ টেনেছিলো। কিন্তু ভাগ্য পরিহাসরসিক; এবং স্বাস্থ্য আর কাজে লাগবে ন বুঝেই সে মানুষের অসুখ সারায়। অতএব আমার বেলাতেও ছন্দরক্ষা শেখা আগেই কাব্যঝর্ণা সমূলে শুকলো; এবং যা বাকী রইলো, তাকেই যদিও উনি শতকের বিখ্যাত খেয়ালীরা 'ঐশী অতৃপ্তি' বলেছেন, তবু তার নামকরণে আত্মগ্লা ছাড়া অন্য কোনো কথাই আমি অন্তত খুঁজে পাইনি।

কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের অহঙ্কার; তার আত্মপ্রসাদ রক্তবীজের বংশধর সেইজন্যেই সে-সর্ব্বনাশের দায় আমি নিজের উপরে চাপাতে পারিনি, ভেবেছি আমার কবিপ্রতিভার অভাব বিরূপ পরিমণ্ডলের অভিশাপ। কিন্তু পরিমণ্ড

আরো দুর্মর; সে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদেও বদলায় না; তার নীল নয়নের নির্ব্বাক অনবধানে যে-বৈদ্যুতিক বিদ্রূপ নিহিত থাকে, তাতে অবচেতনার অন্ধকার কাটে, মমতার অশ্রুবাষ্প মহাশূন্যে উবে যায়, এবং কানে বাজে কেবল আত্মজিজ্ঞাসার আকাশবাণী, যেমন নৈর্ব্যক্তিক, তেমনি অনুপকারী। এ-রচনা সেই প্রশ্নোত্তরের ফলাফল; এবং কোন্ ঐশ্বর্য্যে ফাঁকি না পড়লে আমিও দুরূহ প্রবন্ধ না লিখে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিদের মতো আমার নিবেদন রসাত্মক বাক্যেই জানাতুম, তারই নেতিবাচক পরিচয় এই স্বগতোক্তির মধ্যে দ্রষ্টব্য।

অথচ সেইজন্যেই এখানে একটা আপত্তি ওঠা অনিবার্য্য; এবং স্বকীয় ছিদ্রান্বেষণে নেমে নীতিকারদের সাধুবাদ কুড়নো যদিও সম্ভব, তবু নিরপরাধ পাঠককে রসবিচারের পাকে আত্মজৈবনিক নিম খাওয়ানো অত্যাচার। তাহলেও স্বগত সমালোচনার পক্ষে দু-চার কথা বলার আছে। কারণ আমার ধিক্কারবোধের প্রথম আবিষ্কার হচ্ছে নিজের শোকাবহ সামান্যতা; এবং নৈয়ায়িকদের মতে সামান্য যেহেতু সার্ব্বজনীনেরই প্রতিশব্দ, তাই আমার দেশে ও আমার কালে মদীয় ত্রুটির প্রতিবিম্বপাত সহজ ও সার্থক। অবশ্য তার মানে এ নয় যে আমি সাম্প্রতিক সাহিত্যকে দোষাবহ ভাবি; আধুনিক সাহিত্যামোদীর মধ্যে নিজস্ব মূর্খতার দোসর খোঁজাও আমার নিতান্ত অনভিপ্রেত। কিন্তু বর্ত্তমানের সাহিত্যসাধনা যে নৈরাত্ম্যসিদ্ধির অভাবেই ধ্রুপদী পদবীর অযোগ্য এবং ইদানীন্তন বিদগ্ধসমাজ যে আনুপূর্ব্বিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই সময়োচিত রসগ্রহণে অক্ষম, এমন একটা স্বতোবিরোধী বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল।

কারণ উনিশ শতকের বাঙ্ময় প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্থায়ী কাব্যে আমি স্বপ্রাধান্যের চিহ্ন দেখি না, এবং প্রতিকূল শিশুশিক্ষার পরেও প্রকৃত কবির সংসর্গে আমার আত্মোপলব্ধি জাগে। সুতরাং আমার পক্ষে এমন অনুমান স্বাভাবিক যে সাহিত্যসৃষ্টিতে বিষয়ের প্রভুত্ব খাটলেও সাহিত্যসেবার পুরোধা বিষয়ী। কিন্তু সাহিত্যসেবী যদিও বাধ্য হয়েই তত্ত্বমসির মন্ত্র জপে, তবু অধিকারভেদের নিঃসার অভিমান তাকে সাজে না; সে জানে যে সমালোচক-সম্বন্ধে গত শতাব্দীর দুর্বিনীত কবিদের প্রচণ্ড দুরুক্তিও বাক্‌সংযমের সাক্ষ্য এবং কাব্যবিবেচনায় শুধু সৃজনীশক্তির দৈন্যই ধরা

পড়ে না, খঞ্জের পর্ব্বতলঙ্ঘনও তার চেয়ে কম হাস্যকর। অর্থাৎ আমাদের বস্তুপ্রভব বাহ্যজ্ঞানের বিশ্লেষণে যেমন বাস্তবের নাম-গন্ধও থাকে না, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অভেদ্য প্রাচীর বহিঃপ্রকৃতির পথ আগলায়, তেমনি কাব্যবিবেচনাও কবির খবর রাখে না, তার আদ্যন্তে ফোটে পাঠকের জীবনেতিহাস। সেইজন্যেই আমার অন্তরায়ণে আক্ষেপের অবকাশ নেই। মানুষমাত্রেই যখন সে-অন্ধকূপে বন্দী, তখন সে-রকম সোহংবাদের দোষখণ্ডনও নিষ্প্রয়োজন। তার গুণগানে হয়তো এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে লোকায়তিক মার্ক্‌স্‌-এর মতো জড়বাদী মনোবিজ্ঞানীও অন্তর্দর্শনকে অগত্যা মেনে নিয়েছেন।

তত্রাচ অন্তর্দর্শন আর দর্শন এক নয়, আবার দর্শন ও ফিলজফি বিভিন্ন; এবং স্বভাবিক ব'লে অন্তর্দর্শনের পক্ষে ক্ষমাভিক্ষা যদি বা অনাবশ্যক হয়, তবু সাহিত্যের আড়ালে ব্যাসকূটগুলোর চর্ব্বিতচর্ব্বণ নিশ্চয়ই অমার্জ্জনীয়। কিন্তু কৈবল্যময় অন্তর্দৃষ্টি যোগসমাধিরই অঙ্গ; তার অলক্ষ্যভেদে নির্গুণ ব্রহ্মই নিপাতে যায়, সাহিত্যে অনির্ব্বচনীয়তা আসে না; এবং কাব্য আর প্রলাপের বৈসাদৃশ্য যেকালে স্বতঃপ্রমাণ, তখন আত্মনির্ভর কাব্যবিবেচকও নিঃসম্পর্ক নয়, খুব জোর সক্রেটিস্‌-এর পদাঙ্কচারী। কারণ সক্রেটিস্‌-এর মতে শ্রেয়োবোধ একাধারে অন্তরাশ্রয়ী ও অবিসংবাদিত এবং তার আবিষ্কারে নিজের নির্দ্বন্দ্ব যেমন প্রার্থনীয়, সদালাপীর সম্মতিও তেমনি অপরিহার্য্য। হয়তো সেইজন্যেই অভিজ্ঞা আর অভিজ্ঞান হরিহরাত্মা; এবং সে-অভিজ্ঞানে প্লেটো-র স্বাক্ষর না থাকতে পারে, কিন্তু ক্রোচে-র পরীক্ষা না পেরলে অভিজ্ঞার নাম সুদ্ধ মিথ্যা। আসলে অভিজ্ঞতা অন্তত অভিজ্ঞের কাছে আত্মপ্রকাশে বাধ্য; এবং আত্মপ্রকাশ ভাষার ব্যাপার, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কারের লালন ব্যতীত তার বাক্যস্ফূর্ত্তি অসম্ভব। অতএব অন্তর্দর্শন জন্মাবধি অন্তঃসঙ্গতির মুখাপেক্ষী; এবং সঙ্গত অভিজ্ঞতাই যেহেতু দর্শন-পদবাচ্য, তাই অন্তর্দর্শনকে অনর্থের কবল থেকে বাঁচাতে গেলে তার দার্শনিক পরিণতি অবশ্যসাধ্য।

উপরন্তু নিঃসঙ্গ মানুষ নানাত্বের নৈরাজ্যেই বাস করে; এবং প্রাক্তন বিশ্বাসে না হোক, অন্তত নিরন্তর বাধার ফলে সে ক্রমে ক্রমে শেখে যে বিনা সহযোগে তার স্বার্থসিদ্ধিও দুর্ঘট। তখন আর শুধু অন্তঃসঙ্গতিতে তার চলে না,

অব্যাহত আদান-প্রদানের সুবিধার জন্যে সে আবার যুক্তির সাধারণ্যকে মধ্যস্থ মানে। কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতা অমূলক; বিশেষের জগতে তার দেখা মেলে না; তাকে তথ্য বলা তো দুষ্কর বটেই, এমনকি সে তত্ত্ব-নামের যোগ্য কিনা, তাও বিচার্য্য। কাজেই তাকে বর্ত্তায় একটা অশরীরী কল্পলোক যেখানে বিতাড়িত বাস্তবের শূন্য সিংহাসনে স্থান পায় শৃঙ্খলা আর সম্ভাব্যতা। সেই যৌথ শাসনতন্ত্রই ফিলজফি; এবং তার অবর্ত্তমানে যখন কারয়িত্রী জীবনযাত্রাই অচল, তখন ভাবয়িত্রী সাহিত্যসমালোচনায় তার অনটন অভাবনীয়। বলাই বাহুল্য এ-কথা সাহিত্যসৃষ্টির বেলাতেও খাটে। কারণ সেখানেও ইতিহাস অব্যবহার্য্য, কবি খোঁজে বিশ্বাস্য সম্ভবপরতাকে। কিন্তু এই অঘটনসংঘটন ভাববিলাসের কর্ম্ম নয়; এতে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই; নির্ব্বিরোধ-ন্যায়ের নিত্য আদর্শই মহৎ কাব্যের প্রধান উপজীব্য। হয়তো সেইজন্যেই তার কালাতীত মায়ামুকুরে অনাগতও চিত্রার্পিত; হয়তো সেইজন্যেই টি-এস্‌ এলিয়ট্‌-এর মতে কাব্যের অক্ষয় উৎস ফিলজফি।

তবে উপরোক্ত ফিলজফি শুধু বিশ্ববীক্ষার লোভেই চর্চ্চনীয়; এবং একদেশদর্শিতা দার্শনিকের পক্ষেও একচক্ষু হরিণের মতোই সাংঘাতিক। তৎসত্ত্বেও আমার কাব্যজিজ্ঞাসা আপাতত দেহাত্মবাদী; এবং সে-দেহাত্মবাদে অন্যায় আস্ফালন নেই বটে, কিন্তু তার পক্ষপাত আমার নিজের কাছেও সুপরিস্ফুট। অথচ আমি মতপরিবর্ত্তনে অপারগ। কারণ মন আনুমানিক সামগ্রী; তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ যেমন দুষ্কর, তার অতনু সত্তাও তেমনি কষ্টকল্পনা; এবং মানুষমাত্রেই যদিও কালে-ভদ্রে সঙ্কল্পের আভাস দেয়, তবু সে-সঙ্কল্পের অনন্য প্রকাশ অঙ্গসঞ্চালনে। অর্থাৎ চৈতন্যের স্বভাব বহিরায়তনিক; বস্তুর পৌত্তলিকতাই তাকে জ্ঞানগোচরে আনে; এবং অতি চিন্ময় পুরুষও নিজের অতলে তলিয়ে তার সাক্ষাৎ পান না, আবেগাদির শরীরধর্ম্মেই তার সাক্ষ্য সংগ্রহ করেন। অবশ্য এ-মত বের্গ্‌সন্‌-প্রমুখ দার্শনিকদের অগ্রাহ্য; সার্ব্বভৌম সাধকসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁরা সমস্বরে রটিয়েছেন যে স্বজ্ঞাপ্রসূত আত্মবেদ বাদে অন্য সকল অনুভূতিই মায়ামুগ্ধ ভেদবুদ্ধির উপদ্রব; এবং অনেকান্ত ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে ফয়েডী মনস্তত্ত্বের সিদ্ধান্ত উক্ত অদ্বৈতবাদের

৩

অনুকূল। কিন্তু মনোবিদ্যা এখনো বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উঠতে পারেনি; এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসৌকর্য্যবশত মানসজগতের অনেক সমস্যা আজও অমীমাংসিত ব'লেই জিজ্ঞাসুরা সমস্যার সামনে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য নন।

অন্ততপক্ষে এ-বিশ্বাস নিশ্চয়ই অস্বীকার্য্য যে জৈব প্রবৃত্তির যেহেতু একটা জাতিস্মর দিক* আছে, তাই শিল্পপ্রতিভা লোকোত্তর প্রেরণার মুখপাত্র। উপরন্তু সমালোচনা বন্দনার সপত্নী; এবং প্রতিভাকে নিরুপাধিক বিবেচনায় ছেড়ে দিলে হয়তো ভক্তিমার্গের চূড়ান্তে পৌঁছনো যায়, কিন্তু জ্ঞানমার্গের সূচ্যগ্র ভূমিও দখলে আসে না। আসলে প্রতিভা দুষ্প্রাপ্য হলেও তার বিকাশ সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য; এবং যে-ক্ষেত্রে ভোগ বিদ্যমান, সেখানে ভোক্তা-ভোগীর সম্পর্কও নিঃসংশয়। সুতরাং সরস্বতীপূজায় আমি জাতিবিচার মানি না, দেবীর বরপুত্রদের বিশ্বমানবের প্রতিনিধি হিসাবেই দেখি; এবং মনুষ্যসংসারের অধিকাংশ ব্যাপার যখন দেহাচারের কল্যাণেই চলে, তখন কেবল কলাকৌশলের মধ্যে পরমাত্মার লাস্যলীলা খুঁজতে আমি প্রস্তুত নই। এই অনিচ্ছা অন্ধ কুসংস্কারের ফল কিনা জানি না; এ-প্রসঙ্গে অন্য সিদ্ধান্তও বোধহয় সম্ভব। কিন্তু দেহাত্মবাদে যতই ভুল-চুক থাক না কেন, অক্যামী ক্ষৌরকার্য্যে অনুমিতির বাহুল্যবর্জ্জনই চিত্তশুদ্ধির সনাতন উপায়।

পক্ষান্তরে দেহাত্মবাদ শুধু তত্ত্বসংক্ষেপের প্রয়োজনেই গ্রাহ্য নয়, মানুষের সমাজজীবন যে-সর্ব্বসম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাও দেহেরই দান। আমার শরীরে পরিবর্ত্তন ঘটায় ব'লেই আমি যেমন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব মানি, তেমনি প্রতিবেশীদের মধ্যে অনুরূপ দেহাচার না'চেনা পর্য্যন্ত সে-অবগতির সংশয় ঘোচে না। সে-ঐকতানও নিশ্চয়ই ঐকান্তিক; তবে তার সঙ্গে অন্তর্দর্শনের প্রভেদ সুস্পষ্ট। কারণ অপরের গতিবিধি আমারই ইন্দ্রিয়গম্য বটে, কিন্তু আত্মজ্ঞান খুব সম্ভব নিরিন্দ্রিয়, তার একমাত্র বার্ত্তাবহ হয়তো বা ভাবচ্ছবি। সুতরাং আত্মজ্ঞান স্বভাবতই বস্তুজ্ঞানের প্রতিযোগে পিছিয়ে পড়ে; এবং বহির্জ্জগতের উত্তেজনা যেহেতু একাধিক ইন্দ্রিয়কে একসঙ্গে উদ্‌বুদ্ধ করে, তাই তার ডাকে আমরা যত শীঘ্র সাড়া দিই, অন্তর্যামীর আদেশে সে-পরিমাণ ক্ষিপ্রতা আসে না। বোধহয় স্বপ্ন আর সত্যের তারতম্য এই

সংখ্যাগত পার্থক্যের ফল; এবং পাঞ্চজন্য মতৈক্যের চেয়ে একজনের নিরুক্তিতেও ভুলের ভয় অপেক্ষাকৃত বেশি ব'লেই সোহংবাদীরা শুদ্ধ কার্য্যত ভূয়োদর্শনকে আত্মদর্শনের অসবর্ণ ভাবেন।

আমার মতে সাহিত্যের বস্তুবত্তাও এই মৌলিক আত্ম-পর-বোধের ফল; এবং স্বয়ং হোমর যদিচ আমার উপলব্ধ গোটাকয়েক কালো রেখা ছাড়া অন্য কোনো প্রাণসামগ্রীর ধার ধারেন না, তবু আমার দৃষ্ট ভার্জ্জিল্-শব্দের অভ্যাঘাতে পারিপার্শ্বিক আচরণের অন্যথা দেখেই আমি ওই কবিদ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য বুঝি। যাঁরা স্মৃতিকে ভয় পান না, অন্তত গেষ্টাল্ট্ নামক স্নায়বিক রূপকল্পে যাঁদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁরা হয়তো বহির্জ্জগতে না ঢুকেও স্বকীয়া-পরকীয়া-সংবাদ শোনেন। কিন্তু তাহলে ব্যক্তিকে আর অবিভাজ্য ও কালাতীত ভাবা চলে না, কালপ্রবাহের বুদ্‌বুদপরম্পরায় তার উপমা খুঁজতে হয়। কারণ জ্ঞান সর্ব্বদাই একটা তুলনামূলক ব্যাপার এবং বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যেখানে বহুর সমর্থনে তার যাথার্থ্য প্রমাণে অপারগ, সেখানে জ্ঞাতার ভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের সমীকরণেই সে চরিতার্থ। আসলে বহির্জ্জগৎ হয়তো জ্ঞাতারই বিবিধ অংশ এবং জ্ঞান সেই অংশসমূহের সামঞ্জস্যসাধক; কিন্তু সংখ্যাভূয়িষ্ঠতাই যেকালে জ্ঞানের মুখ্য সম্বল, তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ মন তার উপকারে লাগে না, বহুলাঙ্গ দেহেই সে সন্তুষ্ট।

অবশ্য মনের বালাই চুকলেও প্রাণের আপদ ঘোচে না; এবং সাঙ্গ জীবের বিশ্লেষণে যদিও জড়বিজ্ঞানই প্রশস্ত, তবু তার স্নায়ুমণ্ডলীর সমগ্রতা পদার্থবিদ্যার অতীত। কিন্তু পদার্থবিদ্যার পরাজয় অবিদ্যার দিগ্বিজয় নয়; এবং অখণ্ড আর খণ্ডসমষ্টি সাধারণত তুল্যমূল্য না হলেও অবৈকল্যের সঙ্গে ভূমার সৌসাদৃশ্য নগণ্য। কারণ বিদ্যমান বস্তুমাত্রেই যখন অল্প-বিস্তর সম্পূর্ণ, তখন কেবল স্বাধিকারগুণে মানুষ অসামান্য নয়। আসলে স্বাতন্ত্র্যের জন্যে হয়তো প্রাণেরও প্রয়োজন নেই; এবং ষ্টীম্ এঞ্জিন্ থেকে গরুর গাড়ি পর্য্যন্ত সকল রকম যানেরই চাকা আছে বটে, কিন্তু আকারে-প্রকারে, আচারে-ব্যবহারে উভয় যন্ত্র ভিন্নধর্ম্মী। ফলত ব্যক্তিস্বরূপেও রহস্যঘনতার স্থান নেই; পৃথক পৃথক মানুষের বৃত্তি পৃথক ব'লেই তারা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; এবং বৃত্তি

যেহেতু বৃত্তেরই গুণ, তাই নাস্তিজাত মানুষ যতক্ষণ নাস্তিতে না ফেরে, ততক্ষণ তার চক্রচরণের পরিচয় স্বতই অসমাপ্ত।

অর্থাৎ ব্যক্তির স্বরূপ তার আয়ুর সঙ্গে জড়িত; এবং ভবিষ্যদ্ব্যাহত মানুষের কাছে ও-দুটোই অনিশ্চয় ঠেকলেও সে-অনিশ্চয়বিধিতে স্বৈরাচারের সুযোগ নেই। কারণ হেগেল্-এর বিচারেও বিশুদ্ধ সত্তা শুধুই বিকল্পনা, সচরাচর অস্তিত্ব বলতে একটা প্রক্রিয়াকেই বোঝায়; এবং সে-প্রক্রিয়ার যদি আর কোনো লক্ষণও না দেখি, তবু আত্মরক্ষার চেষ্টা তার স্বভাবগত। অতএব অবাধ স্বাধীনতা কেবল নাস্তির মধ্যেই সম্ভব; যেখানে নিষ্ক্রিয়তা অনাদ্যন্ত, সেই সর্ব্বতোভদ্র নির্ব্বাচনক্ষেত্রেই সকল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রাখা যায়। অন্যত্র নিয়মই সর্ব্বেসর্ব্বা; এবং সে-নিয়ম হয়তো খেয়ালমতো স্বাধীনতার ছদ্মবেশ পরে, কিন্তু চুল-পরিমাণ ত্রুটিবিচ্যুতিও তার প্রশ্রয় পায় না। সেইজন্যেই সতর্ক জীবনযাত্রার ফলে শুধু দীর্ঘায়ু মেলে, অমরতা আয়ত্তে আসে না; সেই-জন্যেই স্থলচর মোটর সংস্কারান্তে নৌকা চালাতে পারে, ঘোড়দৌড় জেতে না। অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা ব্যক্তিস্বরূপেরও নেই, দেশ ও কালকে উৎরিয়ে তার দৈবী প্রভাব লোকে লোকান্তরে অনুস্যূত থাকে না; তাকেও মানুষী উপায়েই ফুটিয়ে তুলতে হয়; এবং উপায় যেকালে উদ্দেশ্যেরই দাস, তখন যে নিজের অভীষ্ট-সম্বন্ধে যতখানি সচেতন, তার ব্যক্তিস্বরূপ সেই অনুপাতে ব্যক্ত।

এই দিক থেকে দেখলে ব্যক্তিস্বরূপ আর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশ খাবে না, বোঝা যাবে মরমীরা কেন একাগ্র ধ্যানের মধ্যে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু আত্মসমর্পণই ব্যক্তিস্বরূপের সহায়ক, আত্মম্ভরিতা নয়; এবং ইষ্টলাভ যেহেতু আত্মম্ভরিতার অনুকূল, তাই ব্যক্তিস্বরূপের পক্ষে সাধনা সিদ্ধির অগ্রগণ্য। হয়তো সেইজন্যেই সকল জাতির আধ্যাত্মিক আদর্শ ত্যাগ বরণ করেছে; হয়তো সেইজন্যেই বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণে সংসারযাত্রার পরাকাষ্ঠা দেখেছেন, মিলনবিমুখ মহাপ্রেমিকেরা খুঁজেছেন চিরবিরহ। কেননা প্রয়োগপ্রবণ মনো-বিজ্ঞানের মতেও আলস্য মানুষের মজ্জাগত, সামঞ্জস্যের অভাবই তাকে সতর্ক

রাখে; এবং উন্নিদ্র চৈতন্যই যখন ব্যক্তিস্বরূপের অদ্বিতীয় সম্বল, তখন গন্তব্যাগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তার আভাস নেই, তার বার্ত্তা নিরুদ্দেশযাত্রায়।

উদাহরণত ক্রাইষ্ট্ উল্লেখযোগ্য; এবং চরিত্রগুণে তাঁর সমকক্ষ লোক আগে ও পরে এত জন্মেছে যে, তাঁর নামে সে-রকম কোনো স্বকীয়তা মনে আসে না, জীবনের বিরাট বৈফল্যের জন্যেই তিনি আমাদের স্মরণীয়। বিমানের উদ্ভাবককেও শুধু বিশেষজ্ঞেরাই চেনেন, কিন্তু ডীডেলাস্ আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়পাত্র; এবং লেওনার্দো যদিও চিত্রকরদের শিরোমণি, তবু জীবনীলেখকের কাছে তাঁর অকারী বৈজ্ঞানিক স্বপ্নগুলো শিল্পপ্রতিভার চেয়েও মূল্যবান। অবশ্য এইজন্যেই ব্যক্তিত্ব অবজ্ঞেয় নয়; এবং তদ্ব্যতীত দিনগত পাপক্ষয় তো দুর্ঘট বটেই, এমনকি মুহূর্ত্তের অযত্নে তা ব্যক্তিস্বরূপের মতো শূন্যে মিলায় না। কিন্তু এই অবিনশ্বরতাই আত্মচেতনার শত্রু; এবং লাভের কড়ি মুঠোয় না পেলে মানুষ যেমন তার হাতের অস্তিত্ব ভোলে না, তেমনি অসীমের আমন্ত্রণই সীমাকে জাগায়, ভূত-ভবিষ্যতের সমুদ্রমন্থনে ভেসে ওঠে বর্ত্তমান।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ইলেক্ট্রনের চেয়েও চঞ্চল; পরিবর্ত্তনই তার তন্মাত্র; সে কোথায় ছিলো, তা বোঝার আগেই এখন কোন্ দিকে চলেছে, এই তথ্য-সন্ধানের প্রয়োজন পড়ে। কাজেই সে-মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবনে মানুষ বেশি দূর এগোতে পারে না; সে অগত্যা নিজের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির বিশ্লেষণে নামে এবং গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আপন অক্ষমতার হিসাব নিয়ে জানে কোন্ নঙর্থক নিয়ম তার দুরাশার বাদ সাধছে। ফলত ব্যক্তিস্বরূপ সদাসর্ব্বদা দ্বিমুখী; ব্যক্তির সামর্থ্যের অনুপাতে অভীপ্সার আতিশয্যই তার ঐকান্তিক উপলব্ধি; এবং ব্যক্তিস্বরূপ বাদ দিলে যখন সাহিত্য আর সংবাদপত্রের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না, তখন মন, প্রাণ বা আত্মিক সম্পদের জন্যে গৌরববোধ কবির কর্ত্তব্য নয়, তার আরাধ্য মাত্রাজ্ঞান আর তন্ময়তা।

অতএব কাব্যরচনা ও কাব্যবিবেচনা একই অখণ্ডতার এ-পিঠ আর ও-পিঠ; এবং কিশোরের অব্যক্ত কবিতা প্রৌঢ়ের বাচাল বৈদগ্ধ্যে বদলাক বা না বদলাক, পরিণত কাব্য যে আশৈশব বিতর্ক-বিচারের মুখাপেক্ষী, তাতে আমার তিলার্দ্ধ

সন্দেহ নেই। কারণ কবিও সমালোচকের মতো সনির্ব্বন্ধ মানুষ ; এবং অভ্যাস-দোষে বা স্বভাবগুণে রসজ্ঞ যেমন তাঁর বালসুলভ আবেগের অনির্ব্বচনীয়তা জেনেও প্রাপ্তবয়স্ক রুচি-অরুচিকে সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবেন, কবি তেমনি তাঁর প্রাথমিক প্রতর্কের অপদার্থতা বুঝেও পরবর্ত্তী জীবনের সুসম্বদ্ধ উপলব্ধিকে সংশয়ের চক্ষে দেখেন। কিন্তু তাঁদের অয়ন যদিও অভিন্ন, তবু উদ্দেশ একেবারে বিপরীত ; এবং প্রমিতির অভাববশত স্বাবলম্বী স্রষ্টা যেখানে বহিরাশ্রয় খুঁজতে বাধ্য, সেখানে পরজীবী সমালোচক অগত্যা স্বয়ম্ভর। অর্থাৎ কাব্যে তথা বৈদগ্ধ্যে, উভয়ত্রই কীট্স্-প্রশংসিত নিরাসক্তি বা 'নেগেটিভ্ কেপেবিলিটি' ক্রিয়াশীল ; এবং এই ঐক্য সত্ত্বেও, উক্ত শক্তি যেকালে নিষেধাত্মক, তখন হৃদয়বান কবি স্বকীয় ভাববিলাস হারিয়ে স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠায় পৌঁছয় আর বুদ্ধিমান সমালোচক নিজের বিদ্যাভিমান ভুলে সংক্রামক চিত্তপ্রসাদে তলায়।

আসলে এই সাঙ্কেতিক আত্মহত্যা ব্যক্তিস্বরূপেরই অভিব্যক্তি ; এবং সেই আপাতবিরোধী অন্তঃসঙ্গতিতে বাদ না পড়লে আমিও নিশ্চয় এই দুর্ব্বোধ্য প্রবন্ধের সাহায্যেই রসসামগ্রীর পরিচয় দিতে পারতুম। তবে রসপ্রতিপত্তি আজও বৈজ্ঞানিক সাধারণ্যের আয়ত্তে আসেনি ব'লে সে-রহস্যের উদ্‌ঘাটনে শুধু অনু-কম্পায়ীরই চমক ভাঙে ; এবং সেইজন্যে এ-লেখার অক্ষরে অক্ষরে ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রা থাকলেও এর নির্ব্যূঢ়তা সকলেই কিছু মেনে নিতেন না, প্রামাণিকেরাই সব চেয়ে বেশি মাথা নাড়তেন। সুতরাং রচনারীতির বৈষম্য ও অঙ্গীকার অবচ্ছেদ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রেও আমার অসম্পূর্ণ বক্তব্য কেবল এই বিশ্বাসে কাব্যজিজ্ঞাসুর সামনে আনলুম যে, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী না হোক, অন্তত সমানধর্ম্মী এই স্বগতোক্তির ভিতরে আপন মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি হয়তো বা শুনতে পাবেন।

কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য

আবু সয়ীদ আইয়ুব

হেগেল্‌কে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে দিলে কোথাও কোনো গলদ আর থাকবে না, নীহারিকার সৃষ্টি থেকে আরম্ভ ক'রে ধনিক সভ্যতার বিনাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মূলতত্ত্বটি জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে——এমনতর ভোজবাজিতে বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি যাঁদের নেই তাঁরাও অস্বীকার করবেন না যে মানবজীবনের বিবিধ ধারা, আর্থিক এবং পারমার্থিক, পরস্পরকে অনেকখানি নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত করে। তাই এ-কথা বিচিত্র নয় যে আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অসমগতি এবং ধন-উৎপাদন ও বণ্টনের অব্যবস্থা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে-ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছে তার অনুকম্পন কবিতার মতো অন্তঃপুরবাসিনীর দেহেও এসে লাগল। নানা প্রশ্ন ও সমস্যার মধ্যে আধুনিক কবিরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছেন, এবং যেটা সবচেয়ে দুর্ভাবনার কথা, জনসাধারণের সঙ্গে, এমন কি শিক্ষিতসাধারণের সঙ্গেও, তাঁদের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে।

নালিশ উঠেছে প্রধানত দুটি কথা নিয়ে। অধিকাংশ পাঠকের মুখে শোনা যায় যে কবিরা দিনকের দিন এমনই অভিনব ভাষা আর উদ্‌ভট ভঙ্গির পক্ষপাতী হয়ে উঠছেন যে সমসাময়িক কোনো কবিতা বুঝবার দুঃসাধনায় সপ্তাহখানেক মগজ খাটিয়ে দুটো চারটে শব্দকোষ মহাকোষ ঘেঁটে বুদ্ধি যদি বা বাড়ে, বিদ্যা যদি বা প্রশস্ত হয়, রসের আস্বাদটুকু কিন্তু মেলে না। দ্বিতীয় অনুযোগের বিষয় হচ্ছে এস্কেপিজ্‌ম্। ঐ বস্তুটা অবশ্য এ-যুগের কবিদের উদ্‌ভাবন নয়। ব্যাধি বেদনা আর ব্যর্থতায় ভরা এই পৃথিবী থেকে পলাতক 'অদৃশ্যপক্ষ'-সঞ্চরণশীল কীট্স্-এর কবিতাও এস্কেপিষ্ট্। জিনিসটা পুরাতন হলেও তার সম্বন্ধে নালিশটা সদ্য নূতন, মার্ক্সীয় সাহিত্যবিশারদদের অবদান। মোটের উপর অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে একদিকে কবিতার পাঠক-সংখ্যা (নিতান্ত বাজারী ঠুন্‌কো প্রেমের কবিতা বাদ দিয়ে) দ্রুত গতিতে শূন্যের দিকে এগুচ্ছে, এবং অন্য দিকে আমাদের কবিরা বর্ত্তমান সমাজ ত্যাগ ক'রে কেউ বা এ্যাংলোক্যাথলিসিজ্‌ম্-এর মধ্যযুগে অন্তর্দ্ধান করেছেন,

কেউ বা পৌরাণিক যুগের ভাঙা দেউলে ব'সে নিজের হাতে গড়া প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় আত্ম-নিবেদন করেছেন।

কবি ও কবিতার নেপথ্য-বিলাস কিন্তু বেশি দিনের নয়। হোমরের যুগে শেক্স্‌পীয়রের যুগে এদের বানপ্রস্থ ধারণ করতে হয় নি, এবং প্রাগৈতিহাসিক কালে তো কাব্য নৃত্য প্রভৃতি ললিত কলাই ছিল জাতীয় (tribal) সংযোগের প্রধান উপকরণ। বহু লোকের সম্মিলিত কণ্ঠের আবৃত্তি বা গীতি (তখন কবিতা আর গানের অঙ্গবিচ্ছেদ ঘটে নি) প্রাক্‌সভ্য মানুষের জীবনে একটি অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ছিল। কড্‌ওয়েলের বিশ্বাস যে ছন্দোবদ্ধ ভাষার তখন বিশেষ function ছিল এমন সব ক্ষেত্রে উপজ্ঞাগত উদ্যম জাগিয়ে তোলা যেখানে কোনো প্রত্যক্ষ উদ্দীপক চোখের সামনে উপস্থিত নেই। বাঘ দেখলে এ্যাড্রিনলীন্‌-নিঃসরণের দ্বারা ছুটে পালাবার অনুকূল বেগ ও বলসঞ্চয়ের বিধান শরীরের মধ্যেই নিহিত, কিন্তু ছ'মাস পরে যে-ফসল ফলবে তার আয়োজনের উপযুক্ত সঙ্কল্প ও উত্তেজনা সরবরাহের দায়িত্ব ছিল কাব্যের। সমষ্টির সান্নিধ্যজনিত এই আবেগ কবিতা বা গানের সঙ্গে ক্রমশ এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়ল যে নির্জ্জনেও যদি কেউ তার পুনরাবৃত্তি করত তা হলে সে বুল্‌বুলের কূজন-মুখরিত কোনো পত্র-নিবিড় নিকুঞ্জে গিয়ে পৌঁছোত না, সে পেত নিজেকে তার সমগ্র জাতির মর্ম্মস্থলে। আর্টের নিভৃত চর্চ্চার মধ্যেও অটুট রইল জনগণের সঙ্গে সমবেদনাবোধ।

তারপরে প্রাথমিক সাম্যতন্ত্রী সমাজকে সরিয়ে দিয়ে এল শ্রেণী-বিভক্ত ধনতন্ত্রী সমাজ, আর্টের জাতীয় রূপ ঘুচ্‌ল, দেখা দিল তার শ্রেণীরূপ। সেই রূপ ছিল এলিজবিথীয় যুগের। কৃষক শ্রমিকের সঙ্গে কাব্যের যোগ অবশ্য রইল না, কিন্তু শিক্ষিত বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়ে তার গতি ছিল অবাধ। শেক্স্‌পীয়রের নাটকে রস পেত না এমন ভদ্রব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কবির সে-প্রতিপত্তিও আজ আর নেই। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হয়েছে, মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির ফলে বইয়ের প্রচার হাজার গুণে বেড়েছে, অথচ কবিতার পাঠক খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজ ছেড়ে, শ্রেণী ছেড়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বৈরাচারে আধুনিক কবিতার আত্মহত্যা আজ আসন্ন। এর দুটি প্রধান কারণ :

১। ফলিত বিজ্ঞানের কল্যাণে সাধারণের চিত্তাধিকার-ক্ষেত্রে কবিতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এসে দাঁড়িয়েছে সিনেমা, রেডিয়ো, খবরের কাগজ আর ছ'পেনি উপন্যাস। এদের স্থূল উত্তেজনা আর লঘু চিত্তবিনোদনের সঙ্গে কাব্যের সূক্ষ্ম রসপরিবেশন পেরে উঠবে কেন। এ প্রতিযোগিতাটি তেমনি অসম এবং অসঙ্গত যেমন কারখানার সঙ্গে কারিগরের প্রতিযোগিতা। কবিকেও হঠতে হল, কারিগরকেও হার মানতে হল, এবং উভয় ক্ষেত্রে পরাভবের অভিমান একই প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছে—কড্‌ওয়েল যার নাম দিয়েছেন skill-fetishism। তাঁরা আপন আপন কৌশল ও দক্ষতা নিয়ে অযথা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তার অসঙ্গত মূল্য দাবী করলেন, এবং সকলের কাছে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন যে অন্তত এক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দিগ্ধ। ইংরেজী সাহিত্যে এর ফল ততটা পরিস্ফুট হয় নি যদিও ইডিথ্‌ সিট্‌ওয়েল্‌, কমিংস্‌ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে, কিন্তু ফ্রান্‌স্‌-এ সিম্বলিষ্ট্‌ প্রচেষ্টার উৎস এইখানে। তাঁরা শব্দার্থকে অগ্রাহ্য ক'রে শব্দের ধ্বনি ও রূপের অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্যে গদ্য রচনা করলেন, মালার্মে উপদেশ দিলেন "Poetry is written with words, not ideas", কবিতা হল শ্রোতব্য ও দ্রষ্টব্য, বোধ্য আর রইল না।

২। দুর্ব্বোধ্যতার দ্বিতীয় কারণের সঙ্গেও বর্ত্তমান সমাজবিপ্লবের সম্বন্ধ রয়েছে কিন্তু তা অংশত, আসলে সেটা কাব্যধর্ম্মপ্রসূত। পণ্ডিতেরা শব্দের দুই প্রকার অর্থ নির্ণয় ক'রে থাকেন, প্রথমটাকে অভিধা এবং দ্বিতীয়টাকে অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে। অভিধা সম্পূর্ণ বিষয়গত, শব্দ সেখানে সঙ্কেত মাত্র, শ্রোতার মনকে কোনো বাহ্যবস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়াই তার একমাত্র কাজ। বৈজ্ঞানিক ভাষার এই আদর্শ, এবং এর পরিপূর্ণ সিদ্ধি বোধ হয় শুধু গণিতেই সম্ভব হয়েছে। অভিব্যক্তি একান্ত বিষয়ীগত, শব্দের বাহ্যসঙ্কেত সেখানে লুপ্ত না হলেও গৌণ, তার ব্যবহার বাহন রূপে, বক্তার মনোভাব বা হৃদয়াবেগকে শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করবার উদ্দেশ্যে। কবিতায় নিত্যব্যবহার্য্য কোনো একটি শব্দ নিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে তার বিষয়-নির্দ্দেশক আভিধানিক অর্থ ব্যতীত তার সঙ্গে বহুতর চিত্রকল্পের ও তৎসংশ্লিষ্ট আবেগের আনুষঙ্গিক যোগ বিদ্যমান। কবির শব্দচয়ন ও

বিন্যাসের অভিপ্রায় এই আনুষঙ্গিক চিত্রকল্পসমাবেশে উদ্দিষ্ট ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলা। ধ্বনির তারতম্য এবং ছন্দের বন্ধন পাঠকের মনকে তন্দ্রাবিষ্ট ক'রে তার স্বাভাবিক বিষয়ানুগত্যকে প্রতিরোধ ক'রে আবেগসঞ্চারের সহায়তা করে। অবশ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন কবির সাধ্যও নয়, কাম্যও নয়। কারণ ভাবানুষঙ্গ নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। পর্ব্বত শব্দটা আমার কাছে বহ্নি ও ধূম্রের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রতীক, আপনার চোখের সামনে হয়তো পুরীর সমুদ্রতীরের ছবি নিয়ে আসে, এবং আরেক জনকে স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানান-পদ্ধতির নিয়মাবলী। অবশ্য কল্পনার এই যদৃচ্ছগতি খানিকটা অবদমিত হয় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী শব্দের চাপে, তবু কবিতা যদি উৎকেন্দ্রিক হয়ে বিভিন্ন পাঠকের খামখেয়ালী মর্জ্জীর স্পর্শরেখা ধ'রে বিবিধ দিকে ছুটতে না চায়, যদি সকল পাঠকের মনে মোটের উপর একই রকম ভাবাবেগের উদ্বোধন তার লক্ষ্য থাকে, তা হলে তাকে আশ্রয় নিতে হবে একটি বাহ্য ও সার্ব্বজনীন বিষয় বা বৈষয়িক পরিস্থিতির। বিষয় যেন বিষয়ীকে ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখা দরকার। কবিতার চরম সিদ্ধি নির্ভর করে তার অভিধাগত ও অভিব্যক্তিগত অর্থের নিখুঁৎ ভারসাম্যের উপর। আগেকার দিনে সে-ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটত অভিধার চাপে অভিব্যক্তির লোপ পাওয়াতে। আজকাল কিন্তু রুচির বদল হয়েছে, ঝোঁক পড়েছে অভিব্যক্তির উপর। বাঙলা সাহিত্যে এর উদাহরণ বিষ্ণু দে। যেখানে তাঁর অবহিত কলাকৌশল ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছে, সেখানে তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করেছেন, যথা ওফেলিয়া বা ক্রেসিডায়। (এগুলির পরিস্থিতি জীবন থেকে নেওয়া হয় নি, পরিচিত নাটক থেকে আহরণ করা হয়েছে, তবু সেটা বিষয়গত কারণ তা সাধারণের অধিগম্য, বহুলোকের পূর্ব্ব কাব্যপাঠের দ্বারা তার বিষয়ীত্ব ঘুচে গেছে।) আর যেখানে তিনি সে-ভারসাম্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে একান্ত নিজস্ব সাধারণের অনধিগম্য অনুষঙ্গ ও স্মৃতির মধ্যে আত্মস্থ হয়েছেন (অপস্মার, এবং সম্ভবত ঘোড়সওয়ার কবিতায়) সেখানে পাঠকের মন, অন্তত আমার মন, সম্পূর্ণরূপে সাড়া দিতে অক্ষম। কাব্যের এই নবরীতির সমর্থনে এলিয়ট্ লিখছেন,

"The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him: much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat for the house-dog. This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets do not work that way; some of them, assuming that there are other minds like their own, became impatient of this 'meaning', and perceive possibilities of intensity through its elimination."

মুস্কিল এই যে কবির মনের অনুরূপ কোনো পাঠকেরই মন হয় না, এবং হয় না বলেই কবিতার একটি 'meaning' অর্থাৎ বহিঃপরিস্থিতির আশ্রয় দরকার। তবে সমসাময়িক কবিদের পক্ষে এমন কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় তো সম্ভব যে আজকের দিনে সমাজের স্তরে স্তরে ভাঙন ধরেছে, তার দিগন্তব্যাপী বিকৃতি ও বিনাশের মধ্যে তাঁদের রূপায়নিক কল্পনা কোনো আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, ফিরে আসছে ব্যাহত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে। তাঁদের আত্মপরিক্রমা মানুষের প্রতি ঔদাসীন্যের ফল নয়, নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া। আমাদের দেশের কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই মনোভাবের প্রতিভূ। তিনি যে-"অবিকল সিদ্ধ স্বয়ম্বশ চিরসত্তা"কে আপন অন্তর্নিবিড় চৈতন্যে সন্ধান করেছেন, তার পটভূমিকায় রয়েছে তাঁর বিশ্বাস যে

"মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট,
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দ্দমে মিলে না পাদপীঠ।"

একে defeatist ভাববিলাসিতা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া বৃথা, কারণ এখানে জয় পরাজয়ের আদর্শ নিয়ে মতভেদ।

সাম্যবাদী বলতে চান যে, আমাদের শিল্পীরা যে শ্রোতা বা পাঠকের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাঁদের শিল্পরচনাকে স্বগতোক্তিতে পরিণত করেছেন, এটা বণিক সভ্যতার নিদেন কালের লক্ষণ। এই সভ্যতার দেহে যতদিন প্রাণ ছিল ততদিন তার সঙ্গে কাল্চারের সম্বন্ধ ছিল নিবিড়, তার আর্ট্ ছিল সামাজিক ও

প্রগতিশীল। আজ ইতিহাসের রথচক্র তার উপর দিয়ে চলছে, তার বৈদগ্ধ্যের বহুমূল্য উপকরণগুলি ভেঙে চুরে মিস্‌মার হয়ে গেল ব'লে। আজ আমাদের চোখের সামনে দুলছে এক নবীন নিঃশ্রেণীক সমাজের দৃশ্যপট, আমাদের মনন ও মনীষার কেন্দ্র সেইখানে, আমাদের ভাব ও আবেগের উৎস তারই তলে। কাজেই শুনতে পাই, "No book written at the present time can be 'good', unless it is written from a Marxist or near-Marxist point of view" (Upward—The Mind in Chains)। আর্টের উপর দলপতিদের দণ্ডচালনা এইখানে থেমে যায় নি, হুকুম হল যে তাকে আপন সাবেকী নির্লিপ্ততা আর আত্মম্ভরিতা ভুলে গিয়ে সোজাসুজি লাগতে হবে দলের কাজে : "Art, an instrument in the class struggle, must be developed by the proletariat as one of its weapons." (Freeman, Proletarian Literature in U. S. A.)। কিন্তু আর্টকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করব কিসের জন্যে? কোনো সমাজ-ব্যবস্থা, তা সে শ্রেণী-বিভক্তই হোক আর শ্রেণী-বিবর্জ্জিতই হোক, চরম মূল্যের দাবী করতে পারে না। যে-অনাগত সমাজের উদ্যোগপর্ব্বের আয়োজনে শিল্পীদের আহ্বান করা হচ্ছে তার মূল্য কিসে, তার সার্থকতা কোথায়? নিশ্চয়ই সেটা কেবল এই নয় যে তাতে সক্ষমেরা নির্ব্যতিরেকে খাটবে আর খাবে আর ঘুমুবে, বৃদ্ধেরা বিশ্রামাগারে ব'সে ঢুলবে, আর শিশুরা ঘর বা হাঁসপাতাল ভরবে। যদি তার কোনো সার্থকতা থাকে তবে তা এই যে আজ যে-চরম মূল্যের সন্ধান আমাদের মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠীরা পেয়েছেন, তার যোগ্যতা এবং সুযোগের ক্ষেত্র সেখানে সকলের জন্য অবারিত হবে। চিৎপ্রকর্ষ আর চারুশিল্পের সম্প্রসারণই যদি সমাজবিপ্লবের লক্ষ্য হয়, তা হলে আর্টকে সে-বিপ্লবী কার্য্যক্রমের অন্যতম অস্ত্র বলতে গেলে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে একটি মারাত্মক গরমিল থেকে যায়। একথা বলাই বাহুল্য যে, যার দু'বেলা অন্নের সংস্থান নেই, পরমার্থলাভের চেয়ে পরমান্ন-লাভের প্রয়োজন তার অধিক। আমি শুধু বলতে চাই যে আমরা যদি পরমার্থের কথা না ভাবি, তা হলে অন্নবস্ত্রের সংস্থান ক'জনের হল আর ক'জনের হল না,

কোনো সভ্যতার মূল্য-বিচার সে-তালিকার উপর নির্ভর করতে পারে না। অবশ্য যুগসন্ধিকালে এমন অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটতে পারে যাতে বেঁচে থাকবার তাগিদই সকলের পক্ষে সর্ব্বগ্রাসী হয়ে উঠবে। যেমন যুদ্ধের সময়ে শিল্পী তার তুলি রেখে, বৈজ্ঞানিক তার গবেষণা ছেড়ে, হাতে বন্দুক ধরতে বাধ্য হয়। আজকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সে-দুর্দ্দিন এসেছে এটা সম্ভব, হয়তো সত্য। আর্টিস্টরা তাঁদের সমস্ত শক্তি সমস্ত সাহস নিয়ে ফাশিষ্ট্-বর্ব্বরতা-বাহিনীর সম্মুখীন হবেন, এটা তাঁদের পক্ষে অগৌরবের কথা নয়। কিন্তু রণপ্রাঙ্গণে সেনাধ্যক্ষরা তাঁদের হাতে যে-কাজ দেবেন তাকে আর্ট বলবার নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। সাম্যবাদের উর্ব্বর ভূমিতে হয়তো সোনার ফসল ফলবে, কিন্তু শ্রেণী-সংঘর্ষের যন্ত্ররূপ সাম্যবাদী শিল্প হচ্ছে আমাদের দার্শনিকদের পরিভাষায় "বন্ধ্যাপ্রসূতি।"

এস্কেপিজ্‌ম্ সম্বন্ধে মার্ক্স্-পন্থীরা যে-বিসংবাদের অবতারণা করেছেন সেখানেও তাঁদের সাহিত্য-বিচার অনুজ্ঞাবাহক। সাহিত্যকে বস্তুতান্ত্রিক হতে হবে, বাস্তব-মুখীন হতে হবে—এই কথাগুলি মেনে নেবার আগে জানতে চাই কোন্‌টা বাস্তব আর কোন্‌টা অবাস্তব। চোখ খুলে সামনে যা দেখতে পাই, যাকে আমরা চলতি বাঙলায় বলি "ফ্যাক্ট্," তাই কি বাস্তব? তা হলে তো সাম্যবাদীদের প্রসাদ-লালিত পদার্থবিদেরাই এস্কেপিষ্টের চূড়ান্ত। আইন্‌স্টাইনের চতুরায়তনিক বঙ্কিমতা কিম্বা শ্রোয়ডিঙরের সম্ভাবনা-তরঙ্গের সঙ্গে টেবিল চেয়ার ঘর-বাড়ীর সম্বন্ধ কতটুকু? অবশ্য প্রতীয়মান বস্তুমাত্রের জন্য সাম্যবাদীদেরও বড় একটা মাথাব্যথা নেই, তাঁদের "বাস্তব" হচ্ছে ডায়লেক্‌টিক্-গতি-ধর্ম্মী জড় প্রকৃতি। এটা যে প্রত্যক্ষ নয়, আনুমানিক, বহু মতবাদের মধ্যে একটি মতবাদমাত্র, তা বোঝাবার জন্য পরিভাষা-কণ্টকিত কোনো প্রমাণের আবশ্যক নেই। এবং এই মতবাদটিকে বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় স্থাপিত করবার জন্য এঙ্গেল্‌স্ প্রমুখ যে-সব দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তা ভগবানের অস্তিত্বের বাজারে-চল্‌তি "প্রমাণে"র চেয়েও হাস্যকর। তবু এই ধ্রুব সত্যটিকে আর্টের মধ্যে রূপ দিতেই হবে। যদি আপনার শিল্পী মন তথ্যের অন্তরালে অন্য কিছুর সন্ধান পেয়ে থাকে, তা সে গ্রীক নাট্যকারদের অন্ধ নিয়তিই হোক কিম্বা "নক্ষত্রের পাথার স্পন্দন"ই হোক,

তা হলে আপনাকে শিষ্ট ভাষায় এস্কেপিষ্ট্ বলা যায়, কিন্তু আসলে আপনি ফাশিষ্ট্, স্বার্থান্ধ, সভ্যতার শত্রু।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার সঙ্গে একাধারে সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য রক্ষা ক'রে টি, ই, হিউম্ দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবিধ ধারার মূল-উৎস হচ্ছে কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসগুলি যুগ-চৈতন্যের যে-আসংজ্ঞাত স্তরে সক্রিয় সেখানে যুক্তিতর্কের অবকাশ নেই, প্রমাণ-অপ্রমাণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উত্তর-রেনেসাঁস্ চিৎপ্রকর্ষের মূলে রয়েছে হিউম্যানিজ্‌ম্ অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজ শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস, এবং তার প্রগতির অনন্ত সম্ভাবনার স্বীকৃতি। হিউম্যানিজ্‌ম্‌কে হিউম্ ভ্রান্ত মনে করেন, তাঁর বিবেচনায় মধ্যযুগের মূল্যবোধই সত্য, অন্তত অধিকতর সত্য। সে-মূল্যবোধে মানুষ অকিঞ্চন, প্রগতি কবিকল্পনা, জীবনের শেষ পরিণতি অনিবার্য্যরূপে ট্র্যাজিক্। চরম মূল্যের আধার মানুষ নয় ভগবান, অনাত্মীয়, সুদূর, স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভগবান।— এমন প্রাথমিক প্রাগান্বীক্ষিকী (prelogical) বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্যমিথ্যার বিচার সম্ভব নয়, তার কোনো অর্থই এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হিউম্ নিজেই প্রচার করেছেন যে আমাদের সংস্কৃতির সমগ্র রূপকল্প এই বিশ্বাসের দ্বারা নির্দ্ধারিত। সুতরাং আমাদের বিচারের পদ্ধতি ও প্রতিমাণও সে-বিশ্বাসের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। সে-বিশ্বাসকে বিচার করতে চাইলে যুগধর্ম্ম-নিরপেক্ষ প্রতিমাণ আবশ্যক। তেমন কোনো প্রতিমাণের সম্ভাবনা হিউমের দর্শনে নেই। তবে তর্কের পথ ছেড়ে দিয়ে কবি হিউম্ বলতে পারেন যে হিউম্যানিজ্‌ম্-এর রূপায়নিক প্রাণপ্রবাহ আজ নিস্তেজ হয়ে এসেছে। মানুষের মতন মানুষের বিশ্বাসেরও জন্ম জরা ও মৃত্যু ঘ'টে থাকে। যদিচ তার পরমায়ু "তিন কুড়ি দশ"-এর অধিক, তবু এমন দিন আসে যখন তার প্রাণের দৈন্য আর ঢেকে রাখা যায় না। সে-দৈন্যের চেহারা আজ শিল্পীদের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে, তাই তাঁদের সৃজনীশক্তি ব্যাহত, আত্মসম্বোধন-রত। এর হয়তো কোনো উপায় নেই, ইতিহাসের অনাদ্যন্ত প্রবাহ এমনি ক'রে ভাঙে আর গড়ে। চিরাগত বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ভিৎ গেছে ভেঙে, তার

ভগ্নস্তূপের উপর নতুন যুগের ইমারত যতদিন না মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ততদিন আমাদের কবিদের গলা শোনাবে "শান্ত অর্থহীন, যেন শুক্‌নো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।" ততদিন আমরা কেবল চেয়ে দেখব চারিদিককার প্রাণস্পন্দিত শ্যামলিমা যাচ্ছে বিবর্ণ হয়ে, যেখানে বনস্পতি ছায়া বিস্তার ক'রে ছিল সেখানে রইল শুধু রিক্ত বিস্তৃত মরুভূমি। আর সে-মরুভূমির তৃষ্ণার্ত্ত হাহাকারে রইল এ-যুগের ছন্দহীন প্রার্থনা :

"অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জ্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়াফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।"

কবি ও তার সমাজ

বুদ্ধদেব বসু

কিছুদিন পূর্বে এক ইংরেজ সমালোচক বাঙলাদেশকে কবিতার দেশ—'land made for poetry'—ব'লে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাতে আমাদের মনটা খুসি হবারই কথা; কিন্তু সত্যি-সত্যি যে-লোক বাঙলা ভাষায় কবিতা লেখে তার পক্ষে খুসি হবার কোনোই কারণ নেই। বরং এই উপাধি তার কানে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের মতোই শোনাবে। বাঙলাদেশ কবিতার দেশ—তার মানে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে আমরা সব অপৌরুষ ভাবালুতায় আবিল; জীবনযুদ্ধে বহু শতাব্দী ধ'রে পরাজিত হ'য়ে-হ'য়ে এমন দুর্দশা হয়েছে যে এখন আর আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিবিলাস ছাড়া আত্ম-প্রতারণার কোনো রাস্তা খোলা নেই। কর্মক্ষেত্রে প্রতিপদে আমাদের পরাভব; আর আমাদের বীর্যহীন শক্তিহীন হাড়-বের-করা অতি-মলিন দারিদ্র্যের লজ্জাকে ঢাকবার জন্য রাবণের এরোপ্লেন চড়া থেকে সুরু ক'রে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের 'ঋষিত্ব' পর্যন্ত যত কৌশল আমরা উদ্ভাবন করেছি তার মধ্যে বাঙালির বিখ্যাত 'কবিত্ব'ও অন্যতম।

সেদিন পর্যন্তও আমাদের দেশে ধর্ম থেকে কবিতা আলাদা ছিল না। বৈষ্ণব কবিতা, মনসামঙ্গল ইত্যাদি, জয়দেব—সবারই মধ্যে আছে লৌকিক ধর্মের ও অলৌকিক দৈবমহিমার প্রচার। বুদ্ধিমান ভারতচন্দ্রকেও অতগুলো দ্ব্যর্থশ্লোকে কালীর বন্দনা ভাঁজতে হয়েছিল। ধর্মের সঙ্গে কবিতার এই যে অভিন্নতা—এর রেশ আমাদের আধুনিককালেও একেবারে যায়নি। তার প্রমাণ এই যে বড়ো কবিকে আমরা কবি ব'লে খুসি হই না; তাঁকে ঋষি বলি। সেকালে যে ধারণা ছিল যে কবি একটি দৈব জীব, ঐশী আশীর্বাদে বিনা চেষ্টায় অনর্গল শ্লোকনির্মাণ করেন, সে-ধারণা আজ পর্যন্তও চ'লে আসছে। ইয়োরোপের মধ্যযুগ বহুকাল গত; আমরা সবে মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে আসছি—কি এখনো সম্পূর্ণভাবে বেরোইনি। আজকের দিনেও আমাদের দেশে 'পাশ্চাত্য' সভ্যতার (যেন এই এরোপ্লেন ও টেলিভিশনের পৃথিবীতে পূর্বীয় ও পাশ্চাত্য দু' রকম সভ্যতা থাকা

সম্ভব!) যাঁরা বিরোধী, তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়; এবং তাঁরা সকলেই আধুনিকতার শত্রু, মধ্যযুগ ফিরিয়ে আনবার পক্ষপাতী।

ধর্মের সঙ্গে কবিতার এই সংশ্রব, ও তারই ফলে কবি একটি দৈব জীব এই ধারণা—এতে আমাদের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে। কবির সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধের কথাই ধরা যাক্। কেবালক হঠাৎ আননের সঙ্গে কানন কি হৃদয়ের সঙ্গে নিদয় মিলিয়ে গোপনে একটা পদ্য লিখে ফেলেছে, তার সম্বন্ধে আমাদের দেশে দু'রকমের মনোভাব। এক পক্ষে তার গুরুজন ক'ষে তার কানটা ম'লে দেবেন—কেননা পদ্য-ফদ্য লিখলেই ছেলেরা ব'খে যায়, প্রেমে পড়ে, সিগারেট ও মদ খেতে শেখে, টাকা রোজগারে মন দেয় না, ইত্যাদি। অন্যপক্ষে, সেই বালক হঠাৎ তার পরিবারে অতি উঁচু সম্মানের ডালেও প্রোমোশন পেতে পারে—সে 'বিশেষ' কেউ, সে 'সাধারণ' নয়, তার সমবয়সীদের থেকে সকল বিষয়েই তার জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। উভয়ক্ষেত্রেই, পদ্যরচনাকে অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ব'লে ধরা হচ্ছে; এবং কর্মক্ষেত্রে দ্বিতীয়টাই মন্দের ভালো হ'লেও উভয় ব্যবস্থাই দোষাবহ; কবিকে সুস্থ ও প্রাকৃত মানুষ ছাড়া অন্য-কিছু মনে করাই অন্যায়।

তারপর সে-ছেলের যখন বছর কুড়ি বয়েস হ'লো—ততদিনেও যদি তার পদ্য লেখার অভ্যেস থাকে—তাহ'লে সাবালক জীবনেও সে কবিতা সম্বন্ধে ঐ দু'রকম ভঙ্গিই দেখতে পাবে। ধরা যাক্ সে ভালো কবিতাই লেখে; এবং মাসিকপত্র থেকে বহুবার বহু রচনা ফেরৎ আসবার পর কিছু-কিছু প্রকাশিতও হয়েছে। তাকে যারা খাতির করে তাদের ধারণা কবিতা লেখাটা অতি-মানুষিক কিছু ব্যাপার—(আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোক মিল দেয়া ব্যাপারটাকে অতি-মানবিক—এমন কি অলৌকিক—ক্ষমতাসাপেক্ষ মনে করে, মনে করে কবিত্বের প্রধান লক্ষণ; গদ্যছন্দ সম্বন্ধে সাধারণ বিমুখতার সেটাই আসল কারণ)—তারা সব কথাতেই বলে, 'ওঃ, তোমরা কবিমানুষ, তোমাদের কথা আলাদা!' 'তোমরা কবিমানুষ!' এই কথাটা প্রায়ই স্তুতি হিসেবেই বলা হয়; কিন্তু আসলে সর্বদাই চরম অবজ্ঞাসূচক। সেই নবীন কবিকে যারা প্রকাশ্যেই অসম্মান করে, যারা

বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই বলে, 'কবিতা-টবিতা আমরা বুঝিনে বাপু' ; কিংবা যারা ভাবে যুবকের পক্ষে কবিতা লেখাটা দুশ্চরিত্রতারই লক্ষণ, তাদের থেকে কবির দৈবপ্রতিভাপূজকের মনোভাব কিছুই আলাদা নয়। উভয় শ্রেণীই কবিকে **নিষ্প্রয়োজন** মনে করে—একদল ভাবে বিলাসিতা, অন্য দল ভাবে উৎপাত, এই যা তফাৎ। কবির **সামাজিক** মূল্য কোনো দলই মানে না। সুতরাং সেই নবীন কবি অচিরেই উপলব্ধি করবে যে তাকে কেউ চায় না—এত বড়ো দেশের এত সব ব্যাপারের মধ্যে কোনোখানেই তার স্থান নেই। এবং চাহিদা নেই ব'লে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সে হয়তো দিতেও পারে না। কুড়ি বছরে আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিরিশে শুকিয়ে ঝ'রে গেছে আমাদের দেশে এই রকম সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত এইজন্যেই এত শোকাবহভাবে বেশি।

আমাদের দেশে, তাহ'লে, সাহিত্যশিল্পীর কোনো সামাজিক মূল্য নেই, তার মানে অর্থনৈতিক মূল্যও নেই। ঐশ্বরিক আশীর্বাদই যার সম্বল, তার সম্পর্কে তুচ্ছ ও স্থূল খাওয়া-পরার প্রসঙ্গ অতি অবান্তর ; সেই তুচ্ছতার ব্যবস্থা করতে তাকে যে কেরানিগিরি কি মাষ্টারি করতে হয়, কি বিজ্ঞাপন লিখতে হয়, সেটাও অবশ্য নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা। পৃথিবীর সব চেয়ে অগ্রগত দেশেও দেখতে পাই শিল্পী অর্থনৈতিক দাসত্বে শৃঙ্খলিত : যে-শিল্প শাসকশ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা ও বর্দ্ধন করে তার জন্য সমাজ প্রভূত অর্থমূল্য দেয় ; কিন্তু যে-শিল্প তা করে না, অতি পরোক্ষ ও অস্পষ্টভাবেও শ্রেণীস্বার্থের বিরোধিতা করে তার বাজার বড়ো মন্দা। উদাহরণস্বরূপ, একদিকে কিপলিঙ ও অন্যদিকে ডি, এইচ, লরেন্সের নাম করা যেতে পারে। কথাটা এ-ভাবেও বলা যায় যে, ইংলণ্ড কি আমেরিকার ধনিক শ্রেণী সাহিত্য ও শিল্পকেও তাদের স্বার্থসিদ্ধি ও বৃদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে, মধ্যযুগের ইয়োরোপে চর্চ্ যা করেছিলো। তাতে অন্তত এটা প্রমাণ হয় যে সাহিত্য ও শিল্পের সামাজিক মূল্য ও-সব দেশে স্বীকৃত। প্রোপাগাণ্ডা হিসেবে আর্ট যে অদ্বিতীয়, এ-কথা রোমান ক্যাথলিক পোপরা খুব ভালো ক'রেই বুঝেছিলেন ; এবং তাঁদের উত্তরাধিকারী আজকালকার বণিক-শাসকরাও বুঝেছেন।

কিন্তু আমাদের স্বদেশি ধনতন্ত্রও অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল ; উনিশ শতকের পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বিরাট কল্পনা ও কর্মিষ্ঠতা নেই তার, শোচনীয় পরিণামটাই শুধু আছে ; আমাদের বুর্জোয়াশ্রেণী ব্যাঙ্কে টাকা জমাতেই শিখেছে, দেশের সংস্কৃতি রক্ষার ভার তাদের উপর এমন গর্ব পর্যন্ত পোষণ করে না : 'white man's burden'-এ বিশ্বাসের ফলে উত্তরমেরু থেকে মধ্য আফ্রিকা পর্যন্ত মানুষের অধিগম্য হয়েছিলো এটা মানতেই হবে, কিন্তু ব্রাউন মানুষ স্বদেশেও কোনো দায়িত্ব নিলে না ; সমস্ত দোষ ইংরেজ শাসনের ঘাড়ে চাপিয়ে যথাসম্ভব আত্ম-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে লাগলো। আমাদের খাঁটি স্বদেশি ধনিকশ্রেণীতে এমন কিছুই নেই যা কোনো কবিকে কি শিল্পীকে আকর্ষণ করতে পারে ; এবং সেই শ্রেণীরও এতখানি কল্পনাশক্তি নেই যাতে তারা বুঝতে পারে যে কবি কি শিল্পীকে দিয়ে কোনো 'কাজ' হয়।

সুতরাং আমাদের দেশে আজকের দিনে কোনো কবিরই তার সমাজের কাছে কোনো প্রত্যাশা নেই। অবহেলা ও অপমান তার প্রাপ্য এটাই সে ধ'রে নেয়। তাকে দিয়ে কারো কোনো দরকার নেই ; কবি ও কাজের লোক পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা। এদিকে সে-ও তার প্রতিশোধ নেয় সমাজের দিক থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে ; জনসাধারণ সম্বন্ধে অবজ্ঞার স্তম্ভ তুলে আত্মরক্ষা করে, হ'য়ে পড়ে গ্রন্থে ও নির্দিষ্ট দু'চারটি বন্ধুতে আবদ্ধ বুদ্ধিজীবী, নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ; এবং তার ফলে ক্রমশই তার সমাজের সঙ্গে তার যোগা-যোগ ক্ষীণ হ'য়ে আসে, মনীষা হ'য়ে পড়ে রক্তহীন, জনসাধারণের হৃদয়হীন উদাসীনতার ফলে ক্রমে নিজের মধ্যে এমন একটা ব্যর্থতাবোধ আসে যে শেষ পর্যন্ত আর কবিতা লেখাতেও কোনো উৎসাহ থাকে না। এইভাবে দু'দিক থেকেই অপরিসীম লোকসান হ'তে থাকে ; কবি যা দিতে পারে সমাজ তা নেয় না ; এবং নেয় না ব'লে কবিও সমস্তটা দিতে পারে না—কি যথেষ্টও দিতে পারে না।

প্রত্যেক কবি তাঁর স্থান ও কালেরই সৃষ্টি—অর্থাৎ বিশেষ একটি সমাজের সৃষ্টি। তাঁর বিষয়গুলি 'চিরন্তন' ব'লে অ-সাময়িক নয়, হ'তেই পারে না।

বরং বড়ো কবির রচনাকে বলা যায় চিরন্তন সংবাদপত্র—যেমন কিনা শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ড সম্বন্ধে সমস্ত খবরই জানতে পাই; রবীন্দ্র-কাব্যে পাই উনিশ শতকের শেষের ও বিশ শতকের গোড়াকার বঙ্গভূমির সম্পূর্ণ কাহিনী। কাব্য বাছাই করে; তা ছাড়া একমাত্র কাব্যেই ভাষার চরম অর্থময়তা ব্যবহৃত হয়; সেইজন্য খবরের কাগজের চেয়ে, এমন কি ইতিহাসের চেয়ে, কাব্য অনেক বেশি টেঁকসই ও বিশ্বাসযোগ্য। এদিক থেকে, সমাজের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। অন্যদিকে, অত্যন্ত অভিমানী কবিও পাঠক খোঁজে, অর্থাৎ সামাজিক স্বীকৃতি চায়; নয়তো কবিতা লিখেই কবিরা খুসি থাকতেন; কবিতা প্রকাশ করতে কি নাটক অভিনীত করাতে ব্যস্ত হতেন না—অন্তত এই বাঙলাদেশে এই দুর্দিনে অতি কষ্টে উপার্জিত মূল্যবান মুদ্রা ব্যয় ক'রে আমরা যে কবিতার বই ছাপতুম না, এটা নিশ্চিত। সুতরাং, যতই আমরা উন্নাসিক অবজ্ঞা প্রকাশ করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আত্মরক্ষার যত শক্ত দুর্গই নির্মাণ করি না—সেটা আত্মরক্ষার উপায় ব'লেই জানি, শিক্ষার কি পরিণতির নয়; পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ, সামাজিক মূল্যীকরণ আমাদের সকলেরই কাম্য; এবং তার অভাবে কবিপ্রতিভা ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হ'য়ে আসে সেকথাও অনস্বীকার্য।

কিন্তু আজকের দিনে বাঙলাদেশে কবির সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ অতি ক্ষীণ কি একেবারেই নেই। আর্ট আমাদের কাছে এখনো গভীর অবজ্ঞার বস্তু; বড়ো জোর খুব একটা উঁচুদরের বিলাসিতা। এ-কথা অন্যান্য শিল্পের চাইতে কবিতা সম্বন্ধেই বিশেষ ক'রে প্রযুজ্য। গল্প নভেল প'ড়ে তবু সময় কাটে—কবিতা দিয়ে কী হয়? মাসিকপত্রে গল্প শেষ হ'লে নিচে যে-দু' ইঞ্চি জায়গা থাকে সেটুকু ভরানোতেই কবিতার ব্যবহার—কাগজের কর্তারা কেন যে সেখানে চড়া দামে বিজ্ঞাপন না দিয়ে কবিতা ছাপেন তা ভেবে আমার প্রায়ই অবাক লেগেছে। অনেক সাময়িকপত্রের সম্পাদকীয় নিয়মের মধ্যে একটি থাকে এই: 'অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না'! আমাদের কাগজগুলো থেকে গল্পের জন্য—এমন কি, যে-কোনো গদ্য লেখার জন্য—কিছু পারিশ্রমিক খসানো আজকের দিনে অসম্ভব নয়; কিন্তু কবিতার কোনো পারিশ্রমিক প্রাপ্য হ'তে

পারে এ-কথা দশ-পনেরো হাজারি মাসিকের কর্তারা উন্মত্ততম মুহূর্তেও কল্পনায় আনতে পারেন না। এই পর্যন্ত, land made for poetry!

যে-অল্পসংখ্যক লোক সত্যি হয়তো কবিতাপ্রেমিক, তাঁদের উপর এর প্রতিক্রিয়াও অতি তীব্র। তাঁরা চান কবিতাকে বর্বর জনসাধারণের স্থূল স্পর্শ থেকে বাঁচাতে, কবিতাকে বিশেষ একটি গোষ্ঠীগত ক'রে তুলতে, কবিতার সদর দরজায় 'কেবল দীক্ষিতের জন্য' এই নুটিশ লটকিয়ে রাখতে। অর্থাৎ কিনা, কবিতার চর্চা যেন ছোটোখাটো একটি ধর্মাচারের সামিল; কবিতা 'পবিত্র' ও বিশেষভাবে মহিমান্বিত—সাধারণ লোকের জন্য থাক দিশি সিনেমা আর আনন্দবাজার পত্রিকা, কেবল আমরা কয়েকজন পান করি এই স্বর্গীয় সুরা।

পাঠকসাধারণ যেখানে হৃদয়হীনভাবে উদাসীন সেখানে কাব্যপ্রেমিকের এই মনোভাব হয়তো ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু শুধু ক্ষমারই যোগ্য, প্রশংসার যোগ্য নয়। কেননা কবিতাকে 'পবিত্র' কি 'স্বর্গীয়' বলা ও তাকে আকাশকুসুম বলা একই কথা। যে-মুহূর্তে কবিতাকে সুর-সুধা বললুম সেই মুহূর্তেই তাকে অতি বাজে একটা বিলাসিতা ব'লে মানলুম, মানুষের সঙ্গে, মানুষের জীবনের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই। যখনই কবিকে ঋষি সাজিয়ে তাঁর মূর্তিপূজায় বসলুম, তখনই ধ'রে নিলুম যে আমাদের ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে তাঁর কিছুমাত্র স্থান নেই, তিনি নিতান্তই একটা সৌখিন বাহুল্য।

ব্যাপারটা কী-রকম হ'লো? যেন ঘোরেল জমিদার বহুলোকের বহু সর্বনাশ করে গোলগাল ভুঁড়িটিকে ফাঁপিয়ে তুলছে, এদিকে বাড়িতে পূজাপার্বণ আচার অনুষ্ঠানের ধুমধামের কামাই নেই। কিংবা যেন অত্যাচারী শাশুড়ি যিনি মূর্তিমতী অশান্তি, অথচ ধর্মপালনে যাঁর নিষ্ঠা প্রতিবেশীর বিস্ময়ের বিষয়। ধর্মটা থাকে নিতান্তই একটা বাইরের জিনিস, সংস্কার রক্ষায় ও লোকাচারপালনে আবদ্ধ, ব্যবহারিক জীবনে প্রবেশ নিষিদ্ধ তার; ব্যবহারিক ও সাংসারিক জীবনে তার কোনো প্রয়োগ থাকতে পারে, সে-কথা বললে এই ধার্মিক জীবেরা আন্তরিকভাবেই বিস্মিত হবেন। তেমনি, কবিতাপ্রেমটাও যেন উপরকার একটা পালিশ, যার সঙ্গে রক্তের কোনো যোগ নেই, ব্যবহারিক ও

সাংসারিক জীবন থেকে যা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; জীবনগৃহের ভিত্তিতে যে-সব ক্ষুধা ও কামনা, আশা, উদ্যম ও সুখদুঃখ রয়েছে সেখানে কবিতা একেবারেই অব্যবহার্য। কবিতাও যদি এই ধর্মেরই স্থান নেয়, তার চেয়ে শোচনীয় আর কিছু হ'তে পারে না। কেননা কবিতা সংস্কৃতির লোকাচারমাত্র নয়। আমাদের জীবনে তার গূঢ় ও ব্যাপক প্রয়োগ—আমাদের সামাজিক, ব্যবহারিক ও সাংসারিক জীবনে। কিন্তু কবিতাকে যতদিন আমরা 'স্বর্গীয়' কোনো বস্তু ব'লে ভাববো, যা মানুষের বাস্তব কর্মজীবন থেকে বহু দূরে সরানো, ততদিন অতি আন্তরিক কাব্যপ্রীতি নিয়েও কবিতাকে আমরা নীরক্ত পাণ্ডুরোগী ক'রেই তুলবো; জীবনের মধ্যে তাকে ব্যবহার করতে পারবো না।

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কবির সম্বন্ধে এই যে অবহেলা এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথও কম আক্ষেপ করেননি। কবিতাকে যে আজকাল পটলডাঙার অগ্নিবাসে চ'ড়ে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়, নানা সওয়ারের মাঝখানে ব'সে নির্বাক ছাপার অক্ষরে উপস্থিত হ'তে হয় হয়তো বিমুখ, হয়তো বিরোধী, হয়তো নির্বোধ পাঠকের দরজায়—এতে তিনি মানসিক পীড়া বোধ করেন। 'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে!' কী হ'তো তবে? তবে কবিতা আবৃত্তি করার পরে ফুলের মালা পড়তো গলায়, চন্দনের ফোঁটা কপালে—তা ছাড়া উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি আর তার উপর জমিজমা স্বর্ণমুদ্রাও বাদ যেতো না। জীবনটা মন্দাক্রান্তা তালে সুখেই কাটতো, কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে তালটা বড্ড বেশি ঢিমে। নিজের সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালের দিকে তাকিয়ে দু'একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন; কিন্তু এও সত্য যে ঐ সময়ে বদলি হ'তে মনে-মনে কিছুতেই তিনি রাজি নন। রাজকবি খুব প্রত্যক্ষভাবেই অর্থনৈতিক দাস; রাজা যাতে খুসি হবেন এমন শ্লোক প্রতিদিন রচনা করতে হ'লে কোনো কবিপ্রতিভাই শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না—নিশ্চিন্ত, অবসরময় সচ্ছল জীবন সত্ত্বেও।

তবু যে সেকালের রাজসভায় কবির ও ভাঁড়ের আসন নির্দিষ্ট ছিল, এটা লক্ষ্য করবার। রাজকর্মচারীর তালিকায় কবিরও নাম ছিল। কবির সঙ্গে তাঁর

পাঠকের ছিল প্রত্যক্ষ ও নিবিড় যোগাযোগ। হয়তো তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পাঠক যারা হ'তে পারতো তারা রাজসভার কাছাকাছিও আসতে পারতো না, খুব সম্ভবত তারা মূর্খ ও নিরক্ষর ছিল; হয়তো কবিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা ও রাজপারিষদদের নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হ'তো। তবু, যে-ক'জনই এবং যে-রকমেরই পাঠক পেতেন, তাদের খুব নিকটভাবেই পেতেন; হত্যাকারী উদাসীনতার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

এ-যুগের দাবি এই যে শিল্পীকে সে মুক্তি দিয়েছে। কোনো রাজা বা পুরোহিতকে খুসি করবার দরকার নেই। যাকে খুসি করা দরকার সে নামহীন ও অদৃশ্য, তাকে আমরা পাব্লিক বলি। কবি এখনো অর্থনৈতিক দাস;—কোন্ মানুষ নয়?—তবে তার প্রভু রাজবংশের একটি ব্যক্তিবিশেষ নয়, তার প্রভু সকলেই, যে-কেউ, সমগ্র জনসাধারণ। বর্তমান ব্যবস্থায় কবির স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ঢের বেশি—অন্তত ঢের বেশি হ'তে পারে। প্রভু যদি অদৃশ্য ও নামহীন হয় সেটা মস্ত সুবিধে এই কারণে যে বিশেষ কাউকে খুসি করবার দায় থাকে না। ছাপার অক্ষরে বই বেরিয়ে অনেক অপরিচিত হাতে-হাতে ঘুরছে, অনেক অদৃশ্য হাত থেকে আসছে কবির উপজীবিকা— কাব্য ও কবির পক্ষে এ-ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভালো। কেননা কবি যা তৈরি করছে সেটা পয়সা দিয়ে কেনবার যথেষ্ট লোক যদি পাওয়া যায়, কবির সামাজিক মূল্যস্বীকারের সেটাই সব চেয়ে বড়ো পরিচয়; এবং পাঠকরা যদি অন্ন-বস্ত্রগৃহ ও আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো ক্রমাগত জুগিয়ে চলে তাহ'লে বেলফুলের মালা কি শ্বেতচন্দনের ফোঁটার উপর দাবি আমরা খুব খুসি হ'য়েই ছাড়বো।

কিন্তু ঠিক এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে দূরে থাক, ইয়োরোপে কি আমেরিকাতেও হয়নি এ-কথা এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি। জনসাধারণ অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও কু-শিক্ষিত; ঠিক এমন আবহাওয়ায় তাদের লালন ও জীবনধারণ যে পাশ্চাত্য জগতেও আজকাল ইচ্ছাপূরণ-সাহিত্যই সব চেয়ে চড়া দামে বিকোয়। খুন ও গোয়েন্দাগিরির গল্প, কি মজুরনি মেয়ের সঙ্গে লর্ডের ছেলের প্রণয়ের গল্প—এক কথায়, জীবনে যে-সব উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের স্বাদ কিছুতেই পাবার আশা নেই, সেই সব খুব উগ্র ঝাঁঝালো মাত্রায় পরিবেশণ করতে পারলে তবেই প্রচুরতম পুরস্কার

জোটে। এ-ধরণের সাহিত্য জীবনের বাস্তব চেহারার উপর শস্তা নেশার পরদা ফেলে দেয় ব'লেই জনসাধারণের তা সব চেয়ে প্রিয়—কেননা জীবনের বাস্তব চেহারা অতি জীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ, বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দ ও মলিন। কবির পণ্য শস্তা ও ঝাঁঝালো নেশা নয়; তাই এই সমাজব্যবস্থায় কবির অবস্থা খুব সুখের নয়।

ইয়োরোপের সমাজ তবু আজ এমন অবস্থায় এসেছে যে শিল্পীকে সত্যিকারের মুক্তি দেয়া তার পক্ষে কঠিন সাধনাসাপেক্ষ হ'লেও অলীক দিবা-স্বপ্ন নয়। যে-দেশে প্রায় সব লোকই লিখতে পড়তে জানে, এবং অনেক লোকেরই (অন্তত আমাদের তুলনায়) অবস্থা ভালো, সেখানে এমন লোকও কিছু থাকতে বাধ্য যারা ইচ্ছাপূরণ-কামী নয়, যারা অন্য জাতের উত্তেজনা ও উন্মাদনার সন্ধানী। ডি, এইচ্, লরেন্স কি ইয়েট্স দারিদ্র্যে বিক্ষত হ'য়েও পরাস্ত হননি; অন্তত কোনোরকমে বেঁচে থাকবার মতো পারিশ্রমিক সমাজের কাছ থেকে তাঁরা পেয়েছিলেন—লরেন্স মাষ্টারি ছাড়তে পেরেছিলেন এবং ইয়েট্সকে নিশ্চয়ই ফিল্মের বিজ্ঞাপন লিখতে হয়নি। সুতরাং ইংলণ্ডের সমাজে যদি আজ ভিত্তিগত পরিবর্তন আসে, যদি তার ফলে নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দতায় শারীরিক ও মানসিক সুখ সব মানুষেরই অধিগম্য হয় তাহ'লে সঙ্গে-সঙ্গে ইচ্ছাপূরণ-সাহিত্যের চাহিদা স্বভাবতই ক'মে আসবে, এবং কবি ও শিল্পীর ক্রেতার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। জীবনের নিত্য প্রয়োজনের সংস্থান যাদের অনিশ্চিত, ও যাদের জীবিকার কাজে কোনো আশা কি উৎসাহ নেই, তাদের সম্বন্ধে সুরুচি কি সুশিক্ষার প্রসঙ্গই হাস্যকর; এবং কবিতা ভালোবাসতে হ'লে শরীর ও মনের স্বাভাবিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য সর্বাগ্রে দরকার।

শিল্প যে একটা পেশাও এ-ধারণাই আমাদের দেশে এখনো অনাগত। এ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের নায়করা প্রায় সকলেই সৌখিন—এই অর্থে সৌখিন যে সাহিত্য তাঁদের কারুরই উপজীবিকা ছিল না। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউই এর ব্যতিক্রম নন। তা থেকে এমনও একটা ধারণা আমাদের সুধীসমাজে প্রচলিত যে লেখাটাকে পেশা করাই অন্যায়; লেখাটাকে হাটে বিকিকিনির বস্তু ব'লে কল্পনা করতেও অনেকের সূক্ষ্ম চিত্ত নির্মমভাবে আহত হয়। মোটা মাইনের

চাকরি—কি বৃহৎ অনুপার্জিত আয়—তারই উপর নির্ভর করে মানসিক বিলাস হিসেবে সাহিত্য রচনা—অনেক নীলরক্তবান বুদ্ধিজীবীর এই হচ্ছে আদর্শ।

এ-আদর্শ নিশ্চয়ই বিকৃত। এবং এটা অবশ্য আর কিছুই নয়; সামাজিক অবহেলারই একটা প্রতিক্রিয়া, অভিমানের একটা ভঙ্গি। কিন্তু আজকের দিনে আমরা বরং জোর ক'রেই সামাজিক মূল্য ও মর্যাদা দাবি করবো। আমরা এটুকু বলবো যে সামাজিক জীব হিসেবে কবিতা লিখেই আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পাদন করছি; কবিতা লেখার কাজটা শতকরা-একশোই 'প্রোডাক্টিভ'; এবং এই কাজের বিনিময়ে খাওয়া পরা ও অন্যান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমরা নিশ্চয়ই দাবি করতে পারি। অর্থাৎ, মুচি কি দরজি, ডাক্তার কি উকিল, রাজনৈতিক কি ব্যবসাদার সমাজের কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবেই যেটুকু আদায় করে, আমরাও ঠিক সেটুকুই চাই—তার বেশি নয়, তার কম নয়। মুচির কি দরজির, রাজনৈতিকের কি ব্যবসাদারের যা কর্মক্ষমতা সমাজ সেটাকে প্রয়োজন ব'লে স্বীকার করে, এবং তার দাম দেয়। তারা সকলেই 'কাজের লোক।' শুধু কবিই 'কাজের লোক' নয়—যদিও তার কাজে বুদ্ধিবৃত্তির চরম ব্যবহার, এবং তার কাজের ফল সমাজের উপর গভীর ও ব্যাপক, উপরন্তু একমাত্র তার কাজই মানুষকে ভালো ক'রে বাঁচতে শেখায়। কবি কাজের লোক নয় এই ভ্রান্ত ও ভ্রান্তিসঞ্চারী ধারণার জন্য কবিরা নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে দায়ী; আমাদের দেশে এটা বিলিতি রোমান্টিসিজিম্-এর মেকি প্রতিধ্বনি। মুচি যেমন জুতো তৈরি ক'রে বাজারে বেচে, আমরাও তেমনি কবিতা তৈরি ক'রে বাজারে বেচতে চাই, এ-কথাটা আজ খুব স্পষ্টভাবেই বলা দরকার। কেননা এতে ক'রেই কবি তার সামাজিক মূল্য ও মর্যাদা পাবে, সত্যিকারের সম্মান সেখানেই। কবিতাকে একটা সামাজিক কমোডিটি হিসেবে আমরা উপস্থিত করতে চাই; জুতো জামা কি রাজনৈতিক বক্তৃতা ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মতোই কবিতা সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে **প্রয়োজন** ব'লে যদি স্বীকৃত হয়, তার চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য কবির পক্ষে কিছু হ'তে পারে না।

শুধু তা হ'লেই কবির সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ আমাদের শরীরে রক্ত-চলাচলের মতো সহজ ও স্বাভাবিক হবে; আর তার ফলে কবি তার শ্রেষ্ঠ বিকাশে

পৌঁছতে পারবে, পাঠক নেবে সম্পূর্ণভাবে তার দাম আদায় ক'রে। যে-জিনিসকে আমরা প্রয়োজন মনে করি, তার জন্যে দাম দিই স্বেচ্ছায়, এবং দাম দিই ব'লে জিনিসটা ভালো পেলুম কিনা সেদিকেও নজর থাকে। ভালোকে যথেষ্টভাবে দাবি করতে পারলেই ভালোর জন্ম হয়। আমাদের দেশে সে চাহিদা নেই। সে চাহিদা যেদিন হবে সেদিন কবি ও শিল্পী আর 'দৈব'জীব থাকবে না, তারা হবে আর পাঁচজনের মতো সাধারণ কর্মী, এবং সাধারণ কর্মী হিসেবে তাদের জৈব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর অবান্তর মনে হবে না। কাব্য ও শিল্প একটা 'কাজ' ব'লে গৃহীত হবে, তার মানেই সব-সময়ের কাজ; কবি কি শিল্পীর 'নেহাৎ জীবিকার জন্য' অন্য কোনো কাজ করতে হ'তে পারে এটা সকলের কাছে স্বভাবতই অসম্ভব ঠেকবে। প্রত্যেক মানুষই খেটে খাবে, এই যদি মূলগত নীতি হয়, তবে কবি কবিতা লিখেই যে যথেষ্ট খাটছে সেটা অকুণ্ঠে স্বীকার করা হোক্। সমাজকে সে যা দিচ্ছে, তা অন্তত জুতো কি রাজনৈতিক বক্তৃতার মতোই মূল্যবান; সুতরাং তার বিনিময়ে সমাজ তাকে পোষণ করতে বাধ্য। অবশ্য এই ব্যবস্থা হবার আগে সর্বাগ্রে এ-ধারণা দূর হওয়া দরকার যে কবিতা বড়োলোকের অবসর কাটাবার বিলাস; এবং এ-ধারণা দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হওয়া দরকার যে কাব্য ও শিল্প সাধারণরকমের একটা 'কাজ' ছাড়া কিছু নয়।

শিল্পকে পেশা হিসেবে, সব-সময়ের কাজ ও একমাত্র উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে না পারলে কোনো শিল্পীর পক্ষে তাঁর সমস্ত সম্ভাবনা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কাব্যকে সব-সময়ের কাজ ক'রে না-নিতে পারলে কবি তাঁর ভগ্নাংশ দিতে পারেন শুধু। আমাদের দেশে অপূর্ণ সম্ভাবনার এই জন্যেই এত ছড়াছড়ি। আজকের দিনেও আমাদের দেশে কোনো পেশাদার কবি কি সাহিত্যিক প্রকৃতপক্ষে নেই। মানে এমন কোনো লেখক নেই যিনি জীবিকার জন্য শুধু তাঁর লেখার উপরেই নির্ভরশীল; যাঁকে অন্য কোনো কাজ করতে না হয়, কি যাঁর অনুপার্জিত কোনো আয় না আছে। বলাই বাহুল্য, অনুপার্জিত আয় যাঁদের আছে, এ-ক্ষেত্রে তাঁদেরই সুবিধে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই ঐ শ্রেণীর মধ্যে প্রতিভার জন্ম বিরল। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত হিসেবেই অদ্বিতীয়।

উপরে আমি যে-ছবি এঁকেছি তা অনেকের কাছেই ইউটপিয়া মনে হবে। আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে, আপাতত সেই অবস্থা আসবার অল্পই সম্ভাবনা দেখছি। যে-দেশের শতকরা নব্বইজন লোক নিরক্ষর, যে-দেশের মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা ভয়াবহরকম বর্ণহীন, এবং দরিদ্রের সমস্ত প্রাণশক্তি নেহাৎই দেহধারণের চেষ্টায় নিঃশেষিত; বেকার অবস্থা ও যৌন নিরোধের ফলে যেদেশের যৌবন পঙ্গু ও বিকৃত, সে-দেশে ফুটবল ও সস্তা স্বদেশি সিনেমা অতি জরুরি প্রয়োজন, কিন্তু কবিতা প্রয়োজন হবার কোনোই কারণ নেই। যতদিন আমূল সামাজিক পরিবর্তনের ফলে তা না হয়, ততদিন ব'সে-ব'সে শুধু ক্ষোভপ্রকাশ ক'রেও লাভ নেই; বরং সেই পরিবর্তনের দিকে সমাজকে অল্প একটুও যদি এগিয়ে দিতে পারা যায় সে-চেষ্টাই আজকের দিনে কবির কর্তব্য। আজ সব চেয়ে বেশি ক'রেই কবিকে কাজের লোক হ'তে হবে।

সম্পাদকসমীপে

বিষ্ণু দে

প্রিয়বরেষু,

মহামুস্কিলেই ফেলেছেন। আপনার অনুরোধের পুনরাবৃত্তিতে এদিকে যেমন আত্মপ্রসাদ হচ্ছে, মাসাধিক কাল ধরে প্রমাদও মানছি তেমনি। যে মনীষায়, চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের বলে আপনার কূটপ্রশ্নাদি সমালোচনা করা যায়, তা যে আমার নেই, সে খবর কি আপনিও বন্ধুবাৎসল্যে ভুলে গেছেন ?

হ্যারল্ড্ মন্‌রো-র জবাবে মহাজ্ঞানী খ্যাতনামা গিলবর্ট্ মরি লিখেছিলেন যে অতিশ্রান্ত শিক্ষকের পক্ষে এরকম বাজে কথার জবাব দেওয়া পোষায় না। দুঃখের বিষয়, অতিবিনয়ী না হলেও আমাকে সে কথা বলাও সাজে না, বিশেষ আপনার লেখা চোরাবালি-র দীর্ঘ প্রীতিকর সমালোচনার পরে।

কিন্তু কবিতা কি একরকম ? এবং ফলে, কবি বলে' নির্বিশেষ জীব কি আছে ? এবং সামাজিক জীব হিসাবেও যখন দুজন মানুষের অবস্থান এক নয়, তখন কি সমাজ ও কবির সম্পর্ক সরাসরি বিচার করা যায় ? তাছাড়া সংস্কৃতে মহাভারতও কি সর্বত্র সর্বজনভোগ্য ? চসর্ কি রাজা রিচর্ড্-ঘটিত ইংলণ্ডের ইতিহাস বলে' পাঠ্য ? আমাদের বন্ধু সমর সেন বা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হয়তো মনে করেন যে হোমর্ সমাজোৎসারিত আবেগে কাব্য লিখেছেন, কাব্যকলার সমস্যায় মাথা না খাটিয়ে, আঙ্গিকের চর্চা না করে'ই। কিন্তু রোমান্ কবিরা, আমরা জানি, কবিতাকে শিল্পকলার একটি বলে'ই নিয়েছিলেন। এবং গ্রীক্ নাট্যকারেরাও যে শিল্প চর্চাই করতেন, সে কথাও প্লেটো, আরিস্টট্‌ল্ এবং আরিস্টোফেনিস্ পাঠে স্পষ্ট। দান্তে সম্বন্ধে এবিষয়ে ভুল করবার তো কোনো অবসরই নেই।

অথচ সমাজসত্তার দিক থেকে এই সব কবিরা মহান, যদিচ ইতিহাস পড়ে'ই এঁদের মাহাত্ম্য সম্যক উপলব্ধি অসম্ভব। এটা বোঝা যায় যে কবিতা শুধু শিল্পবোধ্য হলেই, সেকালের ভাষায়, জীবন্ত হয় না, সুস্থভাবে নাড়া দেয় না, বা একালের ভাষায়, সমাজসত্তার বেগবান বাহন হয় না। কিন্তু তাই বলে' কি বলবেন যে টলেমির

সৌরজগতের বিজ্ঞানপ্রচারের জন্যেই pendent world লেখা বা লোপেজের জন্যেই ভিনিসীয় বণিক নামে নাটক ? আসলে, এর বেশি কিছু বলতে গেলে হয় বৈজ্ঞানিক মোটা মোটা বই লিখতে হয়, বা ব্যক্তিগত কথাই বলে' চুপ করতে হয়। মা কালী বিষয়ে উচ্ছ্বাস করলে যদি আপনি আপত্তি করেন যে আজ সমাজে কালী আর সত্য নয়, আর রামপ্রসাদী কবি বা দিলীপবাবু যদি জবাব দেন, আলবৎ সত্য, তাহলে আপনি নৃতাত্ত্বিক সংখ্যাগণিতের ভরসা নিতে পারেন বা সংক্ষেপে বলতে পারেন যে আপনার মতে সত্য নয় বা সত্য হওয়া উচিত নয়।

কাজেই সাহিত্যিক সমালোচনা করতে গিয়ে যতটুকু সামাজিক সমালোচনা করা যায়, তার বেশি করা কি স্থানাভাবে নিরাপদ ? যেমন ধরুন, ভিক্টোরীয় দুজন কবি হপ্‌কিন্‌স আর Songs before Sunrise-এর সুইন্‌বর্ন্। রাজনৈতিক অধুনাতনে সচেতন বলে'ই কি শেষোক্ত কবি প্রশংস্য এবং সেকেলে জেসুইট্-পন্থী ধর্মভীরু বলে'ই কি হপ্‌কিন্‌স্ নগণ্য ? তাঁদের কাব্যিক আলোচনা করলে কি উল্‌টো কথাই বল্‌তে হয় না ? কাজেই কবি সামাজিক জীব এবং কবি স্থপতি, ভাস্কর বা মুচির মতো শিল্পী, এবং ব্যক্তি-তেই স্টাইল্, এ তিন আর্যসত্যের মিশ্রণে সমালোচনাও মিশ্র হতে বাধ্য। তাছাড়া, মহামতি মার্ক্‌স্‌ও নাকি মেনেছেন যে সাহিত্যশিল্পাদির ইতিহাস দৈবচক্রে সমাজরাজের ইতিহাস থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে' বসেছে। এবং যেহেতু ভাষা ঐতিহ্যজীবী, তাই লেখক সমাজমনা হ'লেও কি করে' নিজের বিশেষ কর্মক্ষেত্রের ইতিহাস তুচ্ছ করবে, যদি বেচারাকে দু নৌকোয় পা-ই দিতে হয় ? অবশ্য স্বপ্ন, শৈশব এবং অতীতের মধ্যে আত্মবিসর্জন কোনোমতেই পোষণীয় নয়, মনস্তাত্ত্বিক না হ'য়েও সে কথা বলা যায়। জীবনধর্মী প্রগতি অবশ্যই কর্তব্য।

আর, পশ্চাদগতি যাতে না হয়, সে জন্যে লেখক খানিকটা চেষ্টা করতে পারে, তা আপনি নিশ্চয়ই মানেন। সামাজিক অবস্থা মতো অবশ্য সে চেষ্টার মাত্রা বা সাফল্য বদলায় কিন্তু সমালোচকমনস্ক প্রস্তুতি বা সাধনার শক্তিও হেয় নয়। আপনি তো ক্যালভিন-পন্থী নন, কাজেই আপনি মানেন যে ঈশ্বরের আবির্ভাব শুধুই তাঁর কৃপা বা করুণা বটে, অন্যপক্ষে মানুষের পুরুষকারোচিত সাধনারও শেষ নেই, এমন কি সে সাধনা আবশ্যিক। এই মনস্থ প্রস্তুতি অনুসারেই সাফল্য, ব্যক্তিগত শক্তি

ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য, এবং সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লেও সংজ্ঞা পায়। এমন কি বিষয়বস্তু ঘিরে যে ভাবচ্ছবি ফোটে, সেই বিষয়নির্বাচনেও এ প্রস্তুতি কথঞ্চিৎ সাহায্য করে, প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষ। অবস্থাবিশেষে এ সাহায্য লোকসাহিত্যের পল্লবিত রূপ নিতে পারে। আবার বিষয়ের লঘিষ্ঠতাও এরই জন্যে সম্ভব হয়, যদিও তাতে দুরূহার্থধ্বনি মাত্র এ আপত্তি উঠ্‌তে পারে। কিন্তু ধ্বনিও অর্থহীন শব্দযোজনা নয়, অর্থপ্রয়োগের একটি বুড়ি-ছোঁয়া রীতি মাত্র, যে রীতি ঐ পূর্বোক্ত অবস্থাবিশেষে সার্থক। তাই কবিদের ভাগ্যপরীক্ষা করে' বেড়াতে হয়, প্রস্তুতির স্বয়ম্বর সভায় দেখতে হয়, কি কপালে জোটে। অন্তঃপ্রেরণার তাড়নায় লেখে সবাই, কিন্তু দৈবাৎ যদি সেই তাড়না সাহিত্য সমাজ ও শিল্পের ব্যক্তিত্বহীন নির্দেশে মিলে' যায়, তাহলে'ই কবির সাধনা সার্থক এবং কবিতা যাকে বলে সাবালক। নয় কি?

কিন্তু এইসব সমস্যা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে লেখবার আমার পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি আর সময় কোথায়?

আধুনিক বাংলা কবিতা

লীলাময় রায়

আধুনিক বাংলা কবিতার কথা উঠলে সসঙ্কোচে বলতে ইচ্ছা করে, এমন করে আর ক'দিন চলবে।

গল্প বেশ চলছে, প্রবন্ধ মন্দ চলছে না। অচল কেবল কবিতা এবং কবিতার চেয়েও পশ্চাদ্‌পদ নাটক। কিন্তু নাটকের কথা থাক্।

আমার বিশ্বাস কবিতা যে ভাষায় লেখা হয় সে ভাষা আধুনিক বাঙালীর ভাষা নয়। কাব্যে অরুচির এ হলো প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ আমার মতে অব্‌জেক্টিভিটির অভাব। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—এই হচ্ছে দেশের স্বরূপ, তথা কবিতার স্বরূপ।

পদ্যের ভাষার দশা দেখে অনেকে পদ্যই ছেড়েছেন, পরিবর্তে লিখছেন গদ্য এবং নাম দিচ্ছেন গদ্যকবিতা। আমাদের গদ্যের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, যথেষ্ট লঘুভার না হলেও যথেষ্ট সাবলীল, লক্ষ্য ভেদ না করলেও শরের মতো তীক্ষ্ণ। এমন গদ্য থাকতে পদ্য লিখতে চাওয়া নেহাৎ জোর করে চাওয়া কিম্বা অভ্যাসবশে চাওয়া। অনেকে পদ্যের সম্ভাবনায় আস্থা হারিয়ে গদ্যের ভাগ্যের সঙ্গে কবিতার গাঁটছড়া বাঁধছেন। এ একরকম ম্যারেজ অফ কন্‌ভিনিয়েন্‌স্। এর পক্ষে বহুৎ যুক্তি আছে। আর এই তো সংসারের নিয়ম। তা হোক, আমার স্থির ধারণা গদ্যে কবিতা হতে পারে না। যা হয় তা কবিতা নয়, কবিত্ব। যাঁরা গদ্যকবিতা সুরু করেছেন তাঁদের পদ্যকবিতায় ফিরে আসতেই হবে, কেননা পদ্যকবিতাই কবিতা। কবিত্বের স্বাদ লোভনীয়, কিন্তু কবিতার স্বাদ মোহনীয়। আসতেই হবে ফিরে, তবে তার আগে পদ্যের ভাষা গদ্যের মতো আধুনিক হওয়া চাই। প্রায় অসাধ্য সাধন, তবু আশা আছে। বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো পদ্যকবিতায় আধুনিক ভাষার আভাস পেয়েছি। তাঁর উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। বিষ্ণু দের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা চলে।

গদ্য পদ্যের স্থান পূরণ করতে পারে না, পদ্য থাকবেই, হয়তো তার পরিণতির এই শেষ, তবু তার শেষ নেই। কবিতাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও বিয়ের উপহার ও শিশুর পারিতোষক বাবদ তার চাহিদা থাকবে। শিশুপাঠ্য মাসিকে

যেসব পদ্য ছাপা হয় সেইসব ছড়া কবিতার জন্য রাস্তা বাঁধছে, একদিন ঐ সড়কে কাব্যের মোটর শিঙা ফুঁকবে। বিয়ের পদ্যের কাছে তেমন কোনো দুরাশা নেই, একদা সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা যে কাজ হতো এখন কৃত্রিম পদ্যের দ্বারা তাই হয়, কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান।

তারপর অবজেক্‌টিভিটির প্রসঙ্গ। এর পারিভাষিক হাতের কাছে যা পেলুম তা গ্রহণের অযোগ্য। আমার বক্তব্য এই যে বাংলা কবিতা যা বলতে চায় তা ছাড়া আর সবই বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি বলে, কিন্তু সেই জিনিসটি বলে না। কী করে বলবে, স্বয়ং বক্তার কাছেই বিষয়টি পরিষ্কার নয়, তিনি বকবক করতেই—বকম বকম করতেই—ব্যস্ত। নিজের বানানো গোটাকতক বাক্য আর বাক্যাংশ তাঁকে মশগুল করে রাখে, কী বলতে চেষ্টা করে কী বলে চল্লেন তার হিসাব নেই। হয়তো তিনি চেষ্টাও করেন না, কলম আপনি দৌড়ায়, কাগজ আপনি কালো হয়, কালি আপনি ফুরোয়। আমাদের কবিদের ভাব আসে, তাঁরা ভাবাবেশে ইম্‌প্রো-ভাইজ করেন, আমাদের গায়কদের মতো ইম্‌প্রোভাইজেশনের উপর তাঁদের প্রচণ্ড ঝোঁক। সঙ্গীতকারদের রাগালাপ আর কাব্যকারদের বাক্যালাপ উভয়ের সাদৃশ্য সাতিশয় তাজ্জবকর।

আধুনিক বাঙালীও আধুনিক মানুষ। তার সময় কম, তার কাজ আছে। সে ঘড়ি ধরে গান শোনে, ছবি দেখে, কাব্য পড়ে। লোকটা আর যাই হোক বেহিসাবী নয়। বেহিসাবী বাগ্‌বহুল তরল কবিতা—তরল অথচ গন্তব্যহীন—তার কাছে উপদ্রববিশেষ। আধুনিক জীবনের সঙ্গে আধুনিক কবিতার বনিবনা ঘটছে না। জীবনের ক্রমেই প্রত্যয় হচ্ছে যে কবিতার কিছুই বলবার নেই, শুধুমাত্র বলাটাই তার বলবার। এত বড় জলজ্যান্ত জীবনটা সামনে পড়ে রয়েছে, তবু তার বিষয়ের অভাব! আমার মনে হয় বাণীকে বাহন না করে উপাস্য করাতেই এই দুর্গতি। এর প্রতিকার, বাক্যের সন্ধান ছেড়ে বস্তুর উপর মন দেওয়া। প্রয়োজন হলে বস্তু আপনি আপনার বাক্য গড়ে নেয়।

বাংলা কবিতার আধুনিক যুগ নিরর্থক হবে না, যদি সে কানের ভিতর না দিয়ে সরাসরি মর্ম্মে প্রবেশ করে।

কবিতার অনুবাদ

হম্‌ফ্রি হাউস

শেলির *Defense of poertry* বাক্যবিন্যাসে ধ্বনিময়; তারই একটি আশ্চর্য বাক্যের কারুকার্যে তিনি ভাষা থেকে ভাষান্তরে কবিতা অনুবাদ করতে যাওয়ার ব্যর্থতার কথা বলছেন।

"একটি ভায়োলেটফুলের বর্ণ ও গন্ধের মূলনীতি আবিষ্কার করবার চেষ্টায় তাকে হাঁড়িতে জ্বাল দেয়া যতটা সুবুদ্ধির কাজ, কবির সৃষ্টিকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করবার চেষ্টাও তেমনি। সেই বীজ থেকেই যদি আবার গাছ না জন্মায় তাহলে আর ফুল ফুটবে না—বাবেলের অভিশাপের এই হচ্ছে মর্ম।" শেলির প্রবন্ধ থেকে এ কথাটির উদ্ধৃতি বড়ো দেখা যায় না; যদিও যে কথাগুলি প্রায়ই উদ্ধৃত হয় সেগুলি শুনতে এরই মতো সমারোহময় হলেও ঢের কম সত্য। কবিতার সঙ্গত অনুবাদ একেবারেই সম্ভব, সত্যি-সত্যি এ রকম মত কারুরই নয়। সম্প্রতি কাব্যের মূলসূত্র বিষয়ে একজন লেখক ক্রিস্টফার কড্‌ওয়েল তাঁর *Illusion and Reality* গ্রন্থে একথাই বলেছেন যে কবিতা যে অন্য সবরকম লেখার চাইতে স্বতন্ত্র তার লক্ষণই এই যে কবিতা অনুবাদ করা যায় না। অননুবাদ্যতাই যে কবিতার বৈশিষ্ট্য এ-কথার প্রতিবাদ চলে না, কিন্তু এটা শোচনীয় কি শোচনীয় নয়, সেটাই প্রশ্ন। শেলির প্রায় লেখার মধ্যেই তাঁর বিশ্বমানবিক ভ্রাতৃত্ব কল্পনার, সেই অলীক ভূস্বর্গের ছায়া দেখতে পাই; এবং তিনি যখন কবিতার অননুবাদ্যতাকে "বাবেল-অভিশাপের" মর্ম বলেছিলেন, আমি সন্দেহ করি তিনি তাঁর সেই আদর্শের উপলব্ধির বিঘ্ন হিসেবেই একে প্রধানত দেখেছিলেন; কেননা তাঁর সেই প্রবন্ধে তিনি এ-কথাও বলেছিলেন" যে চরিত্রধর্মের গূঢ় মন্ত্রই হলো প্রেম; এবং আমার তো মনে হয় যে শেলি নিজে কি তাঁর মনের মতো কোনো মানুষ এমন কোনো মানুষের প্রতি ভালোবাসা স্বীকার করতে পারতেন না, যার স্বভাষার কবিতা তাঁর পক্ষে অবোধ্য। এ-ক্ষেত্রে শেলির মনোভাবই ঠিক কিনা সে অবশ্য অন্য কথা। অন্তত এটুকু বলা যায় যে কবিতার অননুবাদ্যতাকে এতটা বিমর্ষভাবে সব সমালোচক

দেখেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডক্টর জনসন একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "কবিতার সত্যিই অনুবাদ হয় না; আর সেই কারণে কবিরাই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখেন।" এ-কথাতেও শেলি সায় দিতেন; কারণ ভবিষ্যতের জন্য তাঁর যে আশাই থাক্, তিনি এমন ভাণ নিশ্চয়ই করতেন না যে যে-হেতু অতীতে আমাদের উপর বাবেলের অভিশাপ পড়েছিলো সেইজন্য প্রাচীন জগতের সমস্ত কাব্য লুপ্ত হলেও কোনো লোকসান নেই; তা ছাড়া, যদিও তিনি জানতেন যে আজকালকার প্রায় মানুষই গ্রীক জানে না, তবু তাঁর প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অংশ বেশির ভাগই গ্রীকদের সম্বন্ধে। গ্রীক কবিদের তিনি যে শুধু চরম প্রাধান্য দিতেন তা নয়, তিনি নিজে তাঁদের কাব্য অনেকখানি অনুবাদ করেছিলেন; কবিতাকে অননুবাদ্য ব'লেই তিনি ক্ষান্ত হননি, প্লেটোকেও কবি বলেছিলেন। বাবেলের অভিশাপ তাঁকে দ্বিধায় ফেলেছিলো, আমাদের সকলকেই ফেলেছে। লুইস যে আনাতোল ফ্রাঁস সম্বন্ধে এই গল্পটি বলেছেন: "আমার মনে আছে আনাতোল ফ্রাঁসকে আমি একবার বলেছিলাম যে অনুবাদ ব্যাপারটাই অসম্ভব। উত্তরে তিনি বলেন: 'ঠিক বলেছ, বন্ধু; এই সত্যটি আগে উপলব্ধি ক'রে না নিলে অনুবাদশিল্পে কিছুতেই কৃতী হওয়া যায় না।'"

এই গল্পটি সম্প্রতি প্রকাশিত অক্সফোর্ড বুক্ অব্ গ্রীক ভর্স ইন্ ট্রান্সলেশন গ্রন্থের ভূমিকায় কথিত হয়েছে। এ দেশের পাঠকদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান ব'লে আমার মনে হয়। এর মূল্য দ্বিবিধ: প্রথমত, ভূমিকায় অনুবাদ-শিল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে যা অতি সুবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতার পরিচায়ক, তা ছাড়া তার প্রয়োগ শুধু গ্রীক থেকে অনুবাদের সমস্যাতেই আবদ্ধ নয়; দ্বিতীয়ত, গ্রীক-ভাষা যাঁরা জানেন না তাঁদের পক্ষে গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা করবার এই সংগ্রহই শ্রেষ্ঠ উপায়।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের চাইতেই বাবেল অভিশাপের পীড়ন ভারতবর্ষে বেশি। শুধু যে ভারতের বিভিন্ন ভাষা পৃথিবীর অন্যত্র খুব কম লোকই জানে, তা নয়; ভারতবর্ষের মধ্যেও এমন লোক বিরল যিনি ভিন্নপ্রদেশের ভাষা এত ভালো জানেন যাতে সে-ভাষার কবিতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন। তার

উপর, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যও কথ্যভাষায় অনুবাদ কি অনুসরণের ভিতর দিয়েই সাধারণ লোকের মধ্যে পরিচিত। ফলে, ভারতবর্ষের পক্ষে অনুবাদ শিল্পের প্রাধান্য খুবই বেশি। কিন্তু এই সমস্যার এ-অংশ নিয়ে আমার অবশ্য কিছু বলবার থাকতে পারে না। আমি বরং ভারতীয় সাহিত্যের ইংরেজি তর্জমা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি—তাতে মূলের স্বরূপ একেবারেই কিছু দেয়া সম্ভব কিনা। অক্সফোর্ড বুক অব্ গ্রীক ভর্সের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত টি, এফ, হায়াম-এর লেখা অংশটুকু এই বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে কাজে লাগবে। কেননা এ-কথা অস্বীকার করা যায় না—যদিও স্বীকার করতে খারাপ লাগতে পারে—যে ভারতীয় সাহিত্য ইংরেজ পাঠকের প্রায় সম্পূর্ণই অপরিচিত। আমার নিজের কথা এটুকু বলতে পারি যে যে-সব অনুবাদ পাওয়া যায় তার প্রায় সবই একরকম অপাঠ্য। এ-রকম কেন হয়?

অনুবাদ হয় দুটি ভাষা নিয়ে; এবং সেই দুই ভাষা ভাষাতত্ত্ব কি সামাজিক প্রয়োগের দিক থেকে পরস্পরের যত দূরে হবে, অনুবাদের সমস্যাও হবে ততই জটিল। আর এই দু'দিক থেকেই ভারতীয় ভাষাগুলির ইংরেজির সঙ্গে ব্যবধান দুস্তর। শ্রীযুক্ত হায়াম এ-কথা ঠিকই বলেছেন যে, সব চেয়ে সাধারণ কথাগুলির ঠিক প্রতিশব্দ পাওয়াই সব চেয়ে শক্ত। প্রতিদিনের ব্যবহারের সব জিনিসপত্র প্রায়ই ইংরেজিতে বলা যায় না, কারণ ঐ জিনিসগুলোই ইংলণ্ডে অজ্ঞাত। তাই অনুবাদকরা—এমন কি, যাঁরা ইংরিজিতেই লেখেন তাঁরাও—বাধ্য হ'য়েই হিন্দুস্থানি শব্দের কোনো অশুদ্ধ প্রতিলিপি ব্যবহার করেন কি হয়তো কোনো ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ, যা সাধারণ কোনো ইংরেজ জানে না। এ-সব শব্দ তাই টীকার সাহায্য ছাড়া একেবারেই অর্থহীন। যেটাকে বলা যেতে পারে শব্দের 'চলিত অর্থ' অনেক ক্ষেত্রেই সেটুকুও দেয়া যায় না। তা ছাড়া, যখন কোনো শব্দ অপরিবর্তিত অবস্থাতেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় চালান হয়, তখন প্রায়ই তার চলিত অর্থটাও একেবারে বদলে যায়। যেমন ইংরেজি 'cad' শব্দটি বাঙলায় চলতি হয়েছে একেবারেই নতুন অর্থে। অতএব, অনুবাদ যদি 'চলিত অর্থ'টাও সম্পূর্ণ-ভাবে দিতে না পারে, তার পক্ষে 'ফলিত অর্থ'—অর্থাৎ একটি শব্দের আবহ ও অনুষঙ্গ—পরিবেষণ করা আরো বেশি অসম্ভব। যেমন ধরুন, ইংরেজি

'family' একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শব্দ ; কিন্তু ইংলণ্ডে ও ভারতে তার অনুষঙ্গ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; কেননা এই দুই দেশে 'family' বলতে যা বোঝায় এবং যে-সব ভাবের উদ্রেক করে তা একেবারেই আলাদা। এটা লক্ষ্য করবার যে ভারতীয়রা যখন ইংরেজি বলেন কি লেখেন তখন তাঁদেরকে নতুন একটি ইংরেজি শব্দ তৈরি করতে হয়—'family members'। এ শব্দটি ইংলণ্ডে অবশ্য কেউ কখনো বলে না কি শোনে না। বিশেষ ক'রে আমার এ-কথা মনে হয় যে, হৃদয়াবেগ কি বিভিন্ন মানসিক অবস্থা সম্পর্কিত শব্দগুলো নিয়ে এ-ধরণের মুস্কিল সব চেয়ে বেশি। হৃদয়াবেগঘটিত বাঙলা শব্দের আক্ষরিক ইংরেজি তর্জমা অত্যন্ত বেশি আবেগময় শোনায়। শুধু যে বাঙালিরা সম্ভবত বেশি আবেগপ্রবণ তা নয়, উপরন্তু ভাবাবেগের অতিশয়োক্তি সাধারণ বাঙলা ভাষায় নিত্যনৈমিত্তিক। নিত্য-নৈমিত্তিক ব'লে ঐ অতিশয়োক্তির সম্পূর্ণ আবেগমূল্য কেউ দেয় না, কিন্তু তার ইংরেজি প্রতিশব্দে অতিশয়োক্তির মূল্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় ব'লে অপ্রাকৃত ও অসত্য শোনায়। এ-সব মন্তব্য প্রতিটি বিচ্ছিন্ন শব্দ সম্বন্ধে প্রযুজ্য, কিন্তু সত্যি বলতে গেলে, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো শব্দেরই মানে নেই, বাক্যের সংযোজনাতেই তার অর্থ প্রকাশিত। এখানে আবার ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষার বাক্যরীতির বৈষম্যে আরো অনেক জটিলতার উদ্ভব—কিন্তু সে-প্রসঙ্গে এখন যাবার দরকার নেই।

শ্রীযুক্ত হায়াম অবশ্য প্রধানত গ্রীক আর ইংরেজি ভাষার কথাই বলেছেন ; কিন্তু এ-সব বিষয়ে তাঁর অনেক কথাই বলবার আছে যা অনুবাদ সম্বন্ধে ভাবিত যে-কোনো ব্যক্তিরই বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য—তা গদ্যে কি পদ্যে, যে-কোনো ভাষা থেকে অন্য যে-কোনো ভাষাতেই অনুবাদ হোক্ না।

এ-দেশে, অবশ্য, অক্সফোর্ড বুক অব্ গ্রীক ভর্স আরো একটি কারণে মূল্যবান, সেটি আমি আগেই বলেছি। প্রত্যেক খ্যাতনামা গ্রীক লেখকের বিখ্যাত অংশগুলোর সংগ্রহ হিসেবে ইংরিজি ভাষায় এ-বই শ্রেষ্ঠ। হোমর ও নাট্যকারদের রচনারও অংশ আছে, কিন্তু সেগুলি অংশমাত্র ব'লেই মুস্কিল। কাব্যের কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন হ'লেই কাব্যের ক্ষতি ; কিন্তু সে-ক্ষতি মূল অপেক্ষা অনুবাদে অনেক বেশি। কেননা অনুবাদ নানা খুঁটিনাটিতে কথায় ও ছন্দের ধ্বনিতে অসম্পূর্ণ

ও দুষ্য হ'লেও (যদি দীর্ঘ কাব্য কি নাটক হয়) সম্পূর্ণটা পড়লে তার মধ্যেও গল্পাংশের ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা সম্ভব। খণ্ড অংশে সেটা সম্ভব নয় ব'লে ঠিক সেখানেই পাঠকের দৃষ্টি পড়ে, যেখানে অনুবাদ সব চেয়ে দুর্বল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই : যে-পাঠক ইংরিজি খুব ভালো জানেন কিন্তু গ্রীক একেবারেই জানেন না, যিনি ইতিপূর্ব্বে কিছু গ্রীক কাব্যের তর্জমা হয়তো পড়েছেন কি পড়েননি, তিনি এই বই প'ড়ে গ্রীক কাব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কী-রকম ধারণা করবেন ? এখানে অবশ্য নানারকম ব্যক্তিগত কথাও ওঠে ; অনুবাদের অসম্পূর্ণতা নিজের কল্পনা দিয়ে কতটা তিনি ভরাতে পারবেন তার উপরেই অনেক-কিছু নির্ভর করে : কিন্তু কথাটা অতি ভয়ানক শোনালেও বলতে হবে যে শেষ পর্য্যন্ত আমার মনে হয় গ্রীক কবিতা তাঁর **নীরস** লাগবে। সব-চেয়ে-ভালো তর্জমাগুলোও কেমন অদ্ভুতরকম বেসুরো ; কেমন যেন নিস্তেজ, প'ড়ে কোনোরকম উত্তেজনা হয় না। ছেলেবেলায় আমি যখন প্রথম ইস্কিলাস্-এর অ্যাগামেম্নন পড়ি, অতি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়েছিলুম, মনে আছে, বিশেষ ক'রে হেলেনের উপর বিখ্যাত করাসটি প'ড়ে। কিন্তু এখন, শ্রীযুক্ত জ্যাক লিনসে কৃত সেই করাসটির তর্জমা প'ড়ে এ-কথা মনেও আনতে পারি না যে এ থেকে অত বড়ো উত্তেজনার উদ্ভব সম্ভব। তবু এ-ও বলবো যে তর্জমা হিসেবে এ খুবই ভালো ; এখানে-ওখানে দু' একটা কথা মূলের প্রায় কাছাকাছি এসেছে। সম্ভবত অনুবাদকের এর বেশি আশা করা উচিত নয় : হঠাৎ কখনো-কখনো মনের মধ্যে সেই অপূর্ব সমন্বয় ঘটে যাতে কবিতা তৈরি হয়, এবং সেই কবিতাই অনুবাদ হিসেবে প্রায় আক্ষরিকও হ'তে পারে। এটুকু বাদ দিলে, অনুবাদক খেটে-খুটে যতটা পারেন করেন, ঠিক প্রতিশব্দটির অন্বেষণে প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। ফলে যা হয় তাতে সেই শ্রম প্রায়ই পাঠকের অনুভাব্য হয়।

এই কারণে, এই বইয়ে সব চেয়ে তৃপ্তিকর তর্জমা হয়েছে ক্ষুদ্র কবিতার কি অসমাপ্ত ভগ্নাংশের : সেখানেই, এবং শুধু সেখানেই, সেই অপূর্ব মানসিক সমন্বয় সমস্ত রচনাতে ব্যাপ্ত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাফোর একটি ভগ্নাংশের বেন্ জনসন কৃত সুন্দর অনুবাদ :

The dear good angel of the spring
The nightingale.

ন'টি. শব্দে এর বেশি বলা বোধ হয় অসম্ভব। তারপর শেলির একটি তর্জমা—সম্ভবত প্লেটোর একটি এপিগ্রামের :

Thou wert the morning-star among the living,
Ere thy fair light had fled ;
But now thou art as Hesperus, giving
New splendour to the dead.

এটা বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন যে উভয় অনুবাদই স্বয়ং কবিদের করা—এমন লোকের নয় যাঁরা মুখ্যত পণ্ডিত, এবং শুধু তর্জমা করবার জন্যেই পদ্য লিখতে বসেছেন। এই বইয়ের পাতা ও'ল্টাতে ব'সে আমি প্রথমে ভেবেছিলুম যে কবিরা সর্বদাই পণ্ডিতদের চেয়ে ভালো ; কিন্তু পরে আমি অনুবাদকের নাম লক্ষ্য না ক'রে অনেকগুলো কবিতা প'ড়ে, লেখকরা যে কোন্ শ্রেণীর তা বুঝতেই পারলুম না। কৃতী অনুবাদক বোধ হয় লেখকদের মধ্যে বিশেষ ও স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী ; আরিস্টোফ্যানিস-এর অনুবাদক রজার্স, তাছাড়া, ডব্লিউ, জি, হেডল্যাম ও আর, এ, ফর্নেস সেই শ্রেণীর ; এবং এর মধ্যে এই বইয়ের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বৌরা কি শ্রীযুক্ত হারামকেও ধরা উচিত, কারণ শ্রেষ্ঠ অনুবাদ অনেকগুলোই তাঁদের।

কবিতা অননুবাদ্য, এই কথা নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম, এবং এ বইটি এই সত্যের স্বপক্ষে মূর্তিমান সাক্ষ্যস্বরূপ। কিন্তু যেহেতু আমরা সকলেই বাবেল-অভিশাপে পীড়িত, আর যেহেতু প্রাচীন গ্রীকসাহিত্য আদৌ যে বেঁচে আছে, তার জন্য খোদ কবিরাই প্রধানত দায়ী, এই বইটি সকলের পক্ষেই দরকারি, বিশেষ ক'রে তাঁদের পক্ষে যাঁরা গ্রীক কাব্যের সঙ্গে কিছু পরিচয়ে ইচ্ছুক, আর কিছু পরিচয় না থাকলে ইংরেজি কাব্যও সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না। অক্সফোর্ড বুক অব গ্রীক ভর্স ইন ট্রান্সলেশন, ইংরিজিতে যতটা ও যতটা ভালো ক'রে সম্ভব, গ্রীক কবিতার প্রতিনিধি।

[অনূদিত]

কবিতা ও অনুবাদ

হুমায়ুন কবির

কবিতার ভাষান্তর সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ প্রবল। অনেকেই মনে করেন যে কবিতার প্রাণ তার ধ্বনি। তাই ভাষান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ-বস্তুও মিলিয়ে যায়। আবার কারু মতে কবিতার সার্থকতা তার বিচিত্র অনুষঙ্গে—এক একটি কথার সঙ্গে হাজারো স্মৃতি, অতীতের অনেক ইতিহাস জড়ানো, ভিন্ন ভাষায় সে ইতিহাস, সে অনুস্মৃতি নেই বলে কবিতার কাঠামোকে ভাষান্তর করা চলে, কিন্তু কবিতার প্রাণ তাতে বাদ পড়ে যায়। আবার কেউ বলেন যে আবেগের প্রকাশই কবিতার মর্ম্মকথা, সে আবেগ ভাষার বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিভিন্ন রূপ নেয়, তাই অনুবাদে নতুন কবিতার সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু পুরানো কবিতার ভাষান্তর হয় না।

এ সমস্ত আপত্তির বিশ্লেষণ করলে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবিতা যে প্রধানত চিন্তার বাহন নয়, সে বিষয়ে বোধ হয় কোনো মতবিরোধ নেই, কিন্তু তাই বলে ভাবনা বা চিন্তার সঙ্গে কবিতার কোনো সম্পর্ক নেই, একথা স্বীকার করাও কঠিন। অথচ সমস্ত আপত্তির মূলে এই ধারণাটিই কার্য্যকরী। চিন্তার যা বিষয়বস্তু, তার আবেদন সার্ব্বজনীন—ভাষা সেখানে প্রতীক মাত্র। তাই চিন্তা-ধারাকে যে-কোনো ভাষায় রূপান্তর করা চলে, এবং ভাষান্তরে তার তাৎপর্য্য বা অর্থের কোনো ব্যতিক্রম হয় না। চিন্তার বিষয়বস্তু তাই ভাষানিরপেক্ষ, অন্ততপক্ষে চিন্তার লক্ষ্য হিসাবে এ কথা সত্য। ব্যবহারিক জগতে আমাদের চিন্তাধারা অমিশ্র নয়, আবেগ ও প্রকাশের রেশ ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত চিন্তার মধ্যেই বর্ত্তমান। তাই শব্দ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও খানিকটা বদল হয়, এবং ভাষান্তরের বিষয়েও প্রকৃত তাৎপর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখা অসাধ্য না হলেও আয়াসসাধ্য। চিন্তা যেখানে অমিশ্র, সেখানে প্রতীকচিহ্নের মধ্যে আবেগের কোনো স্থান নেই—তাই গণিতের রূপান্তরে গণিতের বিষয়বস্তুর কোনোই হানি হয় না।

কবিতা বুদ্ধিপ্রধান নয়, চিন্তাধারা প্রকাশও তার মুখ্য লক্ষ্য নয়। আবেগ সঞ্চারই বোধহয় তার ধর্ম্ম, তাই প্রথম দৃষ্টিতে কবিতার ভাষান্তর সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কিন্তু বুদ্ধিপ্রধান নয় বলে কবিতা বুদ্ধিনিরপেক্ষ বা বুদ্ধিবিরোধীও নয়। কবিতায় যে আবেগের সঞ্চার, তা শব্দের সাহায্যে, এবং শব্দকে ধ্বনি এবং অর্থের মধ্যে দ্বিভক্ত করা বোধ হয় অসম্ভব। কেবলমাত্র ধ্বনি দিয়ে যে আবেগ সঞ্চার করা যায় না, তা নয়—সঙ্গীতে এবং বিশেষ করে যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে প্রমাণ মেলে যে কেবলমাত্র ধ্বনি দিয়েও আবেগ জাগানো যায়। কিন্তু সঙ্গীতের যে আবেদন, সে আবেদন কবিতার নয়। সঙ্গীতের আবেদন গভীর হলেও রূপহীন এবং বহু ক্ষেত্রেই অনির্দ্দিষ্ট। আবেগের আলোড়ন তার মধ্যে আছে কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যের অবকাশ সঙ্গীতে নেই। কবিতার আবেদন কিন্তু স্পষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট—অন্ততপক্ষে সঙ্গীতের তুলনায়—একথার সত্যতা সকলেই বোধ হয় স্বীকার করবেন।

কবিতার আবেদনের বৈশিষ্ট্য তার ভাষারূপের উপর নির্ভর করে। সে ভাষারূপের মধ্যে ধ্বনি এবং অর্থ দুয়েরই জায়গা আছে, এবং সেজন্যই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে কবিতার অনুবাদে তার বিশিষ্ট ভাষারূপের অবসান। কেবলমাত্র ধ্বনি দিয়েও কবিতার আবেগ সৃষ্টি করা যায় না—যে-কোনো কবিতা নিয়ে তার শব্দের বদলে সমধ্বনির বিপরীত শব্দ বসাবার চেষ্টা করলেই একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে ধ্বনি এবং অর্থ মিলে যে বৈশিষ্ট্য তার রূপান্তরও সহজ নয়। কেবলমাত্র শব্দবিশেষ দিয়ে,যদি কবিতা লেখা হ'ত, তবে কবিতার অনুবাদ বোধহয় অসম্ভব হ'ত। কারণ বিশেষ শব্দের যে ধ্বনি ও অর্থ, তার অনুস্মৃতি ও পটভূমির যে বৈচিত্র্য তা প্রায় অশেষ। বিশেষ একটি শব্দ বিভিন্ন লোকের মনে সহস্র বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জাগাতে পারে, কিন্তু কবিতা শব্দসমষ্টি বলে প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্যও সংকীর্ণ হয়ে আসে। "সমুদ্র" কথাটি হয়তো বিভিন্ন লোকের মনে সহস্র বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি জাগাবে, কিন্তু "ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের" মধ্যে তার অনেকগুলিই বাদ পড়ে যায়। "রৌদ্রোদ্ভাসিত ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রে"র বেলায় প্রতিচ্ছবির বৈচিত্র্য আরো কম—তাই কাব্য ও কবিতায় যে বিভিন্ন শব্দ ও প্রতিকল্পের সমাবেশ,

তার ফলে আমাদের কাব্যউপলব্ধি একান্ত হতে চায়। কবিতা যে অনুপম, সে-কথারও অর্থ এরই মধ্যে মেলে, কারণ বৈচিত্র্যের সমাবেশে কাব্যসৃষ্টি এমন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে যে পৃথিবীতে তার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মেলে না।

এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই কিন্তু কবিতার অনুবাদেরও সম্ভাবনা নিহিত। কেবলমাত্র
কেবলমাত্র ধ্বনির ভাষান্তর নেই, কিন্তু কবিতা কেবলমাত্র ধ্বনি নয়। কেবলমাত্র
স্বল্পসংখ্যক শব্দের অনুষঙ্গ ও স্মৃতিরও ভাষান্তর অসম্ভব, কারণ প্রত্যেকটি শব্দের
ইতিহাসের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা। কিন্তু কবিতার কাঠামো শব্দসমষ্টি দিয়ে তৈরি
বলে শব্দগুলির পারস্পরিক ইতিহাস সীমাবদ্ধ, তাদের এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার
অভিব্যক্তি বিশিষ্ট ও একক হয়ে ওঠে। সেই অভিব্যক্তি বিভিন্ন শব্দ বা চিত্রকল্প
দিয়ে প্রকাশ সম্ভবপর, কবিতার অনুবাদের সম্ভাবনাও সেইখানে।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাই কবিতার অনুবাদ যতই কষ্টসাধ্য হোক, অসাধ্য
নয়। মর্ম্মবস্তুর দিক দিয়ে বরং বলা চলে যে-কবিতার অনুবাদ হয় না, সে-কবিতা
সিদ্ধির পূর্ণতা পায় নি। কবিতায় বিভিন্ন চিত্রকল্প ও ভাবনা দিয়ে বৈশিষ্ট্য গড়ে
ওঠে, কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য তখনই সার্থক, যখন ব্যক্তির অবান্তর আবেদন ছাড়িয়ে
ব্যক্তিত্বের সার্ব্বজনীনতার মধ্যে তার বিকাশ। কবিতার ভালো মন্দের শেষ
পর্য্যন্ত তাই একমাত্র বিচারক কাল, এবং কালের হাতে বিচার ভার ছেড়ে দেওয়ার
মানেই এই যে বহু মানবের হৃদয়কে যা আকর্ষণ করে, তাই শ্রেষ্ঠ কবিতা। শ্রেষ্ঠ
কবিতা তাই ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যায়, কিন্তু সেখানেই তার সমাপ্তি নয়।
জাতি এবং দেশের বৈশিষ্ট্যকে লঙ্ঘন করবার ইঙ্গিতও তারই মধ্যে মেলে। এই
সার্ব্বজনীন আবেদন দেশ এবং কালের বৈশিষ্ট্য, শব্দ এবং চিত্রকল্পের অনুষঙ্গ
এবং ইতিহাসের অতীত। এই সার্ব্বজনীন আবেদনের মধ্যেই ভাষান্তরের সম্ভাবনা
পরিস্ফুট, এবং যেখানেই কবিতা সমস্ত মানুষের হৃদয়ে সাড়া আনে, সেখানেই
বিশেষ ভাষার বিশেষ শব্দসংগঠন অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। সার্ব্বজনীন ও চিরন্তন
আবেগ সমস্ত ভাষায়ই প্রকাশ চায়—কবিতার অনুবাদের প্রশ্নের এই শেষ কথা।

'কবিতা'র পাঠকদের প্রতি

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা সকলেই কবিতা সম্বন্ধে উৎসাহী ; আরো বেশি, বাঙ্‌লা কবিতা সম্বন্ধে ; তার একটা প্রমাণ অন্তত এই যে আপনারা 'কবিতা' পত্রিকা পড়েন। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী এগারোটি প্রবন্ধের বন্ধুর ভ্রমণ হয়তো আপনাদের কাছে কষ্টকর ঠেকেনি ; উপরন্তু, এই আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু পথের আশে-পাশে হয়তো কোনো নতুন দৃশ্য আপনাদের চোখে পড়েছে, কোনো নতুন দিগন্ত হঠাৎ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই আপনাদের অনেকেরই মনে একেবারে আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতা নিয়ে নানা সংশয় আছে। আজকের দিনের কোনো-কোনো কবিতায় বিষয়বস্তু ও রচনারীতির (দুটো বস্তুকে সত্যি বলতে আলাদা করা যায় না) যে-'নতুনত্ব' দেখা যাচ্ছে, সেটা প্রকৃতই নতুন কিনা, কাব্যে 'নতুনত্ব' বলতে সত্যি কী বোঝায় ; এবং যে-রকমের ও যতটুকু নতুন মাঝে-মাঝে চমক লাগাচ্ছে সেটা খাঁটি কি মেকি, সম্পূর্ণই ইয়োরোপ থেকে আহৃত কি কোনো আন্তরিক প্রয়োজনের ফল—এ-সব প্রশ্ন আপনাদের মনে মাঝে-মাঝে জাগতে বাধ্য, কেননা আপনারা কবিতাশিল্পে শ্রদ্ধাবান, তার উত্থান-পতন সমগ্র জাতির পক্ষে একটি প্রধান ঘটনা এ-বিশ্বাস আপনাদের আছে।

এই প্রবন্ধগুলিতে আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান দূরে থাক্, উল্লেখও হয়তো পাননি। তবে স্পষ্টভাবে কি পরোক্ষভাবে, যুক্তিতে কি ইঙ্গিতে কোনো-কোনো প্রশ্ন নিশ্চয়ই আলোচিত হয়েছে। সংশয় যেখানে বহুদিনের অভ্যাসের ফল, সেখানে তা কিছুতেই অপসৃত হবে না ; আর যেখানে সেটা প্রকৃতই বুদ্ধিবৃত্তির অন্বীষা, সেখানে অন্তত আংশিক তৃপ্তি হওয়া অসম্ভব নয়। জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে আজকের দিনের কবির দৃষ্টিভঙ্গিই স্বতন্ত্র ; এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি বেশ স্পষ্ট ক'রে ও বেশ জোরের সঙ্গেই এই সংখ্যার কোনো-কোনো প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা হয়েছে। সেটা যদি আমরা ভালো ক'রে বলতে পেরে থাকি তাহ'লে আপনাদের কোনো-কোনো প্রশ্নের স্বতই সমাধান হবে, কোনো-কোনো প্রশ্ন হয়তো তখন অবান্তর ঠেকবে। বৈষম্যটা মূলগত দৃষ্টিভঙ্গির, এ-কথা স্বীকার ক'রে নিলে সমস্ত আলোচনার রাস্তাই সুগম হবে।

'কবিতা'-সম্পাদক

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন। প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু।
এই সংখ্যার ১ হইতে ৭৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১২, দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।
কবিতা-কার্যালয় : কবিতা-ভবন
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কবিতা

তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৪৫ ক্রমিক সংখ্যা ১৩

জন্মাষ্টমী

(শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে)

বিষ্ণু দে

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিশ্বাসপ্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পন্‌জ্ হাতে।
পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে
ঘরে ঘরে বিবর্ণ ছায়াতে
পরবশ বিশ্রামের গুল্মমোহ, কল্মষবিলাস।
লোক যায়,
পথে পথে লোকেদের ভিড়,
পথে লোক ঘরে ফেরে,
নানাবেশে নানাদেশী যায়
নির্বোধের মদগর্বে, স্বার্থপর লজ্জাহীনতায়,
ঘৃতস্ফীত স্নিগ্ধমন, ক্ষীণপ্রাণ, জীর্ণ শীর্ণকায়,
এলোমেলো বাঁকা পায়ে, ট্রামে, বাসে, হয়তো বা কারে
সারে সারে কাতারে কাতারে।
ঘামে আর নিশ্বাসের
ক্লিন্নস্রাবী উদ্গারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার কবরীখসা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ সহরে, হে সহর স্বপ্ন ভারাতুর!
লেক আর খালপার, এসপ্লানেড্ আর চিৎপুর!
    ছড়াবে করকাধারা
    কৈলাস তুষারধারা
    অগণন ভিড়াক্রান্ত এ সহরে নিঃসঙ্গ বিধুর
    স্বপ্নভারাতুর!
পণ্ডশ্রম দাবদাহ! ঘর্মপাত ব্যর্থ গেল!
আযোজন বালুচরে ঝরে' যাবে সোনা,
অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঝরে কৈলাসের হৈমবতী কণা।
পারিজাত কুরুবকশাখা
মৃদুপর্ণ হাত নাড়ে সমস্বরে হাজারে হাজারে,
পাখা ঝাড়ে শতশত মানসবলাকা।
    আনন্দ, আনন্দ বুঝি! আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য
লঘিমায় স্পন্দমান
মর্মভেদী বাতাসের কায়াহীন বেগে।

মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।
ক্লোস্অপ্ আলিঙ্গনে
মদালস গভীর চুম্বনে
বিদ্যাসুন্দরের মতো নব্য হৈ চৈ!
কলম্বস্-আবিষ্কৃতা,
বিদেশিনী মহাশ্বেতা,
স্নানসজ্জা বাহু আর কদলীদলিত উরু
বৃথাই নাড়ালে!
পল্লবঅঞ্জন চোখে মুক্তাবিন্দু খল শোকে,
বৃথাই দাঁড়ালে!
দন্তর হাসির ছটা বিম্বাধরে বৃথা, বৃথা কামধনু ভুরু।
শ্রোণিভারনিলীনবসনা
বৃথাই রূপ ও বাণী প্রসাদ বিতরে
মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ
লেলিহরসনা।

তাহলে, বিদায় বলি।
দাবদাহে জগ্ধতৃণ দগ্ধমরু প্রদীপ্ত বাতাসে
যৌবনের গান ঝরে, সিরোক্কোর একঘেয়ে কলি।
ভঙ্গুর জীবনলোভী শ্বাসে
ব্যর্থতার গ্লানি বহে মৌন মন
অনুতাপে পরিম্লান মৌল নিরাশায়,
অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবিষু সগরসন্তান।
নিরন্তর প্রমাজ্ঞান
প্রাক্তন প্রমাদে কোন্ কৌল মুমূর্ষায়
হৃদয় বিনায়।
গুহা ভেঙে রশ্মিহারা পঙ্গপাল কবন্ধের পাল
বুঝি বাহিরায়
শিরায় শিরায় উন্মাদ আবেগ।
সদসৎ ধর্মাধর্ম নিরালম্ব আকাশকুসুম
পিছু পিছু নিয়ত ছোটায়
সঞ্চয়ের দুরন্ত তৃষায়,
জিজ্ঞাসার দুর্মর নেশায় জাগরণ ঘুম
নিরানন্দ বুভুৎসায়
কেটে যায় ঈশানঝঞ্ঝায় দুরন্ত সিমুম
কালের খেলায়।

বিষয়ী-বিষয় তবু মরীচিকা, সুদূরে মিলায়।
ব্যষ্টি ও সমষ্টি আর প্রত্যয় প্রতীক
সঙ্কল্প বিকল্প লীলায় নামে রূপে কর্তা ও ক্রিয়ায়
নিজেদেরে শূন্যেই বিলায়।
পৃথুল পৃথিবী শুধু
বিড়ম্বিত-নীবি
নয়ন ও মন নিয়ত ভোলায়
স্বর্ণমারীচের ডাকে নানা অছিলায়,
কস্তুরীযূথের পায়ে
ঊর্দ্ধমুখ ক্ষুরে ক্ষুরে ঢেকে দিয়ে দিগন্ত ধূলায়।

হয়তো বা ছুটে আসে মগধের পদাতিক,
হয়তো বা অশ্বারূঢ় রক্তবর্ণ সেনা।
বাড়ী যাই ঊর্ধশ্বাসে,
পিছু পিছু ছুটে' আসে
ক্ষিপ্র উচ্চৈশ্রবা।
এ যে দেখি বিষম বাতিক!
দুর্জনবিহার করো
দূরে পরিহার,
রেখে দাও বৈকালিক পার্ক্ব্যাপী সভা।
ঠিক জানো ধনঞ্জয়, তুমি পালাবে না?

তার চেয়ে চালাও সমিতি,
জোটাও কমিটি,
সন্ধ্যাটা কাটবে তবু নিরাপদে, দশের সেবায়।
তেত্রিশ কোটির মাঝে অসহায় মনে
ভাবো কি, কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ?
গাড়ী নেই ? ভালো লোক ! হাট ছেড়ে বাট ছেড়ে
ঘরে বসে' থেকো।

আমি যেন গ্রাম্যজন
বসে' আছি বিমূঢ়, উৎসুক,
সংসারের কচঙ্গনে বিকিকিনি বাকি থাকে, কেটে যায় বেলা,
বিস্ফারিত দৃষ্টি, মুখ
শিথিল বৃহৎ আর লোল ওষ্ঠাধর।
পসারিণী তুলে' দেয় হাট, আহিরিণী চলে যায় ঘাট,
ভেঙে যায় মেলা।
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চনদে খল কলরবে চলে
মননের মোহানায় ন যযৌ ন তস্থৌ খেলা। কেটে যায় বেলা।
রন্ধ্রহীন বিস্ময়ের
উভবলী সংশয়ের ত্রিশঙ্কু ক্ষণের

সঙ্কুল সন্ধ্যায় দেখি দিগন্তের পরিখার পারে
সারে সারে ছত্রধর মেঘ,
রথচক্রে সঞ্চিত আবেগ।
আমারই প্রশ্নের কাছে তারা বুঝি ধার চায়
পাঞ্চজন্য বেগ।
ভাবি শুধু দ্বারকার তথ্য কিসে মথুরার মধুর সঙ্গীতে
সত্য রবে, ভাবি কিসে তত্ত্ব হবে বৃন্দাবনী শ্যামকান্তপীতে।

ফীটনের নেই দরকার।
সূর্য্যের সারথি নই, অশ্বমেধ বই নাকো,
বাজার-সরকার,
বড়ো জোর, পাটকলে পদস্থ কেরানী,
জজকোর্টে উকিলই হয়তো বা,
তেল নেই নিজেরই চরকার।
কিসের দরকার।
তার চেয়ে মাঠচষা ভালো,
ধারালো পায়ের খেলা ভারালো বলের মুখে
আধি কি সারাল ?
সমুদ্রের ধারে সেই রক্তরাঙা সূর্য্যাস্তের পারে
য়ুলিসিস জানে না তো মোহনবাগান

বীরভোগ্য দ্বীপকুঞ্জে কুরুবক পারিজাত বনে
হেক্‌টর না জানি হায় কি মজা হারাল !
আশা করি বেতারের গান
সে দ্বীপেও ভেসে যায়
যেখানে দিগন্তে চিরসন্ধ্যাময় আলো ।
আশা করি সুরঙ্গমা ডিয়োটিমা সুন্দরের প্রিয়া
শোনে এই ঐক্যতান;
রাজার কুমার
যেন গ্যালাহার্ড্ খুঁজে ফেরে অমৃত-আধার
ভেসে যায় পক্ষীরাজে
যখন জটার বাঁধন পড়ল খুলে' ।

এই ঝড়ে উর্ধ্বশ্বাস অপচেতা বক্রপেশী আততিবিহীন
কবন্ধ দুঃস্বপ্ন ঘেরে
মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ণ আবেগ ।
হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্নমুমূর্ষাক্ষুব্ধ আমার পাতাল
ধুয়ে দিক্, বজ্রযোগে বিদ্যুৎ-অঙ্গারে
উড়ায়ে' পুড়ায়ে' দিক্ বরাভয় তোমার আড়ালে ।
গ্রন্থিগুলি বেঁধে দিক্ বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীক সম্পূরণে

বেঁধে দিক্ হে সুশ্রুত, উদ্‌গতির হিরণ্ময় জালে ।

তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজ্ই ভালো, না হয়তো ফ্লাশ্ ।
ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্ত্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি ।
তারপরে বাড়ী
অম্লশূল আর সর্দিকাশি
এলোমেলো, গোলমাল, ধেঁাযাধেঁাযি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল ।

তবু হায়
প্রচ্ছন্ন করাল
মহাকাল, ধূর্ত মহাকাল !
দিন আর রাত্রি কাটে, রাত্রি আর দিন ।
অবিশ্রাম চলে অভিনব
স্বধর্ম-অন্বেষা,
পিছু পিছু চলে অবিরাম
স্যন্দন-ঘর্ঘরে তব
উচ্চকিত উচ্চৈশ্রব হ্রেষা ।

যৌবন সঙ্গীন
নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক
যৌথজতুঘরে।
প্রারম্ভের পারিজাত ধুতুরায় পরিণতি পায়,
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য আর কার্য্য কারণের
পালিত কুক্কুরবৎ পটু বশ্যতায়
দেখে যাই অকাতরে
অনাচার, অত্যাচার, অপচয়, অকালে, অকালে।
কিম্বা সত্বগুণে
আর্বলব্ধ স্বার্থতারণের
সরীসৃপ বিজ্ঞতায় চাঞ্চল্যের মুখে ফেলি নিষ্ঠীবন,
বলি, ধিক্, ধিক্।
তারপরে,
জরিষ্ণু প্রহরে
সন্তানের ফর্দ করি আজীবন বঞ্চনার পাইকারী
আত্মত্যাগী অর্থগৃধ্নুতায়,
কিম্বা হায়
দরিদ্র বৃদ্ধের তিক্ত সর্বহারা ভবিতব্যহীন
ব্যর্থতার একান্ত ব্যথায়।

আত্মকামে বিত্ত এই আর্যসত্য উপলব্ধি করে'
অবশেষে ভুলে' যাই কালের হাওয়ায়
ঈশানের আগমনীগানে, আনন্দ-উৎসবে,
ধ্বংসের বিষাণে
ভয়াবহ পরধর্ম যৌতুকের অট্টালিকা ভূমিসাৎ ছারখার কালের হাওয়ায়।
ভুলে' যাই রক্ষাকালী শ্মশানেই হায়।
ক্ষান্ত করো, ক্ষান্ত করো এই অন্ধ ধৃষ্ট বিদূষণ
তুলে দাও হিরণ্ময় ঢাকা,
হে যম, হে সূর্য, হে পূষণ!

শ্মশান।
শ্মশানে আগুন জলে,
হুইস্কি কি তাড়ি চলে।
খালের হাওয়ায় হিম শবগন্ধ প্রখর আঁধারে,
অনাথ রাত্রির আর্তনাদে
বসে আছি উবু হয়ে', হৃদয়ে জমাট বাঁধে
পত্নীবিয়োগের পুণ্য কঠিন আঁধার।
ওপারে সারদা কাঁদে, এপারে প্রেমদা বাঁধে।
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের শোকে ডাক শুনি বৈরাগ্যসাধার।

ব্যর্থ করে' বৈদ্যের বিধান
ভেষজনিদান
চলে যবে গেল অষ্টসন্তানের মাতা যমপুরে
অকালে,
বাসুকি বুঝি বৃথা ছাতা ধরে!
ব্রহ্মচর্য ব্যর্থ করে' চলে' গেল বৃষ্টিঝড়ে,
গেলে হত রাত্রিশেষে
কিম্বা ভোরে, সাদা রোদপোয়ানো সকালে।
স্নান সেরে উঠবে এবার?
পুন্নামের পথ বেয়ে রৌরবের আশাহীন দ্বার।

তোমার সর্বতোভদ্রে অনিকেত আমার কি স্থান
হবে সখা, হে কৌন্তেয়?
শরীরে আমার আজও লাগে নি কো দাহগন্ধ,
সর্ববুদ্ধিমতে হেয়
মরণবৃত্তিক ছলা
আজও মনে জ্বালেনি মশান।
জানি বন্ধু, বুদ্ধিযোগী উপাসনা তব
এ নীরন্ধ্র
ঘন অন্ধকারে

অনন্দ অসূর্যলোকে
অর্গল লাগাবে নাকো দ্বারে।
বিস্মিতে তোরণে তব
অতিথি এসেছি আজ, পরপক্ষ অজ্ঞাত অচেনা
ছিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রুক্ষ বিভীষণ
শান্তিসেবী যুযুৎসুসমান।
স্থান কি হবে না?
বিভুমাত্ম প্রতিষ্ঠা তোমার
সুকৃতঋতের ঋণ তোমাতে লভেছে জানি ক্ষমার প্রমাণ,
প্রাপ্যপ্রাপকের সমাধান।
ছিন্ন করে ছায়াতপ, দীর্ণ করে ভেদের আঁধার
জ্বালো পার্থ, পঞ্চাগ্নির প্রদীপ তোমার।

পাঁচটি চাঁপার কলির মুষ্টি তুলেছ বৃথাই,
বৃথা তর্জনী গঞ্জনা।
জানি এ তোমার ছলার মাধুরী,
বিম্বাধরের তড়িৎ চাতুরী, অঞ্জনা!
তোমার হাসির পাণ্ডু আভাসে—
যাই বলো
জীবন হারায় একটি ক্ষণের তীব্রতায়

সব জন্মের সাধনার শেষ একটি মেঘের দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরে পড়ে আজ জাতিস্মর
অসীম ব্যথায় অসহ পুলকে মরণসাগরে ধন্যতায়।
তাই তো শুধাই, হে ঈশ্বর
—তাই বলো!
রাগ করো নিকো সত্যিই তবে!
বলো তো কবে,
ভয়ে দুরুদুরু ভিখারী হৃদয়,
হে বিজয়িনী
—শুধু চা কিন্তু, দুধ নয়, দুইচামচ চিনি—
অকারণে ভোলা তুমি নির্দয়
রাখবে তোমার কোমল হাতের কমলপুটে
—অকারণে নয়?
জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
চরণতলে
আমি অভাগ্য মানি
বোসোই না, ওরা কেউই শুন্‌ছে না, এ দীন বলে
হয়তো আমিও উঠ্‌ব ফুটে' সফলতায়
তোমার হাতের বাঙ্ময় চাপে, রঙীন ঠোঁটের এককথায়,

রেশমী মেঘের একটুকু জলে
স্নেল কাক্‌টুস্ গ্রাণ্ডিফ্লোরা।
কেউই ওরা
শুন্‌ছে না, শোনো, আবার কিন্তু এসো
আর চুপি চুপি বলি, একটুকু ভালো, বেশ বেশ শুধু হেসো।
(রমার মুখের সরস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনের কালিমা
কাজের দিন।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস্ পেগ্।
লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক্-
এব্‌ল্ ইন্-
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং?

কানে কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
অলকা, আমার দিনরজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচবছর, স্টালিনের মতো
—ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খস্রু বেগ্?

অমাকৃষ্ণ তমিস্রারে দুই হাতে ঠেলে' ঠেলে' কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে'
চলেছ দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়ায়ে রিক্ততা
কি উদ্দেশে, কঠিন যাত্রায়?
নেই রজনীর ভয়
বিজনের, পৃথিবীর, আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নেই আজ, হৃদয় আমার?
দৃষ্টিতে নেইকো জনপ্রাণী, শুধু আকাশছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রুর আঁধারের হাসি।
জোৎস্না ডুবেছে রাশি রাশি
মেঘঘন আঁধারের উদ্দাম জোয়ারে।

বেলাভূমি স্তব্ধ মেঘরজনীর দুর্দম শৃঙ্গারে,
শ্বাস রুদ্ধ করে ঘন উত্তেজিত স্বেদাক্ত বাতাস,
তার মাঝে, ব্যগ্রবাহু, প্রিয় মোর, উর্ধশ্বাস
চলেছ কোথায়?
কোন্ নারী, কি ঐশ্বর্যভার
ছিন্ন করে নেবে বলো বলীয়ান্ দুই বীরবাহু?
কোন্ দেশ লক্ষ্য কোন্ অমৃত-আধার
অজ্ঞাতবাসের তব অভিনব এ জয়যাত্রার?
পৃথিবীর, বিধাতার সমুদ্যত বজ্রের সন্ধান, ক্ষিপ্র রাহু
তোমারও যাত্রার সাথে সাথে ধায় স্মার্তমতে, জানো?
তুমি বুঝি শোনো নি কো গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সঙ্কটের তীব্র আর্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র করিছে একেলা?
ভুলেছ কি নব নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয় না কো শেষ,
পড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকণ্টকিত রুক্ষ দেশ।
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব খরকৃষ্ণ তমিস্রারে ঠেলে,
দূরে দূরে ফেলে কাংস্যনিনাদ সাগরে

—শ্যেন-কপোতের প্রেম-কূজনে মধুর কোনো
নব অলকায় নয়—
নিয়ে যাবে বলো কোন্ সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে !
মিনতি আমার,
যাত্রা করো রোধ।
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তিদেশে, নবপ্রতিভাসে
যাত্রা কভু যাবে না থমকি।
তুমি তো জেনেছ
যে শরীরে রক্ত চলে, সে শরীরে কেহ
কখনো চমকি'
দেখে নি কো আথেনে বা প্রজ্ঞাপারমিতা।
যাত্রা তব ক্ষান্ত করো, নিভে যাক্ রাবণের চিতা
পাবে কি বন্ধুর বাহু কভু ধরিবারে
অন্তহীন কাংস্যরবা মদহিংস্র সাগরের দীর্ঘ এই পারে ?
—হে বন্ধু আমার, বলো তো আমারে।
অন্বেষণ বৃথা বারে বারে
ডিয়োটিমা, বলো তো আমারে।
তাই বলি, আমার মিনতি,
অসিধারব্রত যাত্রা ক্ষান্ত করো, হৃদয় আমার।

নবঅভিসারে চলেছি তো তাই,
রাত জেগে পেঁচা ভরেছি খাতাই।
লক্ষ্মী চাই।
ফট্‌কারই শুধু ছেড়েছি তো হাল,
আমি কোন্ ছার,
বাটপাড়েরাও হয়েছে যে ঘাল।
গণ্ডেরিরামই বাজার চালায়,
আছে তাঁর চার নিমক্ হালাল তুখোড় দালাল !
আমাদের সব পূরেছে চতুর পাটের ছালায়।
হাওড়ায় তাই কোণঠাসা হয়ে' চেঁচাই কাতরে, মাথাপোতা।
ত্বয়া হৃষীকেশ ! শতেক ঘায়েও নই ভোঁতা।
নবরূপে সেই মাথাই খাটাই, পটুরঙ্গে
গৌড়জনের সুধাকর হই, চতুরঙ্গে
অংশীদাররা হল কূপোকাৎ !
প্রায় চাল মাৎ।
রাম হরি শ্যাম আর এ অধম
দীন অভাজন
জুড়েছি গাজন।

ডিভিডেণ্ড্ চেপে প্যানিক্ ছড়াই,
বাজারে গুমোট আমরা নড়াই,
তারপরে ছাড়ি অন্‌ডর্‌সেল হাত চেপে,
ভাগে ভয়ে কেঁপে অংশীদার
হরি আর রাম, শ্যাম আর আমি রয়েছি চার ডিরেক্টর।
কি উল্লাস! কোটালের বান! হই আগুয়ান।
এইবার দাদা ছাড়ব বোনাস্।
পাল তুলে চলি প্যাটনী খেয়ায়'
পাঁচটিবছর সব বকেয়ায়।
বুঝলে না, রাম সরস্বতীরই কর্ণধার,
বীণকার নয় নাই হল, বটে সর্বত্যাগী শিক্ষাব্রত সে স্বর্ণকার;
কান ধরে ভায়া চালায় বইয়ের মালজাহাজ,
বাহাদুরি দিই, খুব জাঁহাবাজ।
শ্যাম হল গিয়ে নবশঙ্কর, রঘুনন্দন, আর্য্যামির সে তুফানমেল,
নিখিলভারতে ছড়াচ্ছে খুড়ো মোহমুদ্গর, হিন্দুত্বর ম্লেচ্ছশেল।
হরি আমাদের রথস্‌চাইলড্, দেশের মাথা ও মুখ উজ্জ্বল!
তেজারতি তার ব্যাঙ্কিঙে গিয়ে কি উচ্ছল!
জুটো মিল্‌ও চলে—ধর্মঘটের উপায় নেই;
জামাই যে তার নিজে ম্যানেজার, খাদিপ্রচারের মস্ত লীডার,
দেশের লীডার স্বনামধন্য ত্যাগস্মরণীয় তার বেয়াই!
বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড তাই!

অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাটপক্ষ্মথায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, অবর্ণ, নির্মেঘ;
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর।
বিহঙ্গ জাগে নি আজও অশ্বত্থশাখায় জীবযাত্রাকাকলীমুখর,
অথবা জেগেছে নীড়ে, শিরাস্ফোটে লেগেছে তাদের
এ প্রাকৃত আবির্ভাবে নিরুদ্ধ আবেগ।
পাঁচপাহাড়ের
চূড়ায় নেইকো আজ দিতিজ স্পর্ধার
উদ্ধত গ্রীবার গতি,

শান্তমতি
ক্ষান্ত স্থির অবনত নিবৃত্ত উৎসুক
যেন শোনে কান পেতে মিটিমিটি কার পদধ্বনি।
বাতাসের বেগ
চলে গেছে দিগন্তসীমার
বজ্রকোষে পরিখাপ্রাকারে সমুদ্রের পারে
চক্রমণ স্বতই সম্বরি'।
সামান্য ঝিল্লীও মৌন, ক্রন্দনশর্বরী
শেষ হল, সেও বুঝি জানে।
এ তীব্র প্রহরে
প্রতিবেশী বিচ্ছিন্ন সহরে
শৈশবের অসহায় ঘুম
না জানি ফোটায় কতো বার্ধক্যের জাতিস্মর আকাশকুসুম।
এ রাত্রিপ্রয়াণে
সংহত সত্তার এই বাস্তু গোধূলিতে, ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে
স্মিতওষ্ঠাধরে
কূলপ্লাবী বর্ণহারা আকাশগঙ্গায়
ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন।

সারস্বত মুহূর্তের কালাতীত স্তম্ভিত লীলায়
জাগ্রতস্বপ্নের ভেদ বুঝি আর নেই।
তাই পরিব্রজবাসী সন্ধ্যাভাষী এই অবধূত
আত্মীয়প্রহরে যতো ভূত—
বিশেষ সজ্যের ক্ষিপ্র পাল—
হে দ্রংষ্ট্রাকরাল!
গুহাহিত সমাহিত অন্তরের শূন্যে নীল মহাশূন্যমাঝে।
প্রত্যক্ষ প্রতীক তাই রাত্রি আর দিন
আত্মদানে রোমে রোমে ঐক্যতানে রোমাঞ্চিত বাজে
নামে রূপে একাকার মহাশূন্যমাঝে।
আসন্নশরৎউষা ঝাড়ে শুধু কুরুবকশাখা
কৈলাসের শীকরবীজনে, শুধু ঝরে ঝারি শিশিরসলিল,
হৈমবতী ধৌত করে কুহেলিকা, সম্মোহকলিল।
সর্বংসহা আমাদের বসুন্ধরা সুন্দরী বারেক
বিলম্বিতগ্রীবা,
রাকা মুখ ফিরায় বুঝি বা।

সূর্য্যের বিরাট তূর্য্যে হিরণ্যগর্ভের
আলোককাড়ায় নাকাড়ায়
মুক্তিস্নাত লজ্জিত দর্বের
উচ্চৈশ্রব রক্তিমাধারায়
আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বাবেগে।
হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এ সঙ্গীত আমাদেরে আর নাহি সাজে।'
আনন্দের যে ভৈরবী নীড়ে নীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে
সাযুজ্যসঙ্গীতে,
অণিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিঃস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয়সোদর,
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী ব্যর্থতা জানাই
কুম্ভীরক তাই।

স্মরণ

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ও বলেছিল, ভুলো না যেন।
কতোবার, কতোবার শুনেছি
আমার আলিঙ্গনে, আমার বুকের কাছে
ওর ভীরু প্রার্থনা,
ওর অস্ফুট সুর :
ভুলো না, ভুলো না যেন।

আমার আলিঙ্গনে কম্পিত ওর বুক।
কতোবার বলেছি, বকেছি :
কেন ও-কথা বলো ? কেন মনে করো
সেই দিন, যেদিন বিরহী শয্যা,
মৃত প্রদীপ,
আর অকরুণ রাত্রি শেষে প্রত্যুষের বিবর্ণ আকাশ ?
আমাদের প্রেমের মৃত্যু কি আছে ?

ও বোঝে নি আমার কথা,
ও শুধু কেঁদেছিলো ফুঁপিয়ে।

—যেদিন হঠাৎ মিলবে নতুন সন্ধ্যায়
নতুন দক্ষিণে বাতাসের বার্তা,
ম্লানায়মান কুয়াশার প্রান্তে নতুন চাঁদ,
সেদিন তোমার পানপাত্রে
হয়তো পড়বে নতুন চোখের ছায়া।
তবু যদি বিস্মৃতির প্রদোষ থেকে উড়ে আসে
কোনো ভুলে-যাওয়া গন্ধ, নিবে-যাওয়া গান,
হঠাৎ মনে কোরো বর্ষার এই নিবিড় রাত্রি,
আর মনে কোরো আমাকে,
ভুলো না, ভুলো না যেন।

আজ হঠাৎ হাওয়া দিয়েছে দক্ষিণের সমুদ্রপার থেকে,
সে-বাতাসে রয়েছে হাস্নুহানার বেদনা আঁকা।

ভেঙেছি পান পাত্র,
মিশেছে পথের ধূলোয়।
এই আসন্ন সন্ধ্যায়,
সেই মুছে যাওয়া মুখ,
কতো ভুলে-যাওয়া গন্ধ,
কতো নিবে-যাওয়া গান
ধূসর স্বপ্নের মতো ঘুরে ঘুরে আসে।
আর শুনি কৃষ্ণচূড়ার করুণ মর্মরে :
ভুলো না, ভুলো না যেন।

কী নিয়ে বাঁচবো ?

সরোজরঞ্জন আচার্য্য

প্রতিদিন ভেঙে যায়
দীর্ঘদিনের তপস্যা—
মুক্তির স্বপ্ন
আর রক্তের তরঙ্গে তরঙ্গে
কামনার নিষ্ফল ক্রন্দন,—
মুক্তির তপস্যা আর অপূর্ণতার বেদনা
যদি ব্যর্থ হোলো, তবে,
কী নিয়ে বাঁচবো বলো
কী নিয়ে বাঁচবো
আত্মার এই আত্মঘাতী সংঘাত হতে ?

প্লোটিনাস ! কেমন করে হবে বলো
আত্মার স্বচ্ছন্দবিচরণ নব নব জ্যোতির্লোকে
এই দেহসর্ব্বস্বতার অমোঘ অভিশাপ নিয়ে ?

ভেঙ্গে যায়, প্রতিদিন ভেঙ্গে যায়
মুক্তির স্বপ্ন আর রক্তের তরঙ্গে তরঙ্গে
অস্ফুট ক্রন্দন, কী নিয়ে বাঁচবো
তবে কী নিয়ে বাঁচবো ?

রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে জ্বলে ওঠে
দিনের আলোয় দেখা কত মুখ
কত সুন্দর মুখ
আর শাড়ীর সীমাছাপানো
তনুদেহের কত উচ্চারিত ভঙ্গিমা
নিঃশব্দে ভিড় করে আসে।
রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে
হারিয়ে গেছি আমি,
তারায় ভরা আকাশের মতো
জ্বলে ওঠে যে অসংখ্য তনুদেহের
চঞ্চল দীপশিখা

সুদূর স্পর্শাতীত
আমি হারিয়ে যাই তার মাঝে
আমি হারিয়ে গেছি।

দিনের আলোয়
হারিয়ে যাই জনতার ভিড়ে
রুদ্ধশ্বাস অন্নদাসত্বের সন্ধানে,
পাথরের পথের বুকে জমে ওঠে
কত লক্ষ পদচারীর ক্রন্দন
ক্ষুধার
ভালবাসার।
সেই লক্ষ পদক্ষেপের মাঝে
আমি এক
আমি একাকী
পথ কেটে চলি
আর মাঝে-মাঝে রাত্রির অশরীরী প্রেয়সীরা
ঝিলিক দিয়ে যায়
দিনের জানালায়।

আমি পথচারী
অন্নের ভিখারী
আর কামনার প্রদীপ্ত পতঙ্গ
চলেছি লক্ষ মানুষের না-চাওয়া
সঙ্গের ভার বয়ে
নগরীর পথ বেয়ে,
আর দেখ্‌ছি,
বুভুক্ষুর মত দেখছি
আরামের কবুতর
হাসিতে ঐশ্বর্য্যে আলস্যে প্রসন্ন
কতো মোলায়েম চেহারা অপরূপ
আর বাসে মোটরে মার্কেটে
কত রঙীন পোষাকের 'মাস্‌কারেড্‌'।

হে স্থবির জরদ্গব ঋষি,
হে নির্ব্বিকার মহাত্মা
নাল্পে সুখমস্তি—
প্রশান্তি আর দাক্ষিণ্যের ছলনা

বাতাসে ছড়ানো হায়েনার গন্ধ
কর্কশ বলিষ্ঠ কোলাহল ব্যর্থতার বিদ্বেষের
আর তার মাঝে হঠাৎ জলে ওঠে
ভালবাসার মায়াবী আলো।

নগরীর পথে ছড়ানো বিদ্বেষের বীজ
আগুনের ফুল্‌কি
হয়তো জলে উঠবে একদিন
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
আর নিভন্ত বুদ্ধির কারবারী
বণিকলক্ষ্মীর বাহন—
তুমি আমি
কী নিয়ে বাঁচবো
ভাবছি কী নিয়ে বাঁচবো?
ধর্ম্মের বুদ্ধিহীন উন্মাদনা?
না, লালসার মুহূর্ত্তমাদকতায় আত্মবিলোপ?
কী নিয়ে বাঁচবো বলো
কী নিয়ে বাঁচবো তবে?

পীড়িত মানবতার মুক্তির স্বপ্ন
নতুন স্বর্গ আর নতুন পৃথিবী
আর জনতার ভিড় ঠেলে
আজ থেকে পথ কেটে চলা
আলেয়ার পিছে পিছে?

নিভন্ত বুদ্ধির কারবারী
বণিকলক্ষ্মীর বাহন
অবসন্ন;
জ্যোতির্ম্ময় দেবতা আমাদের
সৃপাই উজ্জ্বল পাখা ঝাপ্‌টানি
মহাশূন্যে।
বন্দী প্রমিথিয়ুস,
কত দীর্ঘ পথ
কত মরু পর্ব্বত পার হয়ে
এসিয়ার যাত্রা
বলো, কবে সুরু হবে?
কবে জলে উঠ্‌বে
মিলনের মুক্তির উৎসবদীপ
এসিয়ার স্পর্শবিহ্বল মুখর বনানী?

ঝিমন্ত বুদ্ধির কারবারী
বণিকলক্ষ্মীর বাহন
তুমি আমি কী নিয়ে বাঁচবো তবে আজ
সেই নব প্রভাতের প্রতীক্ষায় ?
কী নিয়ে বাঁচবো তবে
বলো, কী নিয়ে বাঁচবো
যদি মিলনের মুক্তির উৎসবদীপ
আজো জ্বলে না ওঠে, লুসিফার ?
লুসিফার, লুসিফার,
স্বর্গ হতে বিদায়
স্বপ্নের স্বর্গ
শুচিতার স্বপ্ন, লুসিফার,
ভেঙে যায়, প্রতিদিন ভেঙে যায়
আর রক্তের তরঙ্গে তরঙ্গে অস্ফুট ক্রন্দন
কী নিয়ে বাঁচবো বলো
তবে কী নিয়ে বাঁচবো ?

এসেছে সময় আজ

পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

চুপ করে থাকার দিন এসেছে আজ :
মুখর দিনের পর মৌন সন্ধ্যা,
স্তব্ধ রাত্রি—
আজ এসেছে সময় চুপ করে থাকার।

দিনের চীৎকার কোলাহল থেমে গেছে :
পথে ভাটা পড়েছে জনস্রোতের,
শেষ হয়েছে পাখীদের নীড়ে ফেরার আগ্রহ,
শেষ হয়েছে তাদের ক্লান্ত কলরব—
সময় এসেছে আজ,
এসেছে সময় চুপ করে থাকার।

দেখ না একবার আকাশে চোখ তুলে,
দেখ না ওই নীরব কালো আকাশের পানে একবার—

ধ্যানমগ্ন সপ্তর্ষি
চারিদিক ব্যাপ্ত স্তব্ধতায়।

বাইরের আকাশ নির্মেঘ,
তারা ভরা,
তাই ব'লে কি আমাদের মনের আকাশও মেঘশূন্য ?
নয়, তা নয়।
রুদ্ধ আবেগ, তারই পুঞ্জীভূত মেঘ,
ছেয়ে দিল সে আকাশ।
স্তব্ধতা,
বিরাট স্তব্ধতা বাসা বেঁধে ফেলেছে সেথায়,
বাতাস নেই—

থম্‌থমে আকাশ :
বর্ষণের পূর্বাভাস !

তাই হোক,
নীরব বর্ষা নামুক,
ছুটে আসুক শব্দ হীন, কল্লোলহীন প্লাবন ;
ভীষণ প্লাবন—
নিঃশব্দ ঝঞ্ঝা !
এসেছে সে মুহূর্ত্ত আজ
চুপ ক'রে থাকার,
কথা হারিয়ে যাওয়ার।

রোমাণ্টিক

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আগ্নেয়গিরি পাঠালো যে এই রাত্রি,
গলিত ধাতুরা জমাট কখন্ বাঁধ্‌বে ?
ব্যবসায়ী মন মাহেন্দ্রক্ষণ খুঁজ্‌ছে,
টিক্‌টিকি ডাকে—বধির সে নির্বন্ধ।

ঘড়ির কাঁটায় কতো যে মিনিট ম'রছে,
মনে অনন্ত সময়ের অধিরাজ্য ;
ভুলেছি, জ্যোৎস্না হারিয়ে হরিৎ ধান্য,
এখানে বন্দী আনা-তিনেকের বাল্‌বে।

ঘরে ঘরে সেই ভ্রমণ-বিলাসী ভাব্‌না
আরাম-চেয়ারে আনে দুপুরের নিদ্রা,

নিজেরি একদা কল্পিত সব স্বপ্ন
সেলায়ের প্রতি সুতোয় লুকোয় লজ্জা।

ছেঁড়া জুতোটায় ফিতেটা বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে,
বেঁধে' নিই মন কাব্যের প্রতি পক্ষে—
সেই কথাটাই বাধে না নিজেকে বল্‌তে
শুন্‌বে যে-কথা হাজার জনকে বল্‌তে।

রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি,—
চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি ;
হৃদয় জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প,
ম্লান হ'য়ে যায় সব-হারাদের বস্তি ॥

প্রার্থনা

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাল্বে নাম্‌লো ঠাণ্ডা ঘুম
এখন সকাল হ'লো।
রাত্রির সমান সমতল পার হ'য়ে হোঁচট খেয়ে পড়ি
বন্ধুর সকালে।
দাঁড়কাকের কর্কশ চীৎকার ট্রাম-লাইনে,
খণ্ডিত আকাশে ম্লান রক্ত।

তারপর দু'পয়সার দেশি কাগজে
এক কাপ চায়ের আয়ুপান চলে;
চোখে ভাসে বিক্ষত চীন আর স্পেনের মূর্তি,
আর স্বস্তিকার স্বস্তিহীন অরণ্যে
নাৎসিরা হাঁটে।
ভাঙা-জান্‌লার ওপারে ডাস্টবিন—
ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক আর কুকুরের ভিড়ে
এখন সকাল হ'লো।
পাশের বস্তি থেকে কদর্য কলহ কানে আসে,
গত রাতের ভালো-লাগা 'শেষের কবিতা' জোলো লাগে।

অতিক্রুত ঘড়ির কাঁটায় এখন ন'টা—
এখুনি সোজা চেয়ারে কুঁজো হ'য়ে ব'সে স্বরু হবে
আত্মাবমাননা।
তারপর সন্ধ্যায় ক্লাইভ্-স্ট্রিটের ফির্‌তি স্রোতে
নিজেকে মামুলি সেই ভাসানো—
পাশে রাখা ছাত্র আর মজুরের মিছিল আর ধর্মঘট।
তারপর পীড়িত পঙ্গু যৌবনকে এলিয়ে দেওয়া নিরুত্তাপ শয্যায়
আর সকালের অনুচ্চারিত প্রার্থনার অক্ষম আবৃত্তি করা :
হে ঈশ্বর, তুমি সুন্দর হও।

রজনীগন্ধা

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

রাতের গভীরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, উঠে দেখি
বিছানার এক প্রান্তে হেমন্তের নির্লিপ্ত নদীর মতো
তুমি ঘুমিয়ে আছো। বালিসের পর নিবিড় চুলে
স্থির বন্যার নীরব বিস্তৃতি। আর কালো কালো
বাড়ীগুলোর উপর দিয়ে উঠে এসেছে কৃষ্ণপক্ষের
একফালি মুমূর্ষু চাঁদ। তারই পাণ্ডুর আলো
জানলা দিয়ে এসে পড়েছে তোমার মুখে,
সেখানে স্বপ্নলোকের হাসিকান্নার ছায়া জড়ানো।

বাইরে টব থেকে রজনীগন্ধার মৃদুগন্ধ ভেসে আসে।
পথের বিবর্ণ গ্যাসের আলো মৃত্যুর মতো শীতল।
বহুদূরে অসহায় কুকুরের একটানা করুণ স্বর।
রাস্তার মোড়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীর চোখে স্তব্ধ প্রত্যাশা।
নিজেকে এ সময়ে ক্লান্ত লাগে, মনে হয় যেন একাকী,
নীরবে তোমার চুলের অরণ্যে মুখ মিশিয়ে পড়ে থাকি।

ছায়াপথ

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

আজ আকাশে চাঁদ নেই, জানলা খুলে দেখি,
তিমির-পটভূমিকা তারার আলোতে ঝলমল ;
ছোট ছোট খুসীর ঢেউ পাঠিয়ে দিয়েছে নীচে,
মাঝপথে অন্ধকারের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে
টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে মিশিয়ে গেছে ধুলোর মতো।
নিঃশব্দে কখন ঝরে পড়েছে মাটির বুকের ওপর
সবার ঘরে প্রদীপ জ্বালা, কেউ দেখতে পায়নি।
বাস্তবের কোলাহলে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের একটি মুহূর্ত্ত।

আর দেখি দিগন্ত-প্রসারিত বিস্তীর্ণ ছায়াপথ
ছায়া-ছায়া অগ্নিগর্ভ ধোঁয়ার আবরণের মতো ;
কোটি-কোটি নক্ষত্রপুঞ্জের সমাবেশে ধূসর মহিমায়
নিঃসারে মৌনবিলুপ্তির মধ্যে আত্মসমাহিত।
তাপসীর বৈরাগ্য সাধনায় নতুনতর প্রাপ্তির প্রত্যাশা,
লোকচক্ষুর অন্তরালে অনির্ব্বাণ নিঃশব্দ কারুণ্য।

স্বপ্নের যুবতীরা

অনুপম গুপ্ত

স্বপ্নের গর্ভকোষ ভেঙে বেরিয়ে এল
ধারালো
তীব্র শাণিত
এক-একটি উচ্চারিত রেখা
ওরা
আমাদের স্বপ্নের যুবতীরা।

রবিবারে
অগ্রগামী কারে
এরোড্রোমে উড়ে উড়ে বেড়ায়
আবার দ্রুতধাবন সন্ধ্যায় সিনেমায়।
(তবু তো ফুসফুসে রক্ত নেই
অতি-আধুনিক প্রতিক্রিয়ায়
হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াও বন্ধ হয় বুঝি
আর অবশেষে ক্ষীণ নিঃশ্বাস নৈবেদ্য দেবে।)

প্রগতির একনিষ্ঠ পুরোহিতের
ফলপ্রসূ আশীর্বাদ শিরে লয়ে
আবার ঘরে ফেরে ক্লান্ত নিষ্ঠাবতী পূজারিণীরা।

বহুযুগের রূপকার-চিত্রিত এই সব মুখ
রুজ-রঞ্জনী-রমিত মুখ
আর শাড়ী সার পরিপূর্ণ বুক।
এরা
গর্ভবতী হবে এই সব যুবতীরা
আর যাই প্রসবিত হোক
স্বপ্ন শিল্প বা কবিতা
জীবন-যুদ্ধের কৃতী সৈনিক জন্মাবে না
শুধু দুঃখ এইটুক।

কয়েকটি দিন

সমর সেন

নদীর জলে
শৈশবে দেখেছি গলিত উলঙ্গ শব।
রক্তিম প্রাণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া গাছে আসে;
আজ সহর হতে বহুদূরে, শালবনের পথে,
বালুতে অতিক্রান্ত দিনরাত্রির ভগ্নস্তূপ,
বিকেলে কাঁকরে রুক্ষ দিগন্তপ্লাবিত লাল সৌন্দর্য্য,
বন্ধুর মাঠে সন্ধ্যায় শৃগাল, কোকিল ডাকে।
তারপর এই কর্কশ বালুতে, এই রক্তপথে
আকাশের নিবিড় নীল আগুন লাগল।

নরম মাংসস্তূপে গভীর চিহ্ন এঁকে
নববর্ষের নাগরিক চলে গেল রিক্তপথে,
বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে পৃথিবীকে রেখে।
দীর্ঘ দিনে করাল রৌদ্র নির্মম ঐশ্বর্য্য বিলায়,
উপরে ধূর্ত কাকের ভিড়,
গরুর গাড়ীর ছায়ার পিছনে
স্খলিতগতি ভ্রান্ত কুকুর ঘোরে।

ধাবমান কাল
ট্রেনের লৌহরেখার উপরে আজো আনে লোহিত-হলুদ চাঁদ,
সন্ধ্যার দিকে তপ্ত আবেগে
স্নিগ্ধ ঘন মেঘে আকাশ শান্ত গম্ভীর।

দিন যায়, বসন্ত গতপত্র বহুদিন,
গ্রামে গ্রামে মাঘমাসে দীর্ঘদেহ কাবুলিরা আসে;
ঘুরে ফিরে হানা দেয় ঘরে ঘরে
বর্বর ভাষায় কাঁচাপাকা দাড়ি হাওয়ায় নড়ে।

চায়ের দোকানে বিনষ্ট দল,
শুধু মনান্তরের কর্কশ কোলাহল।

আজ শুধু মনে হয়—
ক্ষুধিত স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর,
পাথর-কঠিন যুগে যন্ত্রণার
আর অন্ধকূপে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর
সমুদ্রের শব্দের মতো শেষহীন বজ্রের গুরু-গুরু প্রতিধ্বনি।

*　　*　　*

সড়কের কলরোল, নতুন শিশুর কান্না,
চিরকাল বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম !
অতীতের শবসম্ভোগী মন
কালের স্থবির যাত্রায় স্থির অশান্তি আনে ;
আজ দুঃস্বপ্নে দেখি
বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে ;
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার শুব্ধ নদী ।

জাহাজের ডাক

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সারাদিন কাটে ফাইলের চাপে আপিসে
সন্ধ্যাও কেটে যায়,
পাথরের মত শুব্ধ কুঠিন রাত্রে
হঠাৎ কখন ঘুম ভেঙে যায়
পাণ্ডুর জ্যোছনায় ।

আসে না ঘুম ।
কান পেতে শুধু জাহাজের ডাক শুনি
কঠিন আকাশে ঝিকিমিকি তারা গুনি :
গঙ্গার জল চিরে
চীনে কি জাপানে, হয়তো আফ্রিকায়
সিন্ধুর জল ডাকে তারে ছলছল ।

ফাল্গুন বুঝি আবার এসেছে আজ :
ফাইলের চাপে অনেক অনেক কাজ ।

পলাশেতে বুঝি রঙীন নিমন্ত্রণ
বাতাসেতে বুঝি চপল মহুয়া বন
শুকনো পাতায় বনভূমি ছেয়ে যায়—
আপিসে ফাইলে সারাদিন কাটে
সন্ধ্যাও কেটে যায়।

মধ্যরাত্রে শুনি জাহাজের ডাক :
তারাগুলি আজ আকাশেতে চঞ্চল
বিলাসী নারীর সুরভিত অঞ্চল
বাতাসেতে বুঝি ওড়ে—
তামাটে জলের ঘন স্রোত চিরে
জাহাজের চাকা ঘোরে।

কিশোর স্বপ্ন স্বর্ণমৃগের মত
বিলীন হয়েছে ফাইলের চাপে আপিসে:
সারাদিন কাটে সন্ধ্যাও কেটে যায়।

মাঝরাতে শুধু ঘুম ভেঙে যায়
জাহাজের ডাক শুনে :
কঠিন আকাশে ঝিকিমিকি তারা গুনি।

ঘুম নাহি আসে ঘুম যেন উড়ে যায় :
পাণ্ডুর জ্যোছনায়
জাহাজের ডাকে স্তব্ধ আকাশ ভরা
পলাশের বুকে রঙের আগুন জ্বলে
বাতাসেতে বুঝি সিন্ধুর সৌরভ।

কালকে আপিসে অনেক কাজের ভিড়।

পুর্ব্বরাগ

বুদ্ধদেব বসু

(১)

এবার তবে ঝড় ।

পাষাণ-কালো আকাশে আলো ক্ষণিক কাঁপে
দ্বিপ্রহর হ'লো প্রখর স্নায়ুর তাপে
রাত্রিদিন চিরমলিন কর্মহীন ।

বুদ্ধিজীবী রুদ্ধঘরে সঙ্গীহীন
আত্মরতির সম্মোহনে কাটায় দিন ।
পাষাণ-কালো আকাশে আলো কখন্ কাঁপে ?

ক্ষুব্ধমনে রুদ্ধঘরে একলা যাপে
বুদ্ধিভোগী পাণ্ডুরোগী রক্তহীন ।
প্রেম তো শুধু বায়লজির দাবি মেটায় ।

গণমনের আন্দোলনের আবর্জনা
ব্যর্থশ্রমে অর্থাগমের বিড়ম্বনা
চারিদিকেই পোড়ো জমি ফাঁপা মানুষ
শান্তি শুধু গ্রন্থাগারের অন্ধকারে ।

এবার তবে ঝড় ।
এবার তবে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ নখে
পাষাণ-কালো আকাশ যাক ছিঁড়ে,
এবার তবে দীপ্ত দারুণ তরুণ চোখে
আশার লাল মশাল ।

আকাশ-ভরা আলো ।
দীপ্ত দারুণ তরুণ চোখের আগুন জ্বালো
রুদ্ধঘরের অন্ধকারের পাষাণ-পটে
তীব্র আশার অঙ্গীকারে ।

চিরবিরস অবসরের শিথিল জরা
অর্থাগমের তিক্তশ্রমে নিত্য মরা।
শান্তি শুধুই গ্রন্থাগারের অন্ধকারে ?

মূঢ় ইতর ধূর্ত্ত লোলুপ স্বার্থপর
গণমনের জন-নায়ক জয় হে !
—তুচ্ছ করার অভিনয়ে সহ্য করা
মিছিমিছি ছট্‌ফটিয়ে কী হবে !

এবার তবে নতুন করো।
তনুমনের তরুণতার আগুন জ্বালো
মুক্ত প্রেমের দীপ্ত শাণিত দুঃসাহসে।
হায়রে ভীরু আত্মকামে শৃঙ্খলিত !

শিথিলস্নায়ু শীতলশিরা রক্তহীন
উচ্চচূড় আলস্যের অকালজরা
ব্যর্থতার তিক্ততায় নিত্য মরা—
প্রেম কি শুধু বায়লজির দাবি মেটায় ?
—হায়রে ভীরু ক্ষুদ্র কামে শৃঙ্খলিত !

পাষাণ ফেটে আকাশে ফোটে আশার রংমশাল
কর্মখর দ্বিপ্রহর দীপ্ত হ'লো,
কবি-কিশোর, শক্তি তোমার মুক্ত করো,
বৃহন্নলা, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ।

নতুন কবিতা

খাপছাড়া / সে } রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী। তিনটাকা ও আড়াই টাকা।

এ দুটি বই রবীন্দ্রনাথের আবোল-তাবোল রচনা। "সে" গদ্যগ্রন্থ হ'লেও কল্পনার উদ্দাম খামখেয়ালে এতই মাত্রা-ছাড়ানো যে "খাপছাড়া"র পদ্যের সঙ্গে একে যুক্ত করাই সঙ্গত। আমার তো এ দুটি বইয়ের মধ্যে "সে" ঢের বেশি ভালো লাগলো। "খাপছাড়া" প্রমাণ করেছে যে ছেলেমানুষের কথা লেখা এক কথা (এবং এই দুরূহ কাজ রবীন্দ্রনাথ "শিশু"তে যত ভালো পেরেছেন, জগতের আর কোনো কবি কখনো সে-রকম পেরেছেন ব'লে জানি না), ছেলেমানুষের জন্য লেখা আর। এবং ছেলেমানুষের জন্য লেখার সাধনায় সুকুমার রায় যতটা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, আমাদের দেশে আর কেউ ততটা এখনো হ'তে পারেননি।

"খাপছাড়া" পড়তে পড়তে "আবোল-তাবোলে"র কথা মনে না-হ'য়েই পারে না, কিন্তু এ-দুটি ঠিক এক জাতের বই নয়। "খাপছাড়া" মহাকবির অবসরের ফুলকি; "আবোল-তাবোল" ভালো কবির শ্রেষ্ঠ সাধনা। "খাপছাড়া"র পদে-পদে অপ্রত্যাশিত চমক-লাগানো মিলের চকমকি, ছন্দটা হালকা চালের, এবং ঠাট্টার ইঙ্গিতগুলি এমন তির্যকছাঁদে বিচ্ছুরিত যে কোনো শিশু যে তা প'ড়ে হাসতে পারবে এমন সম্ভাবনা অল্পই। ছন্দ-মিলের ঝঙ্কারে শিশুর মন খুসি হবে; কিন্তু সম্পূর্ণ রসটা বয়স্ক মনেরই উপভোগ্য। অন্যপক্ষে বয়স্ক মনের পক্ষে যথেষ্ট খোরাক এ-বইতে নেই, যদিও কোনো-কোনো কবিতা এমন আছে যা বহুবার পড়লেও ফিকে হবে না। তার ভিতর থেকে ভিটামিন সম্বন্ধে একটি নীতিমূলক ছড়া উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারলুম না।

ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকূলবাবু বলে, ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই,
বৃথাই খরচ ক'রে চাষ-করা শস্য॥

গৃহিনী দোহাই পাড়ে মাঠে যবে চরে সে,
ঠেলা মেরে চলে যায় পায়ে যবে ধরে সে,
মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্য;
দু'দিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহা শোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ-শেষ হোত যে অবশ্য।

স্বার্থপরের মতো মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি বড়োদের জন্যই এ-বই লিখতেন তাহ'লে আরো কত আশ্চর্য জিনিষ পেতুম তাঁর কাছ থেকে। চেস্টার্টন একবার গর্ব ক'রে বলেছিলেন যে তাঁর ভিক্টরীয় যুগ একটি মহৎ জিনিসের জনক—নন্‌সেন্স্। ইংরেজরা নন্‌সেন্স্ রচনায় পাকা ওস্তাদ; ইংরেজি বুক অব লাইট ভর্স একটি অফুরন্ত আনন্দের খনি; এবং এডওয়ার্ড লিয়র একাই একশো। আমরা বাঙালিরা যে হাসতে জানিনে এমন তো নয়, কিন্তু পদ্যের রাজ্যে হাসির আনাগোনা নেই বললেই হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চ হাসি স্মরণীয়; সুকুমার রায় ননসেন্স জিনিসটাকে সম্পূর্ণই আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু বড়োদের জন্য বড়ো লেখক হবার সূত্রপাতেই তাঁর জীবন শেষ হ'লো। তারপরে ওদিকটা আর কেউ মাড়াননি বললেও চলে। এমন হাসি, যেটা হো-হো হাসি নয় যাতে বিদ্রূপের চাইতে রসিকতাই বেশি, সংস্কার-চেষ্টার চাইতে নিছক রসতারই যেখানে স্থান, যা আকারে সুডৌল ও সুঠাম, খামকা বেশি কথা ব'লে সময় নষ্ট করে না, যা উৎকৃষ্ট পদ্য—এমনকি, কখনো-কখনো ভালো কবিতা—যা হাসাবার চেষ্টা করে না, ভালো সঙ্গ দেয়, যাতে ভালো মেজাজের হাওয়া, ভালো আড্ডার ফুর্তি—এমন কবিতা বাঙলাভাষায় বড়ো দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলেই "খাপছাড়া" তা হ'তে পারতো।

"সে" বইটি অদ্ভুতরসের মাস্টারপীস। আজগুবি লম্বাচৌড়া গল্প যদি বলতেই হয় তবে রূপর্ণের মতো একটু-আধটু বাড়াবাড়ি ক'রে লাভ নেই, সেটা কতদূর পর্য্যন্ত করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ যেন পুপু-দিদির সঙ্গে বাজি

রেখে সেইটেই দেখিয়েছেন। বাজিতে পুপু-দিদিরই হার। কোনো-কোনো গল্প অসম্ভবেরও সীমা পেরিয়ে গেছে। অবশ্য অসম্ভবের মধ্যেও কার্য-কারণ সম্বন্ধ, তর্ক ও তত্ত্ব প্রতি পদেই বর্তমান, প্রকৃতির সমস্ত আইনের বাইরে চ'লে গিয়েও গল্প লেখার আইনকে মেনে চলতেই হয়। তাসমানিয়ায় তাসখেলার নেমন্তন্নের গল্পটি "রংমশালে" যখন বেরোয় তখন ভয়ানক ভালো লেগেছিল, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি ভালো লাগলো বাঘের গল্প, শেয়ালের মানুষ হবার গল্প, এবং "সে"র জলে ডুবে মরার গল্প। এই শেষের গল্পটি শুধু যে এ-বইয়ের শ্রেষ্ঠ তা নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-রচনার মধ্যেই এর একটি বিশিষ্ট স্থান থাকবে। ম'রে যাওয়ার অভিজ্ঞতার বর্ণনা আর কোনো লেখক করেছেন কিনা জানি না; অন্তত সেই বর্ণনায় এতখানি হাসি ও দুঃখ এবং এত বেশি সত্যবাদিতা থাকা যে সম্ভব সেটা মনে হওয়াই প্রতিভাসাপেক্ষ।

"চুলকুনি ছিল গায়ে, চুলকতে গিয়ে দেখি, না আছে নখ, না আছে চুলকনি। ভয়ানক দুঃখ হোলো। হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউহাউটা বিনামূল্যে পেয়েছিলুম, সে গেল কোথায়। যত চেঁচাই চেঁচানোও হয় না কান্নাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হোলো মাথা ঠুকি বটগাছটাতে, মাথার টিকি খুঁজে পাইনে কোথাও। সব চেয়ে দুঃখ, বারোটা বাজল, ক্ষিদে কই ক্ষিদে কই ব'লে পুকুর ধারে পাক খেয়ে বেড়াই, ক্ষিদে বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না। ...একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গাঁয়ে গাঁয়ে। বেলা তখন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছিনে, এই দুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি আমাদের পাতুখুড়ো মুচিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র।

তারপর "সে" সুরুৎ ক'রে সেই গাঁজাখোরের গা-খানাকে দখল ক'রে বসলো, এবং পরে আবার পুপুদিদির পিড়াপিড়িতে "সে" নিজের গা ফিরে পেলে, এবং তারও পরে এক ডাক্তার "সে"র মাথায় বনমানুষের মগজ ঠুসে দিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন সে গল্পও কম আশ্চর্য নয়।

উভয় গ্রন্থই অকৃপণভাবে চিত্রিত, এবং ছবিগুলো কবিরই হাতের। ছবিগুলোর ড্রয়িং-এর কি অ্যানাটমির গলদ ওস্তাদরা ধরবেন, এবং তা ধরতে হ'লে খুব বেশি ওস্তাদও হ'তে হয় না বোধ করি, কেননা সেদিক থেকে নিখুঁত হওয়া

এদের উদ্দেশ্যই নয়। আমি আনাড়ি হ'য়ে এটুকু বলতে পারি যে রচনার রসের সঙ্গে ছবিগুলো অদ্ভুত মিশ খেয়েছে; এবং কোনো-কোনো মানুষের ও জীব-জন্তুর ছবি অত্যন্ত জীবন্ত, মুখের ভাবটুকু সুদ্ধ।

অষ্টাদশী—হুমায়ুন কবির। নওরোজ পাব্লিশিং। আট আনা; নম্বরযুক্ত ও স্বাক্ষরিত, এক টাকা।

শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবিরের কর্ম-কাণ্ড নানাবিধ। বাঙলা সাহিত্যের দিকে তাঁর ঝোঁক প্রথম থেকেই, বাঙলা কবিতার প্রতি তাঁর আসক্তি দুর্মর। কিছুদিন ধ'রে মনে হচ্ছিল, বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্র তিনি প্রায় ছেড়েই দিলেন, তাঁর "অষ্টাদশী" প্রকাশে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম।

"অষ্টাদশী" আঠারোটি সনেটের সমষ্টি। কবিতাগুলো সাম্প্রতিক রচনা নয়; ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে ইয়োরোপ ও ভারতের নানা জায়গায় ব'সে লেখা। ভালো সনেট লেখা যে কত শক্ত তা যিনি একবার তা লিখতে চেষ্টা করেছেন তিনিই জানেন। সনেটের গড়ন আঁটোসাটো মজবুত, কোথাও একটু ফাঁক থাকবে না, একটুও বেশি বলা হবে না—চতুর্দশ পংক্তিতে এসে অনিবার্যভাবে শেষ হ'য়ে যাবে। মিলের নিয়মে সমস্ত ব্যাপারটা আরো দুরূহ হ'য়ে ওঠে। এতোদিক এক সঙ্গে সামলানো সোজা কথা নয়। বাঙলায় আমরা চোদ্দ লাইনের পদ্যকেই সনেট বলি। এ-ধরণের অশুদ্ধি মুখের কথাতে চলতে পারে, লেখায় এটা প্রশ্রয় না পাওয়াই ভালো। তাতে সনেটের বিশিষ্ট রূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট থাকবে।

হুমায়ুন কবিরের এই রচনাগুলি সনেটপদবাচ্য। কোথাও-কোথাও যে তরলতা না আছে তা নয়, অনিপুণ শব্দপ্রয়োগও পাওয়া যায়, প্রেমের কবিতা ক'টি অনেকটা গতানুগতিক; কিন্তু একটি আন্তরিকতার সুরে সমস্ত বইখানা সার্থক ও উপভোগ্য। আমার ৬নং কবিতাটি ভালো লাগলো ("ক্ষান্ত কর অতীতের পুরাতন গৌরবের কথা"), বিশেষ ক'রে এর বক্তব্য আমার খুবই মনের

মতো ; ১২ ও ১৩ নম্বরে ওয়াল্টেয়ারের বর্ণনাও ভালো লাগলো ; এবং সব চেয়ে যেটি ভালো লাগলো সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

শুনিনু নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
হেরিলাম স্বর্ণপুরী। পথে পথে তার
শত শত নরনারী কাঁদে অবিরাম,
আর্ত্তকণ্ঠে নভোতলে ওঠে হাহাকার।
তরুণ দেবতা সম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি চলিয়াছে বনে,—
সীতার বিরহভয়ে পুরী অন্ধকার,
গগন শ্বসিয়া ওঠে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে।

চমকি উঠিনু জাগি! তপ্ত নিদাঘের
মূর্চ্ছিত ভুবন ভরি রৌদ্রানল জ্বলে।
ষ্টেশন অঙ্গনে ডাকে গ্রীষ্মাতুর স্বরে
অযোধ্যার নাম। ধূসর ধূলির পরে
ব'সে আছে বানরের দল। দূরে ঝলে
সূর্য্যালোকে স্বর্ণচূড়া ভগ্ন মন্দিরের।

এটি সত্যিকারের ভালো সনেট।

"অষ্টাদশী" নামে আর একটি কবিতার বই আছে জগদীশ ভট্টাচার্যের লেখা। শ্রীযুক্ত কবির তাঁর বইয়ের অন্য কোনো নাম দিলে পারতেন। বইটির ছাপা খারাপ। "নিনু" "র'ল" প্রভৃতি কথা আজকালকার দিনে মোটে সঙ্গত শোনায় না, এবং ইচ্ছে করলেই এগুলো এড়িয়ে চলা যায়।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন। ৬১ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট, "রংমশাল প্রেসে"
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু।
কার্য্যালয়—কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কবিতা

তৃতীয় বর্ষ

অজিত দত্ত